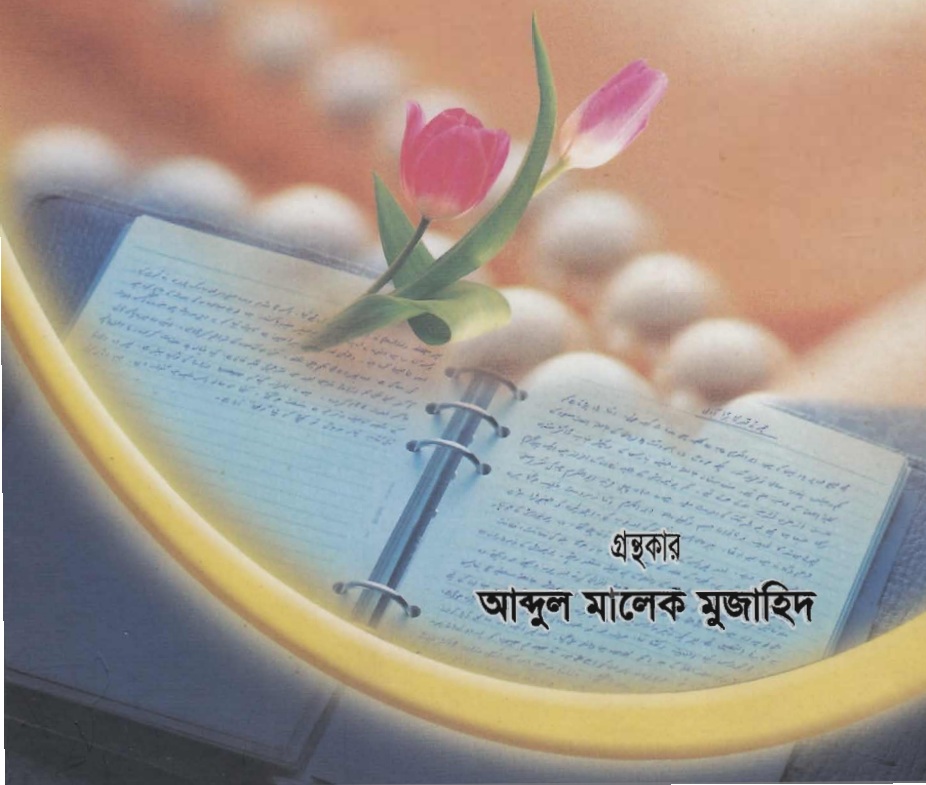


খ্যাতিসম্পন্ন মুসলিম রমণীদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

সোনালী কিরণ



গ্রন্থকার

আব্দুল মালেক মুজাহিদ

সূচীপত্র

অনুবাদকের আরয	11
গ্রন্থকারের বাণী	15
০১। চাঁদ আমার ঘরে	17
০২। নারী সাহাবীর মুখাপেক্ষীহীনতা	18
০৩। তার চোখ খুলে	20
০৪। হে মুসলমানগণ! তোমরাও কি?	25
০৫। দূর্ভাগ্যময় জীবন হতে সৌভাগ্যের পথে	26
০৬। বায়ান্ন লাখ দেবহাম তবুও যাকাত ফরয হয়নি!	36
০৭। সম্ভাব্য স্বামীর সাক্ষাতকার	38
০৮। যদি স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামতে হয়	45
০৯। স্বামীকে পরাজিতকারী এক বুদ্ধিমতি রমণীর কাণ্ড	46
১০। বুদ্ধিমতি পাত্রীর সন্ধানে তিন প্রশ্ন	47
১১। রামলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর অসীম সৌভাগ্য	50
১২। আপনার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন	53
১৩। উত্তম নারীর গুণাবলী	58
১৪। খানসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঈমান দীপ্ত উপদেশ	59
১৫। স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর দান	61
১৬। মহৎ পিতার বুদ্ধিমতি কন্যা	63
১৭। এই মহিলাটি জান্নাতে প্রবেশ করবে	70
১৮। জান্নাতুল ফেরদাউসের বাসিন্দা	72
১৯। আপনার জন্য আমাকে বিবাহ করা বৈধ নয়	78
২০। হে পালনকর্তা! আমার রিযিক তোমার দায়িত্বে	81

২১। তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সোজা করতে চেষ্টা করো না	83
২২। সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী কে?	85
২৩। নাহরে যুবাইদা	86
২৪। খেজুরে অলৌকিক বরকত	91
২৫। উম্মে মা'বাদের নজীরবিহীন বাকপটুত্ব	93
২৬। শাসকের দায়িত্ব	96
২৭। ইঙ্গিতেই মর্মোদ্ধার	97
২৮। সন্তোষজ্ঞাপন ও আত্মসমর্পণকারী রমণী	99
২৯। আমার কোন দুঃখ নেই	106
৩০। হে বৎস! সত্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ কর	112
৩১। খলীফাকে বৃদ্ধার উপযুক্ত জবাব	117
৩২। আল্লাহর কসম! আমার বোনের দাঁত ভঙ্গবে না	118
৩৩। মুসলিম রমণী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার নারীর মধ্যে পার্থক্য	121
৩৪। মেয়ের প্রতি পিতার উপদেশ	124
৩৫। পোষাকটি নিজ সন্তানের চেয়েও বেশি মূল্যবান	126
৩৬। সতীনের বিরুদ্ধে আজব ফন্দি	128
৩৭। শয়তানের ছবি বানিয়ে দাও	130
৩৮। এক দাসীর উপস্থিতি বুদ্ধি	132
৩৯। ইশারা ও ইঙ্গিতে কৃতিত্ব	134
৪০। সন্তানের মৃত্যুতে আহাজীর ওয়র	136
৪১। বেদুঈন নারীর বুদ্ধিমত্তা	138
৪২। অটল ও দৃঢ় ঈমান	139
৪৩। সতী নারীর অসম্ভব প্রকাশ	141

৪৪। কোরআনের দলীল দিয়ে নিরুত্তর করে দিল.....	143
৪৫। খলীফার কাছে স্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ.....	144
৪৬। এক নারী পরাজিত করল বাহাদুরকে.....	145
৪৭। দূরদর্শিতা.....	147
৪৮। রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এক রমণীর অভিযোগ.....	149
৪৯। নবুওয়াতের দরবার থেকে নিরাপত্তার পরোয়ানা.....	152
৫০। এক সাহসী রমণীর কাহিনী.....	157
৫১। তাবেয়ীকুল শিরমণীর কন্যাই যখন-----.....	159
৫২। আল্লাহই রিযিকদাতা.....	165
৫৩। আমানতদারীর এক বিরল দৃষ্টান্ত.....	167
৫৪। এক ঈমান বিক্রেতার ঘটনা.....	169
৫৫। আমি যমীন-আসমানের অধিপতিকে লজ্জা পাই.....	171
৫৬। এক আত্মমর্যাদাপূর্ণ স্বামী.....	173
৫৭। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের কন্যার প্রশ্ন আর ইমাম শাফেয়ীর উত্তর.....	174
৫৮। ফেরাউনের মন্ত্রীবর্গ তাদের থেকে উত্তম ছিল.....	176
৫৯। এক নারীর তাৎক্ষণিক অভিযোগ দায়ের.....	178
৬০। সাহসিকতা পূর্ণ উত্তর.....	180
৬১। উত্তরাধিকারের সুষ্ঠু বণ্টন.....	181
৬২। খলীফা মামুনের চমৎকার শিকারী.....	182
৬৩। সন্তানকে অনৈতিক আচরণের সুযোগ কেন দিয়েছ?.....	186
৬৪। কুরাইশ বংশের রমণীগণ.....	188
৬৫। মেহমানের খোঁজে.....	190

৬৬। স্বামীর দানশীলতায় স্ত্রীর অসন্তুষ্টি	193
৬৭। এক কুমারীর দূরদর্শিতা	196
৬৮। খলীফার জন্যে দু'আ না বদদু'আ	198
৬৯। বৃদ্ধার চেহারায় লাভণ্য ও মাধুর্যের গুপ্ত রহস্য	200
৭০। স্বপ্নের মাধ্যমে খলীফার বিচার	202
৭১। এমনটিও হয়?	204
৭২। হাজ্জাজ বিন আল্লাত (ؓ)-এর কৌশল	206
৭৩। এক মহিলার ধূর্তামি	211
৭৪। মহীয়সী রমণী উম্মে সুলাইম (ؓ)	214
৭৫। সে তো নারীর জন্য মৃত্যু!	222
৭৬। যে সত্যের উপর থাকবে তার কণ্ঠ উঁচু হবে	226
৭৭। মরুকন্যার বিলাস বহুল প্রাসাদ পছন্দ নয়	228
৭৮। তদবীরে তকদীর পরিবর্তন হয় না	231
৭৯। মায়ের দু'আ	233
৮০। শরীয়তের বিধান প্রয়োগ	235
৮১। আমি কাকে সন্তুষ্ট করব	237
৮২। সেই দরজা বন্ধ করার শক্তি আমার নেই	239
৮৩। যার উপর ফেরেশতাগণ ছায়া করছিল	240
৮৪। পর্বত অপেক্ষা অধিক দৃঢ়তা	242
৮৫। ইসলামী আদর্শে পাবন্দ এক নারী	250
৮৬। উপস্থিত জবাব	253
৮৭। মোবারক কবরস্থান	254
৮৮। যুলুমের বৃক্ষে মেওয়া ফলে না	255

৮৯।	চাঁদনী রজনীতে	260
৯০।	বিধবার জন্যে জলে স্থলে ব্যবসা.....	261
৯১।	জননীর প্রতি শ্রদ্ধা	263
৯২।	নারীদের বিষয়ে একটি হাদীস	265
৯৩।	মুসলিম মুজাহিদদের প্রথম সমুদ্র অভিযান.....	267
৯৪।	বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচ-গানের পরিণাম	269
৯৫।	পরামর্শ.....	271
৯৬।	উদারতায় জয়.....	272
৯৭।	এক বীর শহীদের জননী	274
৯৮।	ক্ষমা করা হবে; কিন্তু একটি শর্তে	286
৯৯।	নিষ্পাপ শিশু.....	289
১০০।	অলৌকিক চিকিৎসা.....	292
১০১।	প্রতারণার কুফল	301
১০২।	এক মহিয়সী রমণীর আদর্শ জীবন	305

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

«إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ
فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ»

অর্থাৎ “নারী যদি তার পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, স্বামীর অনুসরণ করে এবং লজ্জা স্থানের হেফায়ত করে। তাকে বলা হবে তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর, জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে।”

(মুসনাদে আহমদ, তিবরানী)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদের আরম্ভ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾

অর্থঃ “হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে
আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো
না।” (সূরা আলে ইমরানঃ ১০২)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

অর্থঃ “হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি
তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদীয় সহধর্মিণী
সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন
এবং সে আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে
অপরকে তাগাদা কর এবং আত্মীয়তাকেও ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহই
তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী।” (সূরা নিসাঃ ১)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا﴾

অর্থঃ “হে মু’মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তাহলে তিনি তোমাদের কর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।” (সূরা আহযাবঃ ৭০-৭১)

والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله، الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

মুসলমানদের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি ও তাদের অবস্থার সংশোধন প্রকৃত ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কখনও সম্ভব নয়। কুরআন, সহীহ হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে স্বর্ণাঙ্করে ভেসে উঠবে খ্যাতনামা নারী-পুরুষ মহামনীষীগণের উজ্জ্বল ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। বাজারে পুরুষদের সম্পর্কে লিখিত গল্প-কাহিনী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকলেও নারী হলো, মূল জনসংখ্যার অর্ধাংশ ও পুরুষের সহোদর; কিন্তু তাদের সম্পর্কে মূল সূত্র ভিত্তিক পুস্তক রচনা অতি বিরল। যার ফলে ইসলামে নারীর কি মর্যাদা ও অবস্থান সে সম্পর্কে বর্তমান সমাজে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

অতএব এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আন্তর্জাতিক ইসলামী পুস্তক প্রকাশনী “দারুস সালাম”-এর মাননীয় মহা পরিচালক জনাব আব্দুল মালেক মুজাহিদ স্বর্ণাঙ্করে লিখিত ইসলামী ইতিহাস গবেষণা করে খ্যাতনামা, স্বনামধন্য মুসলিম রমণীদের উজ্জ্বল ও দৃষ্টান্তমূলক বেশ কিছু ঘটনাবলী একত্রিত করে উর্দু ভাষায় একটি চমৎকার পুস্তক সংকলন করেন। যার তিনি নামকরণ করেন “সুনহারে কিরণে” যার বঙ্গানুবাদ করে নামকরণ করা হয় “সোনালী কিরণ।”

এর মাধ্যমে আশা করি আজকের দিশাহারা ও স্বীয় আদর্শচ্যুত রমণীগণ সহ সব ধরনের রমণীদের জন্য রয়েছে উত্তম পাথেয়, নির্দেশনা ও উপদেশাবলী।

যার আলোকে তারা উজ্জ্বলিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে সোনালী কিরণ গ্রহণ করতঃ অনুসরণীয় রমণীদের সোনালী জীবনের ন্যায় স্বীয় জীবন গড়ে তুলবে।

আল্লাহ তায়ালা এর সংকলক অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফফান

রিয়াদ, সৌদি আরব।

গ্রন্থকারের বাণী

যখন আমি ইতিহাস গ্রন্থাবলী গবেষণায় মগ্ন ছিলাম এবং বিশেষ বিশেষ ঘটনাসমূহকে চিহ্নিত করছিলাম, তখন আমি অনুধাবন করলাম যে, মুসলিম রমণীদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনাও তাতে কম নেই। সুতরাং আমি সে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, “সোনালী পাতা”র পর দ্বিতীয় গ্রন্থ “সোনালী কিরণ” নামে রমণীদের ঘটনা সম্পর্কে হওয়া উচিত।

ইসলাম নারীদেরকে যে সম্মান দান করেছে এবং তাদেরকে যেরূপ মূল্যায়ন করেছে তা বিশ্বের দ্বিতীয় কোন ধর্ম বা মতবাদ আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। আর দিতেও পারবে না। সত্যই ইসলাম ব্যতীত আর কোন ধর্মে কি পাওয়া যাবে যে, মায়ের চরণ তলে জান্নাত? আর কোন ধর্মের গুরু কি আপনাকে একথা বলবেন যে, আমাদের সেবা করা এবং উত্তম ব্যবহারের সর্বাধিক অধিকার হলো আমাদের জননীদেব। আর প্রকৃতপক্ষে জন্মের পর শিশুর শারিরীক ও মানসিক বৃদ্ধির একমাত্র উপায় হলো জননী। শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা পালন করতে অনেক ধৈর্য, মমতা এবং প্রচুর শ্রমের প্রয়োজন হয়। যা পুরুষের সামর্থ্যের বাইরে। আর তা কত কঠিন কাজ একমাত্র নারীই বুঝতে পারে যে, এ গুরু দায়িত্ব পালনে তাদের কত রকমের কষ্টের শিকার হতে হয় ও কত কত অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হয়, কিভাবে রাত্রি জাগরণ করতে হয়। এরপর আবার দিনের বেলায় শিশুর লালন-পালনের কঠিন কষ্ট বরদাশত করতে হয়।

জাতিকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলায় সেই সব অধ্যায়সমূহে নারীদের দূরদৃষ্টি এবং মেধার প্রয়োজন হয়। মানবতার মূল বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন সম্পর্কে ধারণাও অতি বেশি প্রয়োজন। তেমনি ধর্মীয় শিক্ষারও প্রয়োজন হয়। পরিবর্তিত বিশ্বের গতি সম্পর্কেও অবগত হতে হয়। অতঃপর এভাবে নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নতুন প্রজন্ম নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হয়। এভাবে এক রমণী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে থাকেন, কখনও সে একজন মা, নানী, দাদী, বোন, কন্যা, খালা, ফুফু হিসেবে অথবা বউ, শাশুড়ী বা স্ত্রী হিসেবে সম্মানিত হন।

নারীর ব্যক্তিত্বের এমন সকল দিক যাতে তার মেধা, বীরত্ব, পরহেজগারী প্রকাশ পায় সেগুলিই এই বইয়ের অলংকার। উপস্থাপিত সকল ঘটনাবলী হৃদয়গ্রাহী এবং সত্য; কিন্তু আমার অনুরোধ হলো যে, ঘটনাগুলোর প্রশংসা ও সমালোচনায় বিভোর না হয়ে যেন এর থেকে শিক্ষা আর উপদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়।

আমি এক্ষেত্রে আমার সহধর্মিনীর পরিপূর্ণ সহযোগিতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যিনি বইটি চমৎকার ও তার ঘটনাবলী চয়নের ব্যাপারে এবং সার্বিক ক্ষেত্রে পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদানে সদা তৎপর ছিলেন।

রিয়াদ দারুস সালামের গবেষণা বিভাগের অন্যতম সদস্য জনাব রিজওয়ানুল্লাহ রিয়াযি ও কারী মুহাম্মাদ ইকবাল সাহেবদ্বয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, যারা গ্রন্থটি পূর্ণতায় আমার সহযোগিতা করেছেন। আনন্দের বিষয় যে, দারুস সালামের লাহোর শাখার সিনিয়র গবেষক সম্মানিত মুহসিন ফারানী সাহেব এটিকে পুনজ্ঞানু পুনজ্ঞানুরূপে পড়েছেন এবং ঘটে যাওয়া ত্রুটি-বিচ্যুতিকে চিহ্নিত করে সংশোধন করেন।

এই কিতাবটি মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। এজন্য অন্যান্য ভাষায়ও এর অনুবাদ হওয়া প্রয়োজনবোধ করি। তাই বাংলা ভাষায় অনুবাদের জন্য জনাব আব্দুর রব আফফানকে (দায়ী' ও অনুবাদক, পশ্চিম দ্বীরা ইসলামিক সেন্টার) দেয়া হয়। আলহামদুলিল্লাহ তিনি তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন বলে আমার বিশ্বাস এবং দারুস সালামে কর্মরত বর্ণবিন্যাসকারী ও ডিজাইনার জনাব আসাদুল্লাহসহ যাঁরা এ গ্রন্থ প্রকাশনায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা।

আমার প্রত্যাশা, এ গ্রন্থটি পড়ে শুধু মহিলা ও বাচ্চাদের মধ্যেই মজার ধুম ও আকর্ষণ সৃষ্টি হবে না; বরং পুরুষ পাঠকদেরও এর যথেষ্ট ধারণা হয়ে যাবে যে, সাহসীকতা, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও সহনশীলতার মহৎ গুণও পরিপূর্ণতার সাথে মহিলাদের মধ্যে থাকে। আপনি বইটি পড়া শুরু করুন এবং মুসলিম রমণীদের বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের দৃশ্য অবলোকন করুন।

আবদুল মালেক মুজাহিদ

জেনারেল ম্যানেজার

চাঁদ আমার ঘরে

মুয়াত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ থেকে বর্ণিত, যে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ

«رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي، فَوَصَفْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ»

“আমি স্বপ্নে দেখেছি তিনটি চাঁদ আমার ঘরে পড়েছে। আমি আমার স্বপ্ন আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (স্বীয় পিতা)-কে বর্ণনা করি।”

তাবক্বাত ইবনে সা‘আদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি করেছ? আমি উত্তরে বললামঃ

«أُولَئِهَا وَلَدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»

“আমি ব্যাখ্যা করেছি আল্লাহর রাসূলের সন্তান জন্ম নিবে। এই কথা শুনে আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নীরব থাকেন।

অতঃপর যখন রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তেকাল হয়ে যায়, আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আয়েশার ঘরেই দাফন করা হলো, তখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর (স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বরূপ) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكَ وَهُوَ خَيْرُهَا»

“তোমার তিন চাঁদের একটি হলো এই, আর তা অন্য দু’টি থেকে উত্তম।” (মুয়াত্তা ইমাম মালেকঃ জানাযা অধ্যায়, মৃতকে দাফন করার পরিচ্ছেদঃ ১/২৩২)

পরবর্তীতে আবু বকর সিদ্দিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও আয়েশার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) গৃহে দাফন হয়।

নারী সাহাবীর মুখাপেক্ষীহীনতা

একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পাকানো কিছু গোশত পরিবেশন করলেন এবং আবেদন জানালেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটা কোন মুখাপেক্ষী মুসলমানের জন্য রেখে দিন।

সে সময় রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে দরিদ্র মুসলমান যারা ছিলেন সকলেই খাবার খেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের মধ্যে কি কারো গোশতের প্রয়োজন আছে? সকলেই বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সবাই খাবার খেয়েছি আমাদের প্রয়োজন নেই।”

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ “হে আবু হুরায়রা* এই গোশত নিয়ে অমুক মহিলা আনসারী সাহাবীকে দিয়ে এসো।”

টিকাঃ আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনি একজন উচ্চ মর্যাদার সাহাবী ছিলেন। তাঁর নাম আব্দুর রহমান বিন সাখার আদদাউসী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ডাক নাম আবু হুরায়রা রেখে ছিলেন। তাঁর মাতা মায়মুনা বিনতে সাফিহ বিন হারিস ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বিশাল হাদীসের ভান্ডার বর্ণনা করেন। তিনি হাফেজ সাহাবীদের মধ্যে গণ্য। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে আটশত অথবা এর চেয়েও অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সত্যবাদী, হাফেজ, দ্বীনদার, ধার্মিক, আবেদ, পরহেযগার এবং সৎ আমলের পাবন্দ ছিলেন।

তিনি সপ্তম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধের বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শেষ জীবন পর্যন্ত রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সংস্পর্শে থাকেন। কেবলমাত্র সেই সময়ই বঞ্চিত ছিলেন যখন আলা বিন হায়রামীর সাথে বাহরাইনের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন।

তিনি ৫৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং ওয়ালীদ বিন উতবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। তিনি নিজ গৃহ আকীকে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তাঁর লাশ মদীনায় নেয়া হয়। আর সেখানে লোকজন জানাযার নামায পড়েন এবং বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়। (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন)।

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) গোশত দেয়ার জন্য দরজায় আওয়াজ করলেন। ভিতর থেকে শব্দ আসলোঃ কে?

উত্তর দিলেনঃ আবু হুরায়রা।

মহিলা জিজ্ঞেস করলেনঃ আবু হুরায়রা ভালো আছেন তো?

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার ও আপনার সন্তানদের জন্যে এই গোশত পাঠিয়েছেন।

একথা শুনে তিনি বলতে লাগলেনঃ “রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমার সালাম দিবেন আর আমার পক্ষ থেকে একথা বলবেন যে, (আল্লাহ তায়ালা আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন) আমার সন্তানরা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে গেছে।”

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ এই গোশত রেখে দিন। আগামীকাল আপনার শিশুরা ঘুম থেকে উঠলে খেয়ে নিবে। আত্মনির্ভরশীল আল্লাহর উপর ভরসা করিণী আনসারী মহিলা উত্তরে বললেনঃ হে আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আপনি প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করবেন যে, তিনি কি কাল পর্যন্ত আমার শিশুদের জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারবেন? হে আবু হুরায়রা! এই গোশত নিয়ে যান এবং এমন লোককে দিয়ে দিন যে আমাদের থেকে বেশি দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী।

তার চোখ খুলে গেল

বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে আবু মাসউদ বদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

«إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»

“যদি কোন ব্যক্তি সওয়াবের ইচ্ছায় স্বীয় পরিবারের জন্য খরচ করে তাহলে তা তার জন্যে সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।” (বুখারী- ৫৫, মুসলিম- ১০০২)

আর অন্য এক হাদীসে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

«إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَجَرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي أَمْرَاتِكَ»

“তুমি যা-ই খরচ কর যদি তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে তবে তুমি তাতে নেকী ও প্রতিদান পাবে। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর মুখে এক লোকমা খাবার দাও এরও নেকী তুমি পাবে। (বুখারী-১২৯৫, মুসলিম-১৬২৮)

এখন তৃতীয় একটি হাদীস সহীহ মুসলিম থেকে উল্লেখ করি। পরিশেষে আমরা এই তিনটি হাদীসের উপর আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

আবু যর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেনঃ

«وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»

“তোমাদের কেউ স্ত্রী মিলন করলে তাতেও নেকী ও সওয়াব রয়েছে।”

সাহাবীগণ হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

«يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَّتِي أَحَدْنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟»

“হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ নিজের যৌন চাহিদা পূরণ করে আর তাতেও নেকী রয়েছে?”

উত্তরে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এরশাদ করেনঃ

«أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟»

“তোমরা কি জান না যে সে যদি হারাম পথে তার চাহিদা পূরণ করত তবে কি তার পাপ হতো না?”

«فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».

“তেমনিভাবে সে যদি হালাল পন্থা অবলম্বন করে তবে তার জন্য রয়েছে নেকী।” (মুসলিম-১০০৬)

এই তিনটি হাদীস যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তাতে বিশুদ্ধতায় কোন সন্দেহ নেই।

উল্লেখিত হাদীসগুলোতে নারীদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবনের সুসম্পর্ক গড়ার আর পরস্পর বিরোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বর্ণনা করা হয়েছে।

বর্তমান সভ্যতার যুগে যেসব পারিবারিক বিরোধ ও অশান্তি সৃষ্টি হয় তা এই হাদীসগুলো নিয়ে ভাবলে ও গবেষণা করলে তার পরিপূর্ণ সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে সমান্যতম কথায় স্ত্রীকে তালাক তালাক তালাক বলে পরিবারকে ধ্বংস করা হয়। শিশুরা লালন-পালন থেকে বঞ্চিত হয়। আর স্ত্রীকে অন্ধকার গুহার দিকে ঠেলে দেয়া হয়।

ইসলাম নারীকে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বিশ্ব-ব্যাপী নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্লোগানধারী সংগঠনগুলির দাবীতেও সেই মর্যাদার কথা নেই যা ইসলাম নারীদের দিয়েছে।

একটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে তা ভেবে দেখুন! আপনারা অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেনঃ উম্মুল মু’মিন আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

বলেন যে, একদিন আমার নিকট এক মহিলা তার দু'টি মেয়ে সন্তানসহ আসল এবং খাবারের জন্য কিছু চাইল। সে মুহূর্তে ঘরে কিছুই ছিল না একটি মাত্র খেজুর ব্যতীত। আমি সেই খেজুরটি মহিলাটিকে দিয়ে দিলাম। মহিলাটি সেই খেজুরটি দু-টুকরা করে তার দু'মেয়েকে দিয়ে দিল। তার অংশে কিছুই থাকলো না।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অবাক হলেন, কিছু সময় পর যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘরে আসলেন তিনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই ঘটনা বর্ণনা করলেন।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা শুনে বললেনঃ যা বর্তমান যুগের নারী অধিকার নামধারী সংস্থাগুলোর জন্য শিক্ষণীয়। তিনি এরশাদ করেনঃ

«مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا
مِنَ النَّارِ»

“যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। অতঃপর সে যদি উত্তমরূপে লালন-পালন করে তবে কিয়ামতের দিন এই কন্যা সন্তানরাই জাহান্নামের বাধা হয়ে দাঁড়াবে।” (বুখারী-১৪১৮, মুসলিম-২৬২৯)

এ হাদীসসমূহ যে কোন মুসলমান পরিবারের জন্য খুবই খুশির বিষয়। যখন কোন দ্বীনদার মা-বাবার ঘরে কন্যা সন্তান জন্ম নেয় তখন তারা খুব আনন্দ উপভোগ করে যে, তাদের এই সন্তান জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করবে। এমন মা-বাবা যাদের কাছে কেবলমাত্র কন্যা সন্তানই আছে অথবা ছেলে সন্তান থেকে কন্যা সন্তান অধিক। তাদের কোন আপত্তি নেই কন্যা জন্ম হওয়াতে; বরং খুশিই প্রকাশ হওয়া উচিত কেননা কন্যা সন্তানরাতো আল্লাহর রহমত নিয়ে আসে।

ইতিহাসে একটি মজাদার ঘটনা পাওয়া যায়। যা নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

এক ব্যক্তির কেবলমাত্র কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। প্রত্যেকবার সে আশা করত যে, এবার একটি ছেলে সন্তান জন্ম নিবে; কিন্তু প্রত্যেকবার

কন্যা সন্তান জন্ম হতো। এমনভাবে তার কাছে ছয়টি কন্যা সন্তান হয়ে গেল। আবারও তার স্ত্রীর সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সময় এলো। সে ভয় পাচ্ছিল যে, আবার না কি কন্যা জন্ম নেয়? শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করলো এবং সে সিদ্ধান্ত নিল যে, এবার যদি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে স্ত্রীকে তালাক দিবে।

তার এই বিপথগামী সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করুন! তার স্ত্রীর কি অপরাধ? অতঃপর রাতে ঘুমানোর পর এক আশ্চর্যময় স্বপ্ন দেখতে পেল। সে দেখতে পেল কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেছে। আর তার পাপ এত অধিক যে, জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত।

সুতরাং ফেরেশতাগণ তাকে ধরে জাহান্নামের দিকে নিয়ে চলল। প্রথম দরজায় গিয়ে দেখতে পেল যে, তার এক কন্যা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাকে জাহান্নামের দিকে নিতে বাধা দিল। ফেরেশতারা দ্বিতীয় দরজার দিকে নিয়ে চলল, সেখানে তার দ্বিতীয় কন্যা দাঁড়িয়ে যে তার বাধার সৃষ্টি করে। এখন ফেরেশতারা তৃতীয় দরজার দিকে ধাবিত হলো সেখানে তার তৃতীয় কন্যা দাঁড়িয়ে ছিল যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। তেমনিভাবে ফেরেশতারা যে দরজার দিকে তাকে নিয়ে যেত সেখানেই তার কোন না কোন কন্যা দাঁড়ানো পাওয়া যেত যে তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করত।

মোটকথা হলো যে, ফেরেশতারা তাকে ছয়টি দরজায় নিয়ে গেল; কিন্তু প্রত্যেক দরজায় তার কোন না কোন সন্তান বাধা সৃষ্টি করত। এখন সপ্তম দরজা বাকি ছিল। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে সেদিকে চলতে লাগল। সে মুহূর্তে তার ভিতরে ভীষণ ভয় সৃষ্টি হলো, আর সে ভাবতে লাগল যে এই দরজায় আমাকে রক্ষাকারী কে হবে? এতে সে বুঝতে পারে যে সে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা ভুল ও পথভ্রষ্ট সে শয়তানের প্ররোচণায় পতিত হতে চলে ছিল। ভীষণ ভয় অস্থিরতা ও আতঙ্কের জগত হতে তার চোখ খুলে গেল এবং সে মহান আল্লাহর নিকট হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করলঃ

«اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا السَّابِعَةَ»

“হে আল্লাহ! আমাকে সপ্তম কন্যা দান কর।”

এজন্য যাদের অন্তরে আল্লাহ নির্ধারিত ভাগ্যের উপর বিশ্বাস রয়েছে, তাদের কন্যা সন্তান জন্মলাভ দুশ্চিন্তার পরিবর্তে খুশি হওয়া উচিত। ঈমানের দুর্বলতার কারণে ভুল-বিশ্বাসী লোকদের এই ধারণা জন্মিয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ তার স্ত্রীর কারণেই এটা সুস্পষ্ট ভুল। এতে স্ত্রীর অথবা তার নিজের কোন হাত নেই; বরং স্বামী-স্ত্রী হলো এক মাধ্যম মাত্র। সৃষ্টিকর্তা তো একমাত্র আল্লাহ তায়ালা যার কোন অংশীদার নেই। তিনি যাকে চান ছেলে সন্তান দান করেন, আর যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন। আর যাকে চান ছেলে-মেয়ে উভয় দান করেন। আর যাকে চান নিঃসন্তান রাখেন। এমন অবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য হলো আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের উপর বিশ্বাস করা। আল্লাহ তায়ালা সূরা শু'রায় এরশাদ করেনঃ

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
إِنثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ ۝ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

“ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডলের আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ তায়ালায়। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা ছেলে সন্তান দান করেন অথবা ছেলে-মেয়ে উভয় সন্তান দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী এবং সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” (সূরা শুরাঃ ৪৯, ৫০)

হে মুসলমানগণ! তোমরাও কি?

জার্মানীর চ্যাম্পেলর তুরস্ক ভ্রমণে আগমন করলেন। তুরস্কের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় তাঁর অভ্যর্থনার এক অনন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করল। নিজস্ব সাংস্কৃতি ও সভ্যতা প্রদর্শন এবং রাষ্ট্রকে এক প্রগতিশীল রাষ্ট্র প্রমাণ করার জন্যে তারা কতিপয় স্কুলের যুবতী মেয়েদেরকে রাস্তায় বের করে। রাস্তার দু-পাশে যুবতী মেয়েরা বেপর্দায় ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি যেদিক দিয়ে অতিবাহিত হন ফুল সজ্জিত করা হয়।

জার্মান চ্যাম্পেলর যখন মেয়েদের পোশাকের দিকে দৃষ্টি দিলেন তার সামনে বেপর্দা ব্যতীত কিছুই ছিল না। তিনি রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ

“আমি যখন তুরস্ক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম, তখন আমি ভাবলাম আমি এক মুসলমান রাষ্ট্রে যাচ্ছি যেখানে আমি নারীদের মাঝে ইসলামী পর্দা ও ঐতিহ্য দেখতে পাব; কিন্তু এখনা তো আমার শুধু বেপর্দাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। ইউরোপে এই সভ্যতাই তো আমাদের ডুবিয়েছে। পারিবারিক জীবন ধ্বংস করেছে। আত্মীয়তার বন্ধন বিনষ্ট হয়েছে। সন্তানগণ তাদের পিতা থেকে পৃথক হয়ে গেছে। আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

“হে মুসলমানগণ তোমরাও কি...?”

দূর্ভাগ্যময় জীবন হতে সৌভাগ্যের পথে

সোমালিয়ার এক প্রসিদ্ধ শহর মুগাদিশোর এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে শিক্ষক, কর্মচারী, কর্মকর্তা এক ছাত্রের সুললিত কণ্ঠের গান শ্রবণে মগ্ন ছিল। এতো সর্বনাশা কণ্ঠ একজন বলে উঠল। প্রধান শিক্ষক বলল, আমি এত সুন্দর কণ্ঠের গান কখনও শুনিনি। এতো দাউদী (আলাইহিস সালাম) কণ্ঠ, একটি গান শেষ করে যখন সে প্রাচীন কবিতা আবৃত্তি করছিল, কেউ বলতে লাগল “এতো অল্প বয়সের আব্দুল্লাহর এ অবস্থা যখন সে বড় হবে তখন সে কি না করবে?

আমাদের এটা একটি গৌরবের বিষয় যে সে আমাদের স্কুলের ছাত্র। সুললিত কণ্ঠ এবং তার স্পষ্ট উচ্চারণ আব্দুল্লাহর দেয়া এক নেয়ামত যা অল্প বয়সের আব্দুল্লাহ গেয়েছিল। সে যত বড় হতে লাগল তার আত্মনির্ভরতা বাড়তে লাগল। এখন সে বড় বড় সমাবেশে নিজ কণ্ঠের যাদুর খেলা দেখায়, আর লোকেরা হতবাক হতে থাকে।

একবার শিক্ষামন্ত্রণালয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অফিসার তার কবিতা শোনলেন এবং ভাবতে লাগলেন যদি এই ছেলে রাষ্ট্রপতির সম্মানে কাব্য আবৃত্তি করে তবে খুবই মজার ব্যাপার হবে। সুতরাং আব্দুল্লাহর জন্য বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। এখন সে গানের সাথে সাথে বাজনারও দক্ষতা অর্জন করলো। মাধ্যমিক পাশের পর তার প্রসিদ্ধি বৃদ্ধি পেতে লাগল। সেকালের শিক্ষা মন্ত্রী তার কণ্ঠ শুনে হতবাক হলেন। তিনি স্কুলে বিশেষ আইন পাশ করলেন। স্কুলে গান-বাজনার প্রশিক্ষণ মূলক বিভাগের কার্যক্রম শুরু হলো। আর যুবক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক গান-বাজনার শিক্ষার সূচনা সরকারী দায়িত্বে শুরু হলো। এর প্রধান আব্দুল্লাহকে বানানো হলো।

স্কুল কলেজে বাজনার প্রশিক্ষণ শুরু হলো। রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক দল আসতে লাগল। আব্দুল্লাহর পরিচিতি আন্তর্জাতিক রূপধারণ করল। প্রতিবেশি দেশ জিবুতির লোকজন তার কণ্ঠ শোনার পাগল ছিল। তাকে বিভিন্ন এওয়ার্ড দেয়া হলো।

আব্দুল্লাহ যেখানেই যেত লোক তাকে এক নজর দেখার জন্য একত্রিত হয়ে যেত। বড় বড় হোটেলে কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই তার বুকিং চলত। যখন সে স্টেজে আসত অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনবরত তালি বাজত। যখন গান শুরু হতো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে যেত। তার উপাধি শাহানশাহ তারানুম ছিল।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সোমালিয়ায় বিপ্লব ঘটলো। রাশিয়ার ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমাপ্তি ঘটলো। সরকার পরিবর্তন হলো। তার গতি পাশ্চাত্যের দিকে ধাবিত হলো। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদির পরিবর্তে গণতন্ত্রের শোর উঠল। এক সফল ব্যবসায়ীর ন্যায় আব্দুল্লাহও তার গতি পরিবর্তন করল। এখন সে গণতন্ত্রের সাথে সুর মিলাতে লাগল। সে তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা ভাবল। অতঃপর সে একটি নাইট ক্লাবের মালিক হয়ে গেল। মুগাদিশোর প্রথম শ্রেণীর নাইট ক্লাব, যেখানে রাত জাগ্রত আর দিন ঘুমন্ত।

যুবক-যুবতীর একদল তার পার্শ্বে একত্রিত হতো। স্বদেশ ও বিদেশে তার প্রসিদ্ধি সমান তালে এখন সে বিভিন্ন দেশে এক্ষেত্রে যাত্রা শুরু করল।

আব্দুল্লাহ একবার সাক্ষাতকারে বললঃ “যখন আমি নাইট ক্লাবের মালিক হয়ে গেলাম, তখন আমি সেখানে গান গাইতাম। মুগাদিশোর হোটেল, নাইট ক্লাব অধিক থেকে অধিক অর্থের প্রস্তাব দিত। রাতকে জাগ্রত, লোকদের খুশি করার জন্যে এবং নিজেকে আরও বেশি জনপ্রিয় করার জন্য প্রত্যহ আমি নতুন নতুন অভিনয়ের উদ্ভাবন করতাম। নগ্ন নাচ, অশ্লীল কথা এবং প্রেমের গানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন আমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছিল। আর এসব কিছুই ব্যবস্থা থাকলে তো শয়তান খুবই খুশি হয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য, মদ, নিশা, হিরোইন সব কিছুই ব্যবস্থাই ছিল। শয়তানী উদ্দেশ্য লাভের জন্য আমাদের পাশে খারাপ লোকের এক বড় গ্রুপ ছিল। সে মূহুর্তে ইসলামের বিরুদ্ধে দেশে সরকারী লবি দিন-রাত কাজ করছিল। উলামা, সৎলোক এবং মসজিদগুলোকে টার্গেট করা হচ্ছিল।

যখন কুফর ও ইসলাম পরস্পর দ্বন্দ্ব চলতে থাকে তখন শয়তানী শক্তি আরও সুন্দর চেহারায় সামনে আসে। আমিও ইসলামী ঐতিহ্য ও ক্ষমতা ধ্বংসের জন্য এবং শয়তানী অনুষ্ঠান গুলোকে মুক্ত করার জন্যে সমস্ত শক্তি-

সামর্থ্য ব্যয় করেছি। কেবল নামে মাত্র মুসলমান ছিলাম। প্রাণবিহীন ইসলাম... বাহ্যিক সীমারেখা-----। এভাবে আমি অনেক ইউরোপীয় রাষ্ট্র ভ্রমণ করেছি। সেখানে নাইট ক্লাবে গান গাইতাম। সোমালীয় আর্টকে উজ্জ্বল করে যাচ্ছিলাম। পাশ্চাত্যকে খুশি করার জন্য আমরা প্রমাণ করতাম আমরা প্রগতিশীল জাতি। আমার ঈমান, ইসলাম ও চরিত্রের জানাযা হতে থাকে; কিন্তু বড় আকারে আমার পকেট গরম হতে থাকে।

১৯৮৩ সালে আমার বাবা আমাকে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। মা-বাবার জন্য সন্তানের বিবাহ খুব খুশির বিষয়। পিতা-মাতা নিজেদের বংশের এক মেয়ে পছন্দ করে নিল। এমনিতো আমার সাথে বিবাহের আকাঙ্ক্ষী সোমালীয় অনেক মেয়েরাই ছিল; কিন্তু এই মেয়ে আমার বংশের ছিল। সুন্দরী, বহুগুণী এবং ভাল শিক্ষিতা ছিল। সুতরাং আমি হাজার হাজার মেয়েদের উপর তাকে প্রাধান্য দেই এবং বিয়ের জন্য তাৎক্ষণিক রাজি হয়ে যাই। কয়েকদিন পরেই বিয়ের ধুম-ধাম শুরু হলো। এক শিল্পীর বিয়ে নিশ্চয়ই অনেক স্মৃতিময়। সমস্ত সোমাল থেকে গায়করা আসল। টেলিভিশন, খবরের কাগজের সংবাদিকরা একত্রিত হলো- নিশ্চয়ই এটা ছিল খুবই স্মরণীয় দিন।

“বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে আমি অনুভব করলাম যে, আমার স্ত্রীকে এত বেশি খুশি দেখা যাচ্ছে না, যে পরিমাণ খুশি আমার মত প্রসিদ্ধ সুখ্যাত এক পুরুষের সাথে বিয়েতে খুশি হওয়া ও গর্ব করা উচিত।

আমি বিষয়টিকে তার লাজুক স্বভাবের উপর ধরে নিলাম। বিয়ের পর আমি হানিমুনে মধু চন্দ্রিমা উৎযাপনে চলে গেলাম। এই দিন এত দ্রুত চলে গেল ভাবতেও পারিনি।

পুনরায় আমি আমার ডিউটিতে নিয়োজিত হয়ে গেলাম। আমার কাজ রাতে শুরু হতো। আমি ফজরের পূর্বে বাড়ি ফিরে শুয়ে যেতাম এবং আসরের পর উঠতাম। আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি যে, যখন আমি ফজরের সময় বাড়ি ফিরতাম আমার স্ত্রীকে জাগ্রত অবস্থায়, আর প্রায় সময়ই তার হাতে কোরআন পাক থাকত যা সে পড়তে থাকে। আমি তাকে রাতের কাজের বর্ণনা খুব আবেগে বলতে থাকতাম। আমি বলতাম আজ আমার

জন্য কত নায়ীকারা দেওয়ানা। আজ কত ছেলে-মেয়েদের ফোন আসল। আমার স্ত্রী এসব অবজ্ঞার সাথে শুনত আর আমার জন্য হেদায়েতের প্রার্থনা করত। এর মধ্যে ফজরের আযান হয়ে যেত আর সে জায়নামাযের দিকে অগ্রসর হত। আর আমি নামায না পড়েই ঘুমিয়ে যেতাম। আমি যখনই তাকে নাইট ক্লাবের বর্ণনা দিতাম সেখানের কথা শুনাতে, নিজের আয়ের কথা জানাতাম ব্যাংক ব্যালেন্সের কথা বলতাম; তখন সে উত্তর করত রিযিকদাতা কেবলমাত্র আল্লাহ।

আমাদের বিয়ের পাঁচ বছর অতীত হলো। আমি বিরামহীনভাবে নিজ শিল্পকলায় নিমজ্জিত এবং পাপাচারে ডুবে ছিলাম। নামায, ইবাদত ছাড়াই জীবন কাটতে থাকে। হঠাৎ আমাদের মাঝে এক গণ্ডগোল দেখা দিল। আর তা ১৯৮৮ সালের কথা। আমার স্ত্রী আমাকে বললঃ “আমি এমন ব্যক্তির সাথে কখনই জীবন কাটাতে পারি না যে পালনকর্তার ইবাদকারী নয় তার আয় রোজগার হারাম। যে ফজরের সময় বাড়ি ফিরে।”

আমার কল্লনাও ছিল না যে, আমার স্ত্রী আমার বিষয়ে এমন ভাবতে পারে। সারকথা ঘরে ঝগড়া শুরু হলো। আমি তার কথা শুনেও না শুনার মতই ভাব দেখাতাম।

আর কিছু দিন অতীত হলো। একবার যখন আমি বাড়ি প্রবেশ করলাম তখন ফজরের আযান হচ্ছিল। শহরের মসজিদগুলো থেকে আযানের কণ্ঠ ভেসে আসছিল। চতুর্দিক “আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ধ্বনিতে মুখরিত হচ্ছিল।

اللَّهُ أَكْبَرُ . . . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

যখন আমি ঘুমানোর জন্য আমার রুমে যেতে লাগলাম সেই মুহূর্তে আমার স্ত্রী আমাকে বলতে লাগলঃ “আপনি মসজিদে নামাযের জন্য কেন যান না? আপনি কি আযান শুনেও পান নি?”

“আমার জীবনে এটা এমন এক প্রথম মুহূর্ত ছিল যে, আমাকে কেউ নামাযের জন্য আদেশ করল। সে মুহূর্তে আমিও নামায পড়ার বিষয়ে

ভাবলাম। আমার শরীরে কাপন সৃষ্টি হলো। স্ত্রীর কণ্ঠ বার বার কানে ভেসে আসছিল। সে সময় মুসলমানরা মসজিদে যাচ্ছে। আপনি কেন মসজিদের দিকে যান না? এটা দয়াবান প্রভুর পক্ষ থেকে আহ্বান। এরপর আমার মস্তিষ্কে ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব শুরু হলো। স্বভাবজাত আদর্শ বুলন্দ হতে লাগলো: তোমার নাম কত ভাল “আব্দুল্লাহ” তুমি আল্লাহর বান্দা; কিন্তু না তুমি শয়তানের চেলা, কখনও তুমি প্রভুর সামনে মাথা বুকাওনি। তুমি কত কাল বেঁচে থাকবে? কত দিন প্রাণ-বায়ু টিকে থাকবে? এই যৌবন কি বিলীন হয়ে যাবে না? আমার সামনে অতীত আসতে লাগল আর আমার অন্তর ধিক্কার দিচ্ছিল---কিন্তু অন্য দিকে আমার প্রসিদ্ধি, টেলিভিশনের পর্দায় আমার প্রচার, স্টেজের সম্মান আমি কি স্ত্রীর কথা মেনে নিব? আর এসব কিছুই ত্যাগ করব? না এমনটি সম্ভব নয়? এ মর্যাদা ও সম্মান, প্রতিপত্তি অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা বহু শ্রমের বিনিময়ে লাভ করেছে। এসব ভাবতে ভাবতে অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়ে পড়লাম।”

“সন্ধ্যা বেলা আমি আমার কাপড় পরিবর্তন করলাম। ক্লাবে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। আমার স্ত্রী অশ্রু ঝরানো নয়নে আবেগ আপ্ত হয়ে আমার বাহু স্পর্শ করে মিষ্টি ভাষায় বলতে লাগল: “সামান্য সময় আমার পার্শ্বে বসে আমার কিছু কথাতো শুনেন? আল্লাহ কি আমাদের রিযিকদাতা নন? এক লোকমা হালাল হাজারো লোকমা হারাম থেকে উত্তম।

আমি মানসিকভাবে নিজেকে পরিবর্তন অনুভব করলাম যে, স্ত্রীর কথা তার উপদেশ নিঃসন্দেহে সঠিক। তার মধ্যে সততা রয়েছে। এটা সত্যের আহ্বান ---- কিন্তু ---- আমার শিল্পকলা ----- আমার কণ্ঠ ---- আমার খ্যাতি? আমি দ্রুত বের হয়ে গেলাম ----- কোথাও আবার আমার স্ত্রীর কথা না গ্রহণ করি?” রাস্তায় আমার স্ত্রীর কথা আমার পিছু করছিল, শেষ পর্যন্ত আমি নাইট ক্লাবের দরজায় পৌঁছে গেলাম। সে মুহূর্তে এশার নামাযের সময় হয়ে গেল। আমার কানে মুয়াজ্জিনের সুললিত কণ্ঠের আযান ধ্বনি আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করতে লাগল।

حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ... حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ

“স্ত্রীর উপদেশ মনে পড়ল----- আল্লাহর রহমতের ঢেউ বইতে লাগল। মন থেকে পাপ-কলুষতা দূর হতে লাগল----- ঈমানের উষ্ণতা এবং ইসলামের শক্তি নাড়া দিয়ে উঠল ----- এবং আমি নাইট ক্লাব থেকে মসজিদমুখী হয়ে গেলাম।”

আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। অযু করে জামাআতে নামায আদায় করলাম। অনেক নামাযী আমাকে চিনতে পারল। কেউ হাত মিলাচ্ছিল, কেউ দূর থেকে সালাম করছিল। তাদের চেহারা খুশির ঝলক প্রকাশ পাচ্ছে। আর আমার চেহারা খুশিতে চমকাচ্ছিল। আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) আমি হক পেয়ে গেলাম।”

কেউ আমাকে সহীহ বুখারী গ্রন্থটি উপহার হিসেবে দিলেন। এটা এখন আমার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আমি এখন নতুন মডেলের দামী গাড়িতে উঠলাম আর তার গন্তব্য স্থল নাইট ক্লাবের পরিবর্তে নিজ বাড়ির দিকে হলো। আমার স্ত্রী যে, আমাকে ফজরের সময় ঘরে আসতে দেখতে পেত আজ এশার পর দেখলো।

আমার স্ত্রীর দিকে অগ্রসর হলাম “বেগম” তোমাকে মোবারকবাদ----- আমি আজ গান থেকে তাওবা করেছি। আমি নাচ-গান পাপাচারের জীবন যাত্রাকে তিন তালাক দিয়েছি। আমি নিষ্ঠার সাথে তাওবা করেছি। আমি আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে গেছি।”

অতঃপর আমি অনুভব করলাম যে, আমি এক নতুন জীবন সূচনা করেছি। সুতরাং সর্বপ্রথম আমার কাজ সেই স্টুডিও যার মালিক ছিলাম আমি যাতে গান রেকর্ড করা হতো, যাতে বিভিন্ন প্রকারের বিশ্বের অত্যাধুনিক মেশিনসমূহ ছিল, যে সব মেশিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এনে একত্রিত করেছিলাম। আমি সেই স্টুডিওকে আল্লাহর দীন প্রচারের কাজে ওয়াকফ করে দিলাম, যেন এখন সেখানে কোরআন পাকের ক্যাসেট, উলামায়ে কেরামের ওয়াজ এবং ইসলামী গান রেকর্ড হবে। আমি আমার দামী গাড়িটি বিক্রয় করে দিলাম। আমার সৌন্দর্যময় ভবন বিক্রি করে দিয়েছি। আমি একটি মধ্যম শ্রেণীর বাসায় উঠলাম। এখন আমি আমার সময় বাসায় কাটাতে লাগলাম। আমার একটিই আশা ছিল----- একই জিনিসের তালাশ

ছিল----- আমি হালকায়ে কোরআনে যোগ দিলাম----- এখন আমার কোরআনে কারীম মুখস্ত করার দৃঢ় সংকল্প ছিল।

কিছুদিন পর্যন্ত ভালই কাটল---- কিন্তু যখন কেউ ইসলামের পথে চলবে অবশ্যই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এটাই বিধাতার বিধান। সত্যের পথে অনেক সমস্যা অবশ্যই আছে। দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত।

আব্দুল্লাহর সর্বপ্রথম অগ্নি পরীক্ষা হলো অর্থের অভাব। সে গান গাওয়া ব্যতীত কোন কাজ জানত না। এই গান ত্যাগের পর অর্থ উপার্জনের তার কোন মাধ্যম ছিল না। পূর্বের অর্জিত সম্পদ হারাম ছিল। সুতরাং তাতে কোন বরকত ছিল না। কিছুদিন গেল, সপ্তাহ কতক পার হলো আয়ের কোন উৎস তৈরি হলো না। যে ব্যক্তি সারাটি জীবন উচ্চাবিলাসিতায় কাটিয়েছে, এখন তার কঠিন দারিদ্রতা---- শয়তান তাকে অনেকবার পথভ্রষ্ট করতে চেয়েছে---- অতীতের স্মৃতি মনে পড়ল--- কিভাবে সম্পদের উপর খেলতাম আর এখন দু'মুঠো খাবারের জন্য হাহাকার --- আমি কি পূর্বের জীবনে ফিরে যাব? কিন্তু ঈমানের দাবী ছিল অন্য কিছু। এর মাঝে একদিন তার পূর্বের বন্ধুগণ তার সাক্ষাতে আসল। তারা তার বর্তমান অবস্থা দেখে খুব দুঃখ প্রকাশ করল। লোভের জাল ফেলল। বললঃ আব্দুল্লাহ এক রাত আমাদেরকে দাও কেবল একটি রাত ---- আর এর প্রতিদান? ----- তুমি ভাবতেও পারবে না। যা তুমি পূর্বে এক রাতে আয় করতে তার চেয়ে দ্বিগুণ---- তিন গুণ --- পাঁচ --- সাত --- নয় ---- আমরা তোমাকে দশগুণ বেশি দিতে প্রস্তুত একবার হ্যাঁ বলে দাও।” কিন্তু আল্লাহর উপর বিশ্বাস যখন অটল হয়ে যায় তখন এক বিপ্লব ঘটে যায়। কঠিন পাহাড়ও রাস্তা করে দেয়---- ঈমান --- আর এর বিপরীতে দুনিয়ার সকল সম্পদ, বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বও কোন মূল্য রাখে না। আব্দুল্লাহর হৃদয়ে প্রভুর ভালোবাসা দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল। সকল প্রকার লোভ-লালসা তার অন্তর থেকে বিদায় নিয়েছিল। “আমি আল্লাহকে খুশি করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।”

পরবর্তী পরীক্ষা শুরু হলো। সরকার জানতে পারল আব্দুল্লাহ গান থেকে তওবা করে নিয়েছে। তার এত বড় স্পর্ধা? --- তাকে তলব করা হল

জিজ্ঞাসা করা হলো, তাকে সাবধান করা হলো যে, তোমার এই সিদ্ধান্ত একেবারে অযৌক্তিক এবং বোকামী। এক ব্যক্তি বললঃ ছেড়ে দাও কিছু দিনের ব্যাপার --- নিজে নিজেই ফিরে আসবে ----- অতপর কতক বুদ্ধিজীবী নামের কিছু লোক আব্দুল্লাহর সাথে আলোচনায় বসল। আলোচনার শেষে তারা বুঝতে পারল যে, এই আব্দুল্লাহ সেই আব্দুল্লাহ নয় যে ১৮ বছর কলাকার ছিল। এ অন্য কোন আব্দুল্লাহ। তারা বুঝতে পারল এই আব্দুল্লাহ এখন আল্লাহর পথের দিশারী।

আর যখন আলোচনা বিফলে গেল, কোন ভাবেই সফল হলো না, তখন তারা অন্য কৌশল অবলম্বন করল যা পালনকর্তার বিপক্ষ শয়তানী শক্তি অবলম্বন করে থাকে যুগে যুগে।

তাকে ভয় দেখানো হলো, হুমকি দিলো--- তোমাকে টেলিভিশনের পর্দায় আসতে হবে এবং একথা ঘোষণা দিতে হবে- “আমি যে গান গাইতে অস্বীকার করেছিলাম এখন আমি আবার ফিরে এসেছি। সেটা আমার ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। আর তা সাময়িক ছিল।

আর যদি তুমি আমাদের কথা না শোন তবে তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু এক ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান ব্যক্তি যার দৃঢ় বিশ্বাস তার প্রভুর সাহায্যের তার সিদ্ধান্তে সে অটল থাকল এবং বলতে লাগল “ তোমরা যদি আমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলো তবুও আমি তোমাদের কথা শুনতে প্রস্তুত হব না।”

এমন পরিস্থিতিতে তাগুতি শক্তি সাধারণত হকের আওয়ায বন্ধ করার জন্য যে নীতি গ্রহণ করে তা জেলে বন্দী করা, নজর বন্দী করে রাখা ও মামলা-মোকদ্দামা চলতে থাকে। সুতরাং তারা সফল হওয়ার জন্য এই পদ্ধতিও গ্রহণ করলো। তাকে জেলে বন্দী করা হলো তাতে হতে পারে তার মত থেকে সে ফিরে আসে। তার কি অপরাধ? নাচ-গান করতে অস্বীকৃতি জানানো।

হ্যাঁ, এতো খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে জেলখানায় বন্দী করা হলো। কেননা সে এই কথার ঘোষণা করেছিল যে, আমার প্রভু আল্লাহ। আর যদি সে তাদের কথা মেনে নিত। গান বাজনাকে নিজের জীবনের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে

নিত তবে তার ইজ্জত সম্মান, মর্যাদা, খ্যাতি সব কিছুই টিকে থাকত। আর তারা তাকে কাঁধে বসাত।

আব্দুল্লাহ দীর্ঘদিন জেলে বন্দী থাকে। তাকে অনেক প্রকার শাস্তি দেয়া হয় যেন সে আবার পূর্বের জীবনে ফিরে আসে; কিন্তু আল্লাহর বান্দা নিজ দৃঢ় সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকে। জেলে এক দীর্ঘ সময় কাটানোর পরও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি। সরকার তার আশা ছেড়ে দিল। আর তাকে মুক্তি দিয়ে দিল।

জেল থেকে বের হওয়ার পর জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হয়ে গেল; কিন্তু এই কঠিন অবস্থায় তার স্ত্রী তার সাথে ছিল। তার প্রত্যয় তার স্ত্রী আরও বৃদ্ধি করতে লাগল যে, এই ধন-সম্পদ এ বিশ্ব নশ্বর সবই ধ্বংস হবে। আর প্রকৃত ধনী ব্যক্তি সে নয় যার কাছে ধন-সম্পদ রয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে ধনী সেই যার মন ধনী। প্রকৃত শক্তি ঈমান ও আকীদার শক্তি।

প্রকৃত আনন্দ, কল্যাণ ও সৌভাগ্যময় জীবন কার নাম তা একমাত্র আল্লাহর অনুসরণ আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টিতেই রয়েছে।

১৯৯০ সালে আব্দুল্লাহ নিজ মাতৃভূমি ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল। এমনিতেই দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল। গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন গোত্র পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ হত্যা রাহাজানিতে ডুবেছিল এবং সেই সময়কালে আব্দুল্লাহ প্রথমবার আল্লাহর ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসল যে ঘরের যিয়ারত ও তাওয়াফের ইচ্ছা দুনিয়ার প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে বিরাজ করে। সে পবিত্র মক্কা নগরীতে পৌঁছে গেল। আর তার পরহেযগার স্ত্রী ও তার সাথে ছিল। উমরা আদায় করল আর তার ঈমানী শক্তি আরও বৃদ্ধি পেতে থাকল। পবিত্র মক্কায় কতিপয় দ্বীন দরদী ও কল্যাণকামী ব্যক্তি তাঁর আগমন সম্পর্কে অবগত হন, যারা তাঁর অতিবাহিত ও অতীত জীবন এবং ইসলামের উপর দৃঢ়তা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অতঃপর তারা আব্দুল্লাহকে তাদের দায়িত্বে নিয়ে নিল। তাকে সম্মান করল। তাকে স্পন্সরশীপ দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে দশ পারা কোরআন মুখস্ত করে নিল। তার প্রিয় মাতৃভূমিতে যে চরম গৃহযুদ্ধ চলছিল। সেই মুহূর্তে সে

সংস্কারকের দায়িত্ব পালন করল। সে মাতৃভূমিতে ফিরে গেল। গোত্রসমূহের সাথে সন্ধি চুক্তি করার চেষ্টা করল। বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য নিজের খ্যাতি ও সুপরিচিতির ব্যবহার করল। এখন তিনি একজন ইসলাম, ঈমান, কোরআন ও হাদীসের প্রচারক। অতঃপর এরই মাঝে কয়েকবার উমরার উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় আসেন। এরপর পবিত্র মক্কা নগরীতে মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব নেয়ার সুযোগ আসল। আব্দুল্লাহ আজও সে মুয়াজ্জিন। সে মুয়াজ্জিন ইসলামের আওয়াজ সেটা সৌদিতে হোক অথবা সোমালিয়ায়। সর্বস্থানে দ্বীনের দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছে। আর না জানি কত গোনাহগার পাপী তার হাতে তাওবা করছে।

আর নিজের জীবনকে কোরআন হাদীসের অনুকরণে পরিচালিত করছে যাতে তারাও প্রকৃত সত্য জীবন পেয়ে যায়। যেমনঃ আব্দুল্লাহ প্রকৃত সুখী জীবনকে পেয়েছে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! নিশ্চয়ই হেদায়েত আল্লাহর হাতে। তবে আব্দুল্লাহর হেদায়েতের মাধ্যম তার স্ত্রী, যার দৃঢ়তা তাকে সরল পথের পথিক হতে বাধ্য করেছে। আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা নিঃসন্দেহে সত্যঃ

«الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

“দুনিয়া হলো এক সম্পদ আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সম্পদ হলো সৎ স্ত্রী।”
(মুসলিমঃ ১৪৬৭, আহমদঃ ১৬৬/২)

বায়ান্ন লাখ দেহহাম তবুও যাকাত

ফরয হয়নি!!

একবার আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কন্যা খেজুরের বীচি মাথায় করে মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে মদীনা শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উটের উপর আরোহিত অবস্থায় সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শালিকাও ছিলেন এবং ফুফাতো ভাই যুবায়ের বিন আওয়ামের স্ত্রীও। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উট চালককে নির্দেশ করলেনঃ “থাম, থাম আসমাকে আরোহণ করিয়ে নেই।” তিনি আসমাকে আরোহণ করতে বললেন। আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ “আমি আমার স্বামীর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে ভাবলাম এবং উটের উপর উঠতে অস্বীকার করলাম।” (বুখারীঃ ৫২২৪, মুসলিমঃ ২১৮২)

প্রশ্ন আসে যে, আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উটে চড়তে অস্বীকৃতি জানালেন কেন? আল্লাহর রাসূলের সাথে উটে বসতে অস্বীকৃতি? তিনি মা'সুম, পবিত্র নবী, তবে কি স্বামী নারাজ হতো? কখনও নয়। তা কি করে সম্ভব? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আসমার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজ স্বামীর প্রতি অতি আনুগত্যতা ফরমাবরদারী আর তার স্বামীর আত্মমর্যাদার প্রতি সম্মানবোধ রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথেও আরোহণ হতে অস্বীকার করলেন।

কিছু দিন পর তাঁর শ্রদেয় পিতা আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার জন্যে একটি ঘোড়া ও তার দেখা শুনার জন্যে একটি খাদেম নির্ধারণ করে দিলেন।

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজ স্বামীর সাথে সমস্যার দিনগুলোতে ধৈর্যধারণ করেন, সংকটাপূর্ণ মুহূর্তের সময় কাটালেন এবং এর পরিণামে আল্লাহ তায়ালা বিপুল পরিমাণে অর্থ সম্পদ দান করেন। আর যখন যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুবরণ করেন, আপনি জানেন আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পরিত্যক্ত সম্পদের কি পেয়েছিলেন?

সেই মহিলা যে খেজুরের গুচ্ছ একত্রিত করে নিজে বহন করে আনত তিনি ৫২, ০০, ০০০ (বায়ান্ন লাখ দিরহাম) ওয়ারাসাতে পেলেন। আর তা যুবায়ের বিন আওয়ামের হারামের সম্পদ অথবা আত্মসাৎ করা সম্পদ ছিল না। আর না তিনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে কারো থেকে নিয়ে একত্রিত করেছেন; বরং তিনি বাণিজ্য করেছেন এবং বৈধ পন্থায় অর্জন করেছেন। এমনও বলা হয় যে, আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর স্বামীর এক হাজার শ্রমিক ছিল যারা তার জন্য কাজ করত এবং তাদের পারিশ্রমিক দিত। এত পরিমাণ ধন-সম্পদ রাখার পরেও যাকাত ফরয হয়নি। কেননা তিনি কখনও ধন-সম্পদ জমা করেননি।

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট যখন কিছুই ছিল না দারিদ্রতাই দারিদ্রতা ছিল। সে অবস্থায় হায় হতাশ করেননি। আর যখন প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হলেন তাতে তিনি কোন অহংকার প্রতিপত্তি দেখাননি। আর সারা জীবন কল্যাণময় কাজে ও মানুষের উপর ইহসান ও সেবায় কাটিয়েছেন। (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহ তার উপর খুশি থাকুন। (উসদুল গাবা- ৩০৯/২)

সম্ভাব্য স্বামীর সাক্ষাতকার

২১শে জানুয়ারি ২০০১ সালে যখন প্যারিস বিমান বন্দর হতে শহরের দিকে যাত্রা করছিলাম আর এখানে মুসলমান অধিবাসী সম্পর্কে ভাবছিলাম যে এখনতো এই অমুসলমান অধ্যুসিত স্থানে অনেক মুসলমানের বসবাস। তাদের মধ্যে অধিকাংশ বাহিরের রাষ্ট্র থেকে আগত। কিছু সংখ্যক মুসলমান এখানের স্থায়ী বাসিন্দাও আছে। যাদের মাঝে ইসলামের সামান্যতম পরিচয়টুকুই শুধু রয়েছে। আমি বিশেষ করে মুসলমান শিশুদের বিষয়ে ভাবছিলাম। আমি আমার সাথে গাড়ি চালানোরত বন্ধু আমার আক্বাদকে জিজ্ঞাসা করলামঃ

এই অনৈসলামিক পরিবেশে মুসলমানদের সন্তানদের ইসলামের সাথে কেমন সম্পর্ক?

আমের আক্বাদ দু' যুগ ধরে এখানে বসবাস করেছে। শাম দেশের প্রসিদ্ধ শহর হালবের বাসিন্দা। শিক্ষার জন্যে এসেছিলেন, পরে কিতাবের ব্যবসা তাকে আকৃষ্ট করল। অতঃপর বন্ধুদের সাথে মিলে মাকতাবাতুস সালাম নামে এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন যা প্যারিসে ইসলামী পুস্তকের সর্বোবৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। তিনিই প্যারিসে দারুস সালামের প্রতিনিধি ও এজেন্ট।

তিনি আমার কথায় কিছুক্ষণ ভেবে বললেনঃ “এমনিতো ভাল-মন্দ লোক সব স্থানেই আছে; কিন্তু কিছু দিন পূর্বে আমাদের সাথে এক ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাটি শোনাতে আপনার ধারণা হয়ে যাবে যে, এখানের মেয়েদের মধ্যেও দ্বীন ইসলামের শিক্ষা অর্জনের প্রতি কত বেশি আগ্রহ?

তিনি বলতে লাগলেনঃ “আমার এক প্রিয় বন্ধু বেশ অনেক কাল থেকে এখানের বাসিন্দা এবং ভাল রোযগারও করেন; কিন্তু এখন পর্যন্ত ঘর-সংসার করতে পারেন নি। একদিন আমার কাছে এসে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে লাগল। সে উপযুক্ত পাত্রীর খোঁজে ছিল। আরবী শব্দে সে আমাকে “বিনতে হালাল” (সৎলোকের কন্যা) তালাশ করতে বলল।

আমি বললামঃ ঠিক আছে যাদের মেয়েরা বিয়ের বয়সে পৌঁছেছে আমি তাদের মধ্যে উপযুক্ত দেখে প্রস্তাব দিয়ে দিব।

সুতরাং এক স্থানে কথা শুরু করলাম। মেয়ের বাবা মরক্কোর অধিবাসী। দীর্ঘদিন থেকে এখানে বসবাস করছেন। তার সন্তানরা এখানেই জন্ম নিয়েছে। সুতরাং ফ্রান্সের ভাষা আরবী ভাষাকে গ্রাস করে নিয়েছে। মেয়ের বাবা-মার সাথে কথা হলো তারা বললেন আমাদের তো কোন আপত্তি নেই। পাত্র উপযুক্ত। মেয়ের বয়সও ২০/২১ বছর হয়ে গেছে। সে নিজেও বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত। তার সাথে পরামর্শ করে বলব।

কথা সামনে চলতে লাগল। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে সম্পর্ক অবশ্যই হয়ে যাবে, কেননা উভয়ের মধ্যে সাম্যতা ছিল। সুতরাং উভয় পক্ষ দিনক্ষণ নির্ধারণ করল যে, ছেলে-মেয়ে উভয়েই সাক্ষাত করুক আর উভয় পক্ষ পরস্পর কথাও বলুক, যাতে পরিপূর্ণরূপে সিদ্ধান্ত নেয়া যায়।

তাদের সিদ্ধান্ত সাক্ষাতের জন্যে রেলওয়ে স্টেশন নির্ধারিত হলো। সুতরাং ছেলে-মেয়ে উভয়েই একটু দূরে গিয়ে বসে গেল, মেয়ের বাবা-মা, আমার স্ত্রী এবং আমি তাদেরকে দূর থেকে দেখছিলাম। হঠাৎ মেয়ে তার মানি ব্যাগ থেকে কিছু কাগজ বের করল এবং ছেলের সামনে রাখল। আমি আশ্চর্য হলাম যে এ বিষয়টি কি?

আমি মেয়ের মাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এটা কি? তিনি বললেনঃ বিষয়টি হলো আসলে আমার মেয়ে পাত্রের সার্বিক জীবন সম্পর্কে জানার জন্যে কিছু প্রশ্নপত্র তৈরি করেছে। এর উত্তরের আলোকেই সে তার জীবন সঙ্গী বানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। প্রশ্ন আরবী ও ফ্রান্স উভয় ভাষাতেই ছিল; কিন্তু অধিকাংশ ফ্রান্স ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আমার বন্ধু এই ভাষা বেশি জানত না। সে আমাকে দূর থেকে ইঙ্গিতে ডাকল, যাতে আমি এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখাতে তার সহায়তা করি। তিন পৃষ্ঠায় লেখা প্রশ্নপত্র। প্রথম পৃষ্ঠায় তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যেমনঃ নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, উচ্চতা, ওজন, পেশা, শিক্ষা, ব্যবসা, চাকরি, বাড়ি নিজের না পরের বাসায় ভাড়া, কতক্ষণ সময় ডিউটি করেন? আর বেতন কত ইত্যাদি। এটা একটি সাধারণ প্রশ্ন ছিল যার উত্তর আমার বন্ধু লেখে নিল; কিন্তু মূল প্রশ্ন পরবর্তী দু'পৃষ্ঠায় ছিল।

তাতে প্রশ্ন কিছু এমন ছিল যে, আপনার ইসলাম ও ধর্মের সাথে কি পরিমাণ সম্পর্ক আছে?

পাঁচ ওয়াক্ত নামায আপনি আদায় করেন না কি?

ইসলামের জন্য কত সময় আপনি ব্যয় করেন?

কোরআন পাকের কি পরিমাণ আপনার মুখস্ত আছে?

মাসে আপনি কতবার কোরআন তেলাওয়াত করেন?

হাদীসের কোন্ কিতাব আপনি পড়েছেন?

আর কত হাদীস আপনার মুখস্ত আছে?

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের অধিকার সম্পর্কে আপনি এক পৃষ্ঠা লিখেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী গ্রন্থ কোনটি আপনি পড়েছেন?

আপনি কি কখনও দরসের হালকায় অংশ গ্রহণ করেছেন?

যদি অংশগ্রহণ করে থাকেন তবে কোন আলেম ছিলেন? আর আপনি উনার নিকট কোন কিতাব পড়েছেন?

আমের আক্বাদ বলছিলেনঃ আমি সেই মেয়ের প্রশ্ন পত্র পড়ছিলাম। আর অবাক দুনিয়ায় হারিয়ে যাচ্ছিলাম যে, এমন পরিবেশেও ইসলামের সীমাহীন ভালোবাসার মেয়েরা এখানে রয়েছে।

এক প্রশ্ন এটাও ছিল যে, আপনার কি ছেলে সন্তানের প্রতি বেশি আগ্রহ না মেয়ে সন্তানের প্রতি?

বিয়ের পর প্রথম যে সন্তান জন্ম হবে তার নাম আপনি কি রাখবেন? আপনি আপনার জীবন সঙ্গীনির কি ধরণের গুণ দেখতে পছন্দ করেন? মূলতঃ এই প্রশ্নপত্র ছিল তার সারা জীবনের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে অবগত হওয়া। এসব প্রশ্নের উত্তর এক ব্যক্তি পড়লে নিঃসন্দেহে এক ব্যক্তির জীবনের প্রতিচ্ছবি পরিপূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়।

“তবে কি আপনার বন্ধু সকল প্রশ্নের ঠিক উত্তর লিখেছিলেন?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আক্বাদ বললঃ “কেন দিতে পারবে না? সে সকল প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে।”

আচ্ছা তবে আবার এই বিয়ে বাস্তবে রূপ নিল কি না? “না মুজাহিদ ভাই এই বিয়ে হয়নি। মেয়ে তার প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি এবং তার মাতা-পিতাকে বলে দিল যে আমার এমন স্বামী দরকার নেই যে তার প্রভুর সাথে নিষ্ঠাবান নয়। যে নিজ স্রষ্টার শুকর গুজার নয় সে আমার সাথে কাল কি ব্যবহার করবে?”

আর আমি ভাবছিলাম যে, সত্যিকার অর্থে যদি আমাদের সন্তানরা নিজের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে নিজের সম্ভাব্য স্বামীর দ্বীনদারী, নিজ প্রভুর ফরমাবরদারী সম্পর্কে জেনে নেয়। তবে তাদের ভবিষ্যত জীবন নিঃসন্দেহে সুখময় কাটবে।

এবার দ্বিতীয় আরেকটি চিত্র লক্ষ্য করুন। আমাদের এক পরিচিতজন বললেন যে, তার মেয়ে খুব বেশি ফ্যাশন প্রিয়। নিজ পোষাক, ঘর, এমন কি জুতার ফ্যাশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। ঘরে প্রবেশ করলে প্রত্যেক বস্তুতে আপনাকে একই রূপ দৃষ্টি গোচর হবে। তার পছন্দ এত বেশি এবং খুবই সুন্দর যে মানুষ অবাক হয়ে যায়। আর ক্রয়-বিক্রয়ে তার বিশেষ দক্ষতা। কোন কিছু ক্রয়ের প্রয়োজন পড়লে বাজারে গিয়ে খুব যাচাই-বাছাই করবে।

একবার তার এক জোড়া জুতা ক্রয় করার প্রয়োজন ছিল। সে চার ঘন্টা পার করেছিল এক দোকান থেকে দ্বিতীয় দোকান, দ্বিতীয় দোকান থেকে তৃতীয় দোকান কোন স্থানেই তার মডেল পছন্দ হচ্ছিল না। কোথাও জুতার রং ভাল ছিল না। কোথাও চামড়া নিম্নমানের আবার কোথাও খ্যাতিমান কোম্পানীর ছিল না, কোন দোকান আবার এত বড় ছিল না যা গুরুত্ব দেয়া যায়, আল্লাহ আল্লাহ করে এক বড় দোকানে গেল। দাম উপযুক্ত ছিল কোম্পানী খ্যাতিসম্পন্ন ছিল, জুতার রংও ভাল ছিল; কিন্তু হয় ভাগ্য জুতা অল্প সংকীর্ণ ছিল তাও নেয়া হলো না।

অতঃপর একবার ডিসকাউন্টে জুতা বিক্রি শুরু হলো। সেই বড় কোম্পানী অতি অল্প দামে জুতা বিক্রি শুরু করল। মূলতঃ তারা অন্য এক স্থানে শো রুম খুলে ছিল। এজন্য তাদের পুরাতন স্টকের মাল বের করার প্রয়োজন ছিল। এবার এই মেয়ে তার বান্ধবীদেরকে ফোনের উপর ফোন করতে লাগল যে চলো আমরা সবাই এক সাথে মার্কেটে যাই। জুতা এমন কিনতে হবে যে চামড়া অরিজিনাল, নকল না হওয়া চাই, আন্তর্জাতিক কোম্পানীর হওয়া চাই, রংও আসল হওয়া চাই। আর পায়ের মোলায়েমতা টিকিয়ে রাখবে। জুতা পরে হেলে দুলে চলা যায়। মডেল এত সুন্দর নতুন হবে লোক যাতে দেখতে থাকে। এরপর কথা হলো সমাজে মর্যাদা ও সম্মানের বিষয়টিও তো রয়েছে। হ্যাঁ এটাও দেখতে হবে যে, জুতা পানিতে ভিজ়ে গেলে পানির কোন প্রভাব না ফেলতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

হ্যাঁ, বন্ধুরা! সকল প্রকার প্রচেষ্টার ফলেও চাহিদা অনুযায়ী জিনিস পাওয়া গেল না। সমস্ত চেষ্টাই বিফলে গেল সকল পরিকল্পনা মাটিতে মিশে গেল; কিন্তু হঠাৎ নতুন কথা মনে পড়ল। তার বড় ভাই ইউরোপে প্রায়ই যাতায়াত করে। সে ভাবল আমি তাকে কেন জুতার মাপ দিয়ে দিই না? নিজের ভাইকে জিজ্ঞাসা করলঃ ভাইয়া আপনি ইউরোপে কবে যাচ্ছেন?

উত্তরে বললেনঃ আমি দশ দিন পর যাব কিন্তু কেন? আপনি ইউরোপ থেকে আমার জন্য এক জোড়া সুন্দর জুতা কিনে নিয়ে আসবেন কি? ভাই বললেনঃ আরে এটা কোন ব্যাপার হলো? তুমি এমন কর যে যেমন জুতা তোমার প্রয়োজন তার পরিপূর্ণ বর্ণনা একটি কাগজে লিখে দাও। তোমার চাহিদা অনুযায়ী জুতা নিয়ে আসব।

এখন সে লেখা শুরু করলঃ জুতার কালার, ধরণ, মডেল, যুগের শ্রেষ্ঠ কোম্পানী ইত্যাদি ইত্যাদি----- বেশ দীর্ঘ এক পত্র ভাইয়ের হাতে দিয়ে দিল।

ভাইয়ের যাত্রার সময় দ্বিতীয়বার স্মরণ করিয়ে দিল যে, আমি হেলে দুলে চলতে চাই। আমার জুতার কথা ভুলে যেও না। অতঃপর সে তার ভাইয়ের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল। ভাই ফিরে আসা মুহূর্তেই প্রশ্ন করল আমার চাওয়া? আমি খুব দুঃখিত যে, আমি তোমার চাহিদা পূরণ

করতে পারি নি। যে মানের জুতা তুমি চেয়েছিলে তা পাওয়া যায় নি। আই এম সরি।

আর আমি ভাবতে শুরু করলাম যে, এসব নারীদের উপর অবাক হতে হয় নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের নির্বাচনে, পছন্দ করতে এত যাচাই-বাছাই, শ্রম ও গুরুত্ব দেয় ও সময় ব্যয় করে; কিন্তু আমাদের নারীগণ আর তাদের পিতা-মাতা কখনও স্বামীর নির্বাচনে কি এত চেষ্টা ও গুরুত্ব দিয়ে থাকে? জুতা পরে তো এই দুনিয়াতে হেলে দুলে চলতে হবে। যদি স্বামী ভাল পাওয়া যায় জান্নাতে প্রবেশের জন্য বাহন হয়ে যায়। আখেরাতের সুখ-শান্তি এবং জান্নাতে হেলে দুলে চলার জন্য কি চেষ্টা করা হয়? উপযুক্ত জুতার জন্য তো এত বড় প্রশ্নপত্র আর উপযুক্ত স্বামী নির্বাচনে এক প্রশ্নও নয়?

এক মহিলা আমার স্ত্রীকে বললঃ আমার স্বামী আমাকে মার-পিট করে এবং গালি-গালাজ করে। আমার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাস করলঃ একথার উত্তর দাও যে, যখন তোমার বিয়ে হয়েছিল তখন কি তোমার স্বামী নামায পড়ত?

সে বললঃ না।

সে কি সিগারেট পান করত?

উত্তর দিল হ্যাঁ।

অতঃপর জিজ্ঞাসা করল তার সমাজের সাথে উঠা-বসা চলা-ফেরা কেমন ছিল?

উত্তর দিল যে, ভাল ছিল না।

আমার স্ত্রী তাকে বললঃ সুপ্রিয় বান্ধবী যে নিজের প্রভুর অধিকারে অবহেলা করবে আর তার নাফরমানী করবে সে তোমার অধিকারে তার থেকে বেশি গাফেল থাকবে। নারীটি বলতে লাগল যে, প্রথম প্রথম এমন তো ছিল না। খুব ভালো, উত্তম ব্যবহার এবং আমার দেওয়ানা ছিল। আমাকে খুশি রাখার চেষ্টা করত।

আমার স্ত্রী বললঃ প্রথম প্রথম তুমি নব বধু ছিলে আর সে তোমার যৌবন সুধা পান করে তৃপ্তি পেত। বোন! হায় তুমি বিয়ের পূর্বে নিজের সম্ভাব্য স্বামীর চরিত্র আর তার দ্বীনদারি সম্পর্কে যদি যাচাই করে নিতে আজ তোমার এ সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হতে হতো না।

(এই প্রবন্ধটি লেখকের ডায়েরী থেকে নেয়া হয়েছে।)

যদি স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামতে হয়

ইমাম শা'বীর (রহঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলতে লাগলঃ আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি এবং বিয়ের পর জানতে পেরেছি যে, সে ল্যাংড়া। আমি কি তাকে তার বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিব?

ইমাম শা'বী (রহঃ) বলতে লাগলেনঃ যদি তোমাকে স্ত্রীর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতে হয় তবে তো অবশ্যই তাকে ত্যাগ করা উচিত আর যদি এমনটি না হয় তবে-----!!

স্বামীকে পরাজিতকারী এক বুদ্ধিমতি রমণীর কাণ্ড

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর উপর বিরক্ত হয়ে তাকে সর্বাবস্থায় তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। একদিন দেখল তার স্ত্রী সিঁড়িতে চড়েছে। সে তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্যে করে বললঃ “শোন যদি তুমি উপরে উঠ তবে তুমি তালাক, সিঁড়ি দ্বারা নিচে নামলেও তালাক আর যদি দাঁড়িয়ে থাক তবুও তালাক।

সেই মহিলাটি তার স্বামীর দিকে এক দৃষ্টি তাকাল অলক্ষণে ভাবল। তারপর তার স্বামী তাকে দেখতে পেল যে সে এক লাফ দিয়ে নিচে নেমে গেল।

স্বামী তার কথার উপর দুঃখ প্রকাশ করল। সে তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্যে করে বললঃ আমার মাতা-পিতা তোর জন্য উৎসর্গ। তুমি কত বড় বুদ্ধিমতি, যদি ইমাম মালেক (রহঃ) ওফাত পেয়ে যান তবে হতে পারে মদীনাবাসী ফতোয়া তলবের জন্যে তোমার কাছেই আসবে।

বুদ্ধিমতি পাত্রীর সন্ধানে তিন প্রশ্ন

নাম তার শান, আরব দেশে তার পরিচিতি ছিল খুব বুদ্ধিমান ও মেধাবী ব্যক্তি হিসেবে। মানুষ তার জ্ঞানগর্ভ কথা ও গভীর অর্থবোধক বাণী শোনে খুব আনন্দ ভোগ করত এবং খুশি হত। অনেক দূর দূর এলাকায় তার সম্মান ছিল। তার বয়স বিয়ের উপযুক্ত হলো। বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। তার আশা ছিল তার মত এক মেধাবী এক স্ত্রী পাওয়ার। সে সিদ্ধান্ত নিল এবং বলল আমি নিজেই বিভিন্ন এলাকায় যাব এবং আমার জন্য আমি পাত্রী খোঁজে বের করব।। একদিন সে উক্ত উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামের দিকে যাত্রা শুরু করল।

সবেমাত্র নিজ গ্রাম থেকে বেরই হয়েছিল এক ব্যক্তি পেয়ে গেল। সেও সেই গ্রামের দিকেই যাচ্ছিল। উভয়েই চলতে লাগল। শান বলতে লাগলঃ সাথী-

«أَتَحْمِلُنِي أَمْ أَحْمِلُكَ؟»

“তুমি কি আমাকে বহন করবে না কি আমি তোমাকে বহন করবো।”

সেই ব্যক্তি উত্তরে বললঃ

«يَا جَاهِلُ! كَيْفَ يَحْمِلُ الرَّائِبُ الرَّائِبَ؟»

হে মূর্থ এক আরোহী কি অন্য আরোহীকে কখনও বহন করে?

কিছু দূর গেল। পাকা ফসল ভরা ক্ষেত দৃষ্টিতে পড়ল।

শান বললঃ

«أَتَرَى هَذَا الزَّرْعَ قَدْ أُكِلَ أَمْ لَا؟»

“তোমার কি ধারণা এই ক্ষেতের ফসল কি খাওয়া হয়ে গেছে? না কি খাওয়া হয়নি?”

উত্তরে ব্যক্তিটি বললঃ

«يَا جَاهِلُ! أَمَا تَرَاهُ قَائِمًا؟»

হে মূর্খ বোকা তুমি কি দেখ না ক্ষেতের ফসল এখনও কাটাই হয়নি?

আরও কিছু দূরে যাওয়ার পর এক লাশ নিয়ে যেতে দেখল। শান তার সাথীকে বললঃ

«أَتَرَى صَاحِبَ هَذَا النَّعْشِ حَيًّا أَمْ مَيِّتًا؟»

এই লাশ ব্যক্তিটি মৃত না কি জীবিত?

এবার তার সাথী ধৈর্য হারা হয়ে গেল। বলতে লাগলঃ দুনিয়াতে অনেক মূর্খ দেখেছি; কিন্তু তোমার মত এত বোকা কোথাও কাউকে দেখিনি। তুমি কি কোন জীবিত ব্যক্তির লাশ কবরস্থানের দিকে যেতে দেখেছ?

এরই মাঝে তারা তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেল। আর সেই ব্যক্তিটি তার পরিবারের সকলের সাথে রাস্তার ঘটনা বর্ণনা করল এবং সকল কথা বলল। তার এক কন্যা ছিল যার নাম “তাবকা”।

মেয়েটি বলতে লাগলঃ বাবা! সেই ব্যক্তির এই কথা বলা “তুমি আমাকে বহন করবে না কি আমি তোমাকে বহন করবো” এর অর্থ হলো, সে আপনার সাথে কথোপকথন করতে চেয়েছিল যাতে করে কথা বলতে ও শুনতে সময় কেটে যায়।

আর সেই ব্যক্তির এই কথা বলা যে, “তোমার কি ধারণা ক্ষেতের ফসল খাওয়া হয়ে গেছে না কি খাওয়া হয়নি?”

এর অর্থ হলো এমনতো নয় যে ক্ষেতের মালিক এই দাঁড়ানো ফসল বিক্রি করা মূল্য খেয়ে নিয়েছে।

আর মুসাফিরের এই বলা যে, “লাশ জীবিত না কি মৃত?” এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সে কি তার পিছনে নেক সন্তান অথবা মৃত্যুর পর সওয়াব পাবে এমন কোন কাজ রেখে গেছে যাতে করে তার কল্যাণময় কাজ স্মরণীয় হয়ে থাকে।”

একথা শুনে মেয়ের বাবা শানকে তালাশ করতে করতে পেয়ে গেল। আর তাকে নিজের কন্যার কথাগুলো শোনাল। শান বললঃ আমি এমন মেয়ের খোঁজেই বের হয়েছিলাম।

সুতরাং শান সেই মেয়েকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দিল। অতঃপর বিয়ে করে নিজের গ্রামে নিয়ে আসল। লোকজন যখন মেয়েটির এমন মেধা দেখলো ও জানতে পারল; তখন সবাই অনিচ্ছায় বলে উঠলঃ

«وَأَفَقَ شَنْ طَبَقَةً»

“শান-তাবকা উভয়ের পরস্পরে বুদ্ধিমত্তায় যে মিল তা যেন সোনায়ে সোহাগা।”

অতঃপর এটা প্রবাদ বাক্যে রূপান্তরিত হলো।

রামলা (ﷺ) -এর সৌভাগ্য

তিনি আবু সুফিয়ানের কন্যা ছিলেন। তাঁর নাম রামলা আর ডাকনাম উম্মে হাবীবা ছিল। তিনি তার স্বামী উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে হিজরত করে হাবশায় চলে গেলেন। তাঁর স্বামী ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করল এবং মৃত্যুবরণ করল।

একদিন উম্মে হাবীবা স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে কেউ তাকে উম্মুল মু'মেনীন বলে ডাকছে। তিনি তাতে অবাক হলেন। নিজে নিজে স্বপ্নের এই ব্যাখ্যা করলেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বিয়ে করবেন।

উম্মে হাবীবা বলেনঃ আমার ইচ্ছা শেষই হয়েছিল, হঠাৎ একদিন নাজ্জাশীর দূত আমার বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছল। আমি অনুমতি দিলে আবরাহা নামের এক দাসী আমার ঘরে প্রবেশ করল।

বলতে লাগলঃ “বাদশাহ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আর বলেছেনঃ “উম্মে হাবীবার কাছে গিয়ে বলে দাও যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাদশাহকে চিঠি লিখেছেন, যাতে তিনি উম্মে হাবীবার সাথে বিয়ের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

আমি দাসীকে বললামঃ «بَشْرُكَ اللهُ بِخَيْرٍ»

তোমাকেও আল্লাহ সুসংবাদ দিন। (আরবীয়রা যখন কোন কথায় খুশি হয় তখন এই প্রকার বাক্য বলে থাকে। যাতে খুশির প্রকাশ ঘটে।)

অর্থাৎ আমি আমার পক্ষ থেকে সম্মতি জানাচ্ছি।

দাসী আরও বললঃ বাদশাহ এও বলেছেন যে, আপনি আপনার পক্ষ থেকে কোন ওলী নির্ধারণ করে দেন, যে ব্যক্তি আপনার বিয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে।

সুতরাং আমি খালেদ বিন সাঈদ বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ওলী নির্ধারণ করলাম এবং আবরাহা নামী দাসীকে সুসংবাদ দেয়ার খুশিতে নিজের হাতের রূপার আংটি এবং রূপার দু'টি চুড়ি দিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বাদশাহ নাজ্জাশী জাফর বিন আবু তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে এবং সেখানে উপস্থিত অন্যান্য মুসলমানদের নিয়ে মিটিংয়ে বসলেন এবং আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনার পর তিনি বললেনঃ

«أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَزُوجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ
بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، فَأَجَبْتُ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَقَدْ أَصْدَقْتُهَا أَرْبَعِمِائَةَ دِينَارٍ»

“আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট পত্র লিখেছেন যেন আমি তাঁকে আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবার সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করি। আমিও আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিদ্ধান্তটাকে পছন্দ করলাম এবং আমি তার দেন-মোহর চারশত দিনার ধার্য করলাম।

অতঃপর নাজ্জাশী উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সামনে দেন মোহরের অর্থ আদায় করে দিলেন। এরপর উম্মে হাবীবার উকীল খালিদ বিন সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা বর্ণনার পর উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেনঃ

«أَمَّا بَعْدُ! فَقَدْ أَجَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ
وَزَوَّجْتُهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، وَبَارَكَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ»

“নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর সিদ্ধান্তকে খুবই পছন্দ করেছি এবং আমি তাঁকে উম্মে হাবীবার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম আর আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলের প্রতি বরকত নাযিল করুন।

«اجْلِسُوا فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا تَزَوَّجُوا أَنْ يُؤْكَلَ الطَّعَامُ
عَلَى التَّرْوِيجِ»

অতঃপর যখন মিটিং শেষ হতে লাগলো তখন হাবশার বাদশাহ বললেনঃ সকলেই বসুন, নিশ্চয় নবীদের নিয়ম হলো যখন তারা বিয়ে করেন তখন বিয়ের ওলীমার দাওয়াত খেতে হয়।

সুতরাং নাজ্জাশী খুব উত্তমরূপে ওলীমার ব্যবস্থা করলেন। বিয়ের পর নাজ্জাশী শুরাহবিলের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাথে উম্মে হাবীবাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে মদীনায পাঠালেন।

উম্মে হাবীবার সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন তার পিতা আবু সুফিয়ান কাফের অবস্থায় মক্কা বিজয়ের পূর্বে তার ঘরে আসলেন এবং নিজ কন্যার ঘরে বিছানায় বসতে চাইলেন, তখন তার কন্যা পিতাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিছানায় বসতে নিষেধ করলেন এবং বললেনঃ এটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র বিছানা আর আপনি মুশরিক এবং মুশরিক অপবিত্র। সুতরাং আপনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিছানায় বসার যোগ্য নন।”

একথা বলে বিছানা গুটিয়ে রাখলেন। উম্মে হাবীবার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ওফাত ৪৪ হিজরীতে হয়। *

আপনার মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন

জুলাইবীব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এক আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁর কাছে না কোন সম্পদ ছিল আর না কোন খ্যাতিপূর্ণ বংশের সাথে সম্পর্ক ছিল। ক্ষমতালী ব্যক্তিও ছিলেন না। আত্মীয়তার সংখ্যাও নগণ্য ছিল। শ্যামলা রংয়ের ছিলেন; কিন্তু আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভালবাসা তার হৃদয়ে প্রবল ছিল। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিঁড়া জামা নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে হাজির হতেন। জ্ঞান অর্জন করতেন রাসূলের সাথে থেকে জীবনকে ধন্য করতেন।

একদিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দয়ার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন এবং এরশাদ করলেনঃ

«يَا جُلَيْبُ! أَلَا تَتَزَوَّجُ؟»

“হে জুলাইবীব তুমি বিয়ে করবে না?”

উত্তরে জুলাইবীব বললেনঃ আমার মত ব্যক্তিকে কে বিয়ে করবে?

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেনঃ “জুলাইবীব তুমি বিয়ে করবে না?”

উত্তরে তিনি বললেনঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার সাথে কে বিয়ে করবে? না আমার অর্থ আছে, না আছে আমার প্রভাব প্রতিপত্তি! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তৃতীয়বারও জিজ্ঞাসা করলেনঃ “জুলাইবীব! তুমি বিয়ে করবে না?”

উত্তরে তিনি পুনরায় তাই বললেনঃ “আল্লাহর রাসূল আমার সাথে কে বিয়ে করবে? না আমার বংশ মর্যাদা আছে? আর না অর্থ সম্পদ?”

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেনঃ

«إِذْهَبْ إِلَى ذَاكَ الْبَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقُلْ لَهُمْ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَلِّغُكُمُ السَّلَامَ وَيَقُولُ: زَوْجُونِي ابْتَتِكُمْ»

“অমুক আনসারীর বাড়ি যাও এবং তাকে বল যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাকে সালাম দিয়েছেন এবং তিনি বলছেন যে, আপনি নিজের কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দেন।”

জুলাইবীব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুশি খুশি আনসারীর বাড়িতে গেলেন এবং ঘরের দরজায় আওয়াজ করলেন। বাড়িওয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন কে? বললেন আমি জুলাইবীব। বাড়ির লোকজন বললেন আমরাতো তোমাকে চিনি না। আর না তোমার আমাদের প্রয়োজন আছে?

অবশেষে বাড়ির মালিক বের হলেন এবং জুলাইবীবকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি চাও? কোথা হতে এসেছ?

তিনি বললেনঃ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। একথা শোনামাত্র বাড়িতে খুশি ও আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এটাতো খুশির বিষয় যে, আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম জানিয়েছেন।

জুলাইবীব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতে লাগলেনঃ এরপর শুনে! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আপনার কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিবেন।

বাড়িওয়ালা বললেনঃ একটু অপেক্ষা কর আমি মেয়ের মায়ের সাথে পরামর্শ করে নেই।

ভিতরে গিয়ে মেয়ের মাকে বিষয়টি জানালেন এবং পরামর্শ চাইলেন। মেয়ের মা বলতে লাগলেনঃ

না এটা কখনও হতে পারে না আল্লাহর শপথ! আমি আমার মেয়ের বিয়ে এমন ব্যক্তির সাথে দিতে পারি না যার না আছে বংশ গৌরব আর না আছে খ্যাতি আর না আছে অর্থ সম্পদ।

তার সৎ নেককার মেয়ে এসব কথা শুনছিল এবং জানতে পারল যে, নির্দেশ কার? এটা কার পরামর্শ? ভাবতে লাগলো যে, যদি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বিয়ের প্রস্তাবে রাজী-খুশি থাকেন তবে অবশ্যই তাতে আমার কল্যাণ ও মঙ্গল হবে।

সে মা-বাবাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল:

«أَتَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْرَهُ؟ اذْفَعُونِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ لَنْ يُضَيِّعَنِي»

“আপনারা কি রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করতে চাচ্ছেন? আমাকে আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিন। (তিনি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যেখানে চাইবেন আমাকে বিয়ে দিবেন। কেননা তিনি আমাকে বিপথে যেতে দিবেন না।)

অতঃপর মেয়েটি আল্লাহ তায়ালার এই আয়াত তেলাওয়াত করলো:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

“কোন মুমিন নর-নারীর জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলের ফায়সালার পর তাদের বিষয়ে কোন ইখতিয়ার থাকে না।” (সূরা আহযাবঃ ৩৬)

মেয়ের বাবা আল্লাহর রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আবদার করলেনঃ আল্লাহর রাসূল! আপনার নির্দেশ মাথার উপর আমি আমার মেয়ের বিয়ের জন্য রাজি আছি। যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মেয়ের মন্তব্য সম্পর্কে জানতে পারলেন তাকে দোয়া দিলেনঃ

«اللَّهُمَّ صُبِّ الْخَيْرِ عَلَيْهَا صَبًّا وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا كَدًّا»

“হে আল্লাহ এই মেয়েটির জন্যে কল্যাণ ও মঙ্গলের দ্বার খুলে দাও আর তার জীবনের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দাও।”

অতঃপর জুলাইবীব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিয়ে হয়ে গেল। মদীনায় আরেকটি এমন ঘর আবাদ হলো যার ভিত্তি পরহেযগার ও তাকওয়ার উপর ছিল। যার ছাদ ছিল দারিদ্রতার, আর যাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা হয়েছিল তাকবীর, তাসবীহ, ইবাদত-বন্দেগী। এই মোবারক জোড়ার প্রশান্তি কেবল নামাযে ছিল এবং হৃদয় পিপাসা মিটত নফল রোযায়।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রার্থনার বদৌলতে এই বিয়ে খুবই বরকতপূর্ণ হলো। অল্প দিনের ভিতরে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন ভাল হয়ে গেল যে, বর্ণনাকারী বলেনঃ

«فَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ نَفَقَةً وَمَالًا»

“আনসারী মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খরচ ও সম্পদের সংসার এই মহিলার ছিল।”

এক যুদ্ধে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিজয় দিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রিয় সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ

«هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟»

“তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ?” অর্থাৎ কে কে শহীদ হয়েছে?

সাহাবাগণ বললেনঃ অমুক অমুক ব্যক্তি অনুপস্থিত।

পুনরায় এরশাদ হলোঃ

«هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟»

“তোমরা কি কাউকে হারিয়েছ?”

সাহাবাগণ উত্তরে বললেনঃ না।

তিনি বললেনঃ

«لَكِنِّي أَفْقِدُ جَلِيبًا فَاطْلُبُوهُ»

“কিন্তু আমি জুলাইবীবকে দেখছি না, তাকে খোঁজে বের কর।”

সুতরাং যুদ্ধের ময়দানে খোঁজা হলো। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য ছিল। যুদ্ধের মাঠে তার চতুর্পার্শ্বে কাফেরদের সাতটি লাশ ছিল। সে যেন সাত কাফেরের সাথে যুদ্ধ করে করে শহীদ হয়েছেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সংবাদ পৌঁছানো হলো। দয়ার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হলেন। প্রিয় সাহাবীর লাশের পার্শ্বে দাঁড়ালেন ও দৃশ্য দেখলেন।

এরপর বললেনঃ

«قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ»

“সে সাতজনকে মেরেছে অতঃপর দুশমনরা তাকে হত্যা করেছে। সে আমার থেকে আর আমি তার থেকে, সে আমার থেকে আর আমি তার থেকে।”

«فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلَّا سَاعِدَا النَّبِيِّ ﷺ»

অতঃপর তিনি প্রিয় সাহাবীকে নিজ বাহু দ্বারা উঠালেন আর তিনি তাকে একাই উঠিয়েছিলেন।

জুলাইবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কবর খনন করা হল। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ হস্ত মোবারকে তাকে কবরে রাখলেন। (সহীহ মুসলিমঃ ২৪৭২)

উত্তম নারীর গুণাবলী

এক বেদুঈন আরবীয়কে যে নারীদের গুণাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ, জিজ্ঞাসা করা হলঃ উত্তম নারীর মধ্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্যিক?

উত্তরে বললঃ এক উত্তম নারীর মধ্যে নিম্নবর্ণিত গুণাবলী থাকেঃ দাঁড়িয়ে থাকলে লম্বা দেখা যায় আর বসলেও তার উচ্চতা প্রকাশ পায়। কথা বললে সত্য বলে। তাকে রাগান্বিত করলে সহনশীলতা প্রকাশ করে। হাসলে মুসকি হাসির ঝলক চমকে। খাবার পাকালে খুবই মজার হয়। আর নিজের স্বামীর অনুগত, নিজ সংসারকে ভালবাসে এবং যথা সম্ভব খুব কম বাড়ি থেকে বের হয়। নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে খুব বেশি প্রিয় সম্মানিত; কিন্তু খুব বেশি নম্র ও ভদ্র মেজাজের হয়। স্বামীকে অধিক ভালবাসে এবং বেশি বেশি সন্তান প্রসবকারীণী তবেই তার সকল কাজ পছন্দনীয় হবে।

খানসা (ﷺ)-এর ঈমান দীপ্ত

উপদেশ

আমীরুল মু'মিনীন উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাসনকালে মুসান্না বিন হারেছা শাইবানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কাদিসিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেনাবাহিনীর সাথে খানসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও চার সন্তানের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধের মাঠে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে তার চার সন্তানকে ডাকলেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের জন্য তৈরি করলেন। তিনি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের মর্যাদা বর্ণনা করেন। আসুন সেই মহৎ নারীর এই গুরুত্বপূর্ণ মূল্যে নিজ সন্তানদের যে উপদেশ দিয়েছেন তা অধ্যয়ন করি।

তিনি বললেনঃ “হে আমার প্রিয় সন্তানেরা! তোমরা মুসলমান এবং মহান প্রভুর ফরমাবরদার। তোমরা স্বেচ্ছায় এখানে এসেছ, জোর-জবরদস্তি আনা হয়নি। ঐ সত্ত্বার শপথ! যিনি ব্যতীত কোন সত্ত্বা ইবাদতের যোগ্য নয়। তোমরা যেরূপ এক মায়ের সন্তান তেমনি এক পিতার সন্তান। আমি তোমাদের বাবার সাথে খেয়ানত করিনি, আর না আমি আমার ভাইদের লাঞ্ছিত করেছি। আমি তোমাদের বংশে কোন দোষত্রুটির চিহ্ন লাগতে দেইনি, আর না তাতে আমি কোন পরিবর্তন করেছি। তোমরা ভালরূপেই জান যে, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের বিপক্ষে যুদ্ধে কত নেকী ও সওয়াব রেখেছেন। শোন এবং ভালরূপে শোন নিশ্চয় আখেরাতের ঘর-বাড়ি যা সর্বদায় এবং স্থায়ী বাসস্থান এই অস্থায়ী দুনিয়া থেকে অনেক গুণ উত্তম। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্যধারণ কর এবং অন্যকেও ধৈর্যের শিক্ষা দাও এবং পরস্পর দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন কর এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর যাতে করে তোমরা সফল হতে পার।”

কাল যখন সকালের সূর্য উদয় হয় তখন তোমরা শত্রুর মোকাবেলা যুদ্ধের মাঠে নেমে যাও এবং ইসলামের শত্রুদের উপর জয়লাভ কর। আর যখন দেখবে যে যুদ্ধে খুবই উষ্ণতা ও সরগরম হয়ে গেছে এবং যুদ্ধের অগ্নি জ্বলে উঠছে। সে মূহুর্তে তোমরা ঝাপিয়ে পড়।”

অতঃপর খানসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর চার সন্তান খুবই দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধের মাঠে ঝাপিয়ে পড়েন এবং সকলেই শহীদ হয়ে গেলেন। আর যখন হযরত খানসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাদের শাহাদাতের সংবাদ জানতে পারলেন, বলতে লাগলেনঃ

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَنِي بِاسْتِشْهَادِهِمْ، وَأَرْجُو مِنْ رَبِّي أَنْ
يَجْمَعَنِي بِهِمْ فِي مُسْتَقَرٍّ رَحْمَتِهِ»

আল্লাহ তায়ালার বহু শুকরিয়া যিনি আমাকে শহীদের মা বানিয়েছেন।

আর তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। আমি মহান প্রভুর নিকট আশা করি তিনি যেন, আমাকে জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করেন।”

স্বামীর জন্য তার স্ত্রীর দান

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর স্ত্রী যায়নব সাকাফীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অনেক সম্পদশালী নারী ছিলেন। তিনি বলেন, একদিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী শুনতে পেলামঃ

«تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»

“হে নারী সমাজ! দরিদ্রকে দান কর যদিও তা তোমাদের অলংকার (বিক্রি করে) হোক না কেন?”

যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন যে, আমি আমার স্বামী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট আসলাম এবং বললামঃ আপনি অভাবগ্রস্ত আর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট গিয়ে এই বিষয়টি ভাল করে জেনে নিন। এই সাদকা আপনাকে দিলে যদি যথেষ্ট হয় তবে ঠিক আছে। আর না হয় আমি অন্যদের দান করবো। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেনঃ তুমিই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে একথা জিজ্ঞেস করে আস। যায়নব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ অতঃপর আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম, সেখানে দরজায় এক আনসারী মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তুমি এখানে কি নিতে এসেছ? তার উত্তর শোনে আমি জানতে পারলাম যে সেও আমার মতই এসেছে। অতএব আমিও তার সাথে সম্মানার্থে বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকি। ভিতরে প্রবেশের সাহস পাচ্ছিলাম না। ততক্ষণে বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বের হলেন। আমরা উপযুক্ত সুযোগ পেলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমরা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, আমরা কি আমাদের সাদকা আমাদের স্বামীকে দিতে পারব? এবং আমার তত্ত্বাবধানে থাকা এতীমের জন্য খরচ করতে পারব? আর সাথে এও বললাম

যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একথা না বলতে যে আমরা কে?

তিনি বলেন যে, বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট গেলেন এবং সমাধান চাইলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেন যে দুই মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তারা কারা? উত্তরে বেলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ একজন আনসারী মহিলা আর দ্বিতীয়জন যায়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ «أَيُّ الزَّيَّانِبِ؟» কোন যায়নাব?

বেলাল উত্তর দিলেনঃ

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এরশাদ করলেনঃ

«لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ»

তাদের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াবঃ এক হলো আত্মীয়ের (সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা) আর দ্বিতীয় হলো সাদকার সওয়াব।

মহৎ পিতার বুদ্ধিমতি কন্যা

হাতেম ত্বাঈকে কে না চেনে? তার দানশীলতার ঘটনার বর্ণনা সকল প্রকার মানুষের মুখে মুখে। “ত্বাঈ” গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় সাড়ে চারশত উত্তর-পূর্বে অবস্থিত হায়েল শহরের নিকট সেই গোত্রের বসবাস ছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। তাদের মূলোৎপাটনের জন্য বিভিন্ন সময় ছোট-বড় সৈন্যদল প্রেরণ করতেন। বনু ত্বাঈ গোত্রের দিকে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী পাঠান হলো, কেননা তাদের পক্ষ হতে যেকোন মুহূর্তে আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। হাতেম ত্বাঈ পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিল। আর এখন তার ছেলে আদি তাঈ গোত্রের প্রধান। যে ইসলামের শত্রুতায় অগ্রগামী ছিল। মুসলমানদের সৈন্যরা যখন হঠাৎ তাদের গ্রামে আক্রমণ করল, তখন আদি ভয়ে শাম দেশের দিকে পলায়ন করল। আর সে পলায়নকালে নিজের বোন সাফফানাকেও সাথে নেয়নি।

আর এদিকে মুসলমানগণ বনী ত্বাঈ গোত্রের পুরুষ ও মহিলাদের গোলাম ও বাঁদি বানিয়ে নিয়েছে।

জীব-জন্তুকে হাঁকিয়ে মদীনায় নিয়ে আসল। খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বন্দীদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের দারুল খিলাফত মদীনাতুর রাসূলে মসজিদে নববীর পার্শ্বে অবতরণ করালেন। সেই বন্দীদের মধ্যে বিশ্বখ্যাত দানবীর এবং বহু মানুষের প্রিয় হাতেম ত্বাঈ-এর কন্যা সাফফানা ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাফফানা বিনতে হাতেম ত্বাঈ আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্যে করে বললেনঃ “মেহেরবানী করে আপনি আপনার চাচাত ভাই (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমার মুক্তির জন্য সুপারিশ করুন।

আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন যে, আমরা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে সুপারিশ করি না, তবে যখন তিনি নামাযের জন্য বের হবেন তখন বন্দীদের পরিদর্শন করবেন। সে সময় তুমি নিজেই নিজের যা বলার বলিও এবং নিজের পিতা হাতিম ত্বাঈ-এর

বর্ণনা দিও। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেকের উপর দয়া করেন এবং সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করেন এবং সকলের থেকে বেশি ধৈর্যশীল।

সুতরাং যখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসরের নামাযের জন্য বের হলেন, তখন বন্দীদের তাঁর সামনে পেশ করা হলো। সেই মুহূর্তে সাফফানা নিজ আবদার পেশ করলেন। “মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন, আর আমার ভাই পালিয়ে গেছেন। যদি আপনি ভাল মনে করেন তবে আমাকে মুক্তি দিয়ে দিন। আমাকে বন্দীদের মধ্যে রেখে আমার শত্রুদেরকে খুশির সুযোগ দিবেন না।

আপনি জানেন আমার পিতা নিজ সম্প্রদায়ের সরদার ছিলেন। তিনি বন্দীদেরকে মুক্তি দিতেন, অত্যাচারীকে হত্যা করতেন। আর প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন, বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে মূল্যায়ন করতেন এবং তাদের সহায়তা করতেন। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করতেন এবং লোকদের আপ্যায়ন করাতেন, অভাবীর অভাব দূর করতেন আর সমস্যায় জড়িত লোকদের সাহায্য করতেন। তার নিকটে যখনই কোন ব্যক্তি আসতে তাকে খালি হাতে ফেরত দিননি।”

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কথা শুনে এরশাদ করলেনঃ

«يَا هَتَّاهُ! لَوْ كَانَ أَبُوكَ مَاتَ مُسْلِمًا لَتَرَحَّمْنَا عَلَيْهِ»

“হে রমণী! (তুমি তোমার পিতার যে গুণ বর্ণনা করেছ তা মু’মিনের গুণ) যদি তোমার পিতা মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করতেন তবে আমরা তার জন্য রহমতের দু’আ করতাম।”

অতঃপর নির্দেশ দিলেনঃ

«خَلُّوا عَنْهَا، فَإِنَّ أَبَاهَا كَانَ يُحِبُّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

তোমরা সাফফানাকে মুক্তি দিয়ে দাও। এই মেয়ের পিতা উত্তম চরিত্রের গুণাবলীকে পছন্দ করতেন।

অতঃপর সাহাবায়ে কিরামকে উত্তম চরিত্রের বিষয়ে শিক্ষা দিলেন যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি অসম্মানিত হয়, বিত্তশালী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে অথবা জ্ঞানী ব্যক্তি মূর্খ মানুষের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে তবে তাদের প্রতি দয়া করিও।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সাফফানার উপর দয়া করলেন এবং তাদেরকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশমূলক প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলঃ

তিনি তাকে অনুমতি দিলেন এবং সাথে সাথে সাহাবাদেরকে বললেন খুব লক্ষ্য করে শোন এই মেয়েটি কি প্রার্থনা করে। এবার দু'আর জন্য মেয়েটি হাত উঠালঃ “আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনার কোন সমস্যা না আসে আর যদি কোন সম্প্রদায়ের নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয় আপনি তা ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যম হন।”

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফফানাকে শুধু মুক্তিই দেননি; বরং তাকে এক জোড়া কাপড় দিলেন। পরিবহনের ব্যবস্থা করলেন এবং ভ্রমণ খরচও তাকে দিয়ে দিলেন।

সে মুক্তি পেয়ে সোজা তার ভাই আদীর নিকট পৌঁছে গেল, যে পলায়ন করে শাম দেশে চলে গিয়েছিলেন। সাফফানা তার কাছে পৌঁছে গালি-গালাজ করে বলতে লাগলেনঃ

«الْقَاطِعُ الظَّالِمُ، احْتَمَلْتُ بِأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ وَتَرَكْتُ بَقِيَّةَ
وَالِدِكَ عَوْرَتَكَ»

রক্তের সম্পর্ক ছিন্কারী যালেম! নিজের স্ত্রী-সন্তানদের নিজের সাথে আরোহণ করে পালিয়ে এসেছ আর নিজের পিতার সন্তানকে রেখে এসেছ যে বোন তোমার ইজ্জত ও সম্মান ছিল।

আদী বললঃ বোন! আমি সত্যিই ভুল করেছি। তুমি আমাকে খারাপ বলো না, আমার ব্যাপারে ভালই বল। অতঃপর আদী স্বীয় বোনকে যে, বুদ্ধিমত্তায় ও সচেতনতায় খ্যাতি অর্জন করেছিল জিজ্ঞাসা করলঃ

«مَاذَا تَرَيْنَ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟»

“সে ব্যক্তির (মুহাম্মাদের) ব্যাপারে তোমার কি মতামত?”^১

সাফফানা বললঃ “আমার পরামর্শ হলো যে, যেই ব্যক্তির নিকট হতে আমি এখন এসেছি, তুমি এই মুহূর্তে তার সাথে সাক্ষাত কর। তিনি এক পথপ্রদর্শক মহা মানব, আর এমন একটি সময় শীঘ্রই আসবে তিনি অনেক বড় বড় সম্প্রদায়ের উপর বিজয় লাভ করবেন। আমি তার ভিতরে এমন কিছু গুণ দেখতে পেয়েছি যা সাধারণ শাসকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তিনি দরিদ্র জনগণের প্রতি দয়া করেন। বন্দীদের মুক্তি দেন। ছোটদের প্রতি দয়া করেন আর মানুষের মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ন করেন। আমি তাঁর চেয়ে বড় দানশীল ব্যক্তি এবং দয়ালু কাউকে দেখিনি। শোন! যদি তিনি নবী হয়ে থাকেন যার দাবী তিনি করছেন তবে তার নবুওয়তকে গ্রহণ করে নেয়ার অগ্রগামী হওয়াই উত্তম। আর যদি তিনি কেবলমাত্র শাসক, রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে থাকেন তবেও তিনি এমন যার রাজত্বে কোন সম্মানিত ব্যক্তি অসম্মানিত হন না।”

অতঃপর সাফফানা নিজের সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তম ব্যবহারের বর্ণনা দিলেন যে, কিভাবে তাকে সম্মানের সাথে পরিবহণ ব্যবস্থা করে নিরাপত্তার জন্য নিজের ব্যক্তিকে সঙ্গে দিয়ে ফেরত পাঠিয়েছেন।

একথাগুলি শুনে তার অন্তর থেকে সন্দেহ ও ভীতি দূর হলো। সতুরাং আদী সেখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। তার মাথায় আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন ছিল। মসজিদে নববীতে এসে দেখতে পেল যে, তাঁর মসজিদ কাঁচা ইট দ্বারা তৈরি আর তিনি সাহাবাদের মধ্যে সাধারণ মানুষের ন্যায় বসে আছেন। অথচ আদী ভাবতেছিলেন না জানি তিনি কত সম্পদ একত্রিত করেছেন। আর তাঁর ভবন কত সৌন্দর্যমন্ডিত হবে?

১. (দেখুনঃ সীরাতে হিশামঃ ২৩৫/৪, উসদুল গাবাঃ ১৪৪/৭)

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদেই আদীকে অভ্যর্থনা জানালেন। অল্প সময় কথা বলার পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ হস্ত মোবারক আদীর কাঁধে রাখলেন এবং বললেন আদী চল বাকী অবশিষ্ট কথা ঘরে গিয়ে করি। আদী বলেনঃ “ঘরে প্রবেশ করে আমি অবাধ হলাম যে, ঘরও খুবই সাধারণ ছিল। বিছানায় পাটিও ছিল না, বিছানাও কাঁচা ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ কাঁধ হতে চাদর মোবারক নিয়ে যমীনে বিছালেন। আমার মনে হলো যে, এখন তো তিনি নিজের চাদরে বসবেন আর আমাকে মাটিতেই বসাবেন; কিন্তু এ কি হলো! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার হাত ধরলেন এবং আমাকে চাদরের উপর বসার নির্দেশ দিলেন এবং যা বললেন তার মর্মার্থ এইঃ “তুমি এক দানশীল পিতার সন্তান অন্য আরেক দানশীল ব্যক্তির ঘরে এসেছ তুমি মহৎ পিতার সন্তান চাদরের উপর বস। আমার কি সমস্যা আমি মাটির বিছানায় বসে যাই।”

আদী নীরবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে দেখতে লাগলেন। তাঁর উত্তম ব্যবহারে আদীর অন্তরের গভীরে প্রভাব ফেলল। সাফফানা যেসব কথা ও গুণ বর্ণনা দিয়েছিল সব সঠিক ছিল। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলেনঃ “আদী তুমি কিছু প্রশ্ন করতে চেয়েছিলে তা কি? উত্তর করলেনঃ এখন সকল প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে। আপনার কাছে একটিই আবদার যে আমাকেও কালেমা পড়িয়ে দিন এবং নিজের আত্মত্যাগীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিন।” আর অল্প সময় পরেই আদী মুসলমান হয়ে গিয়ে ছিল। ইতিহাস আমাদের বলে যে, তার প্রিয় বোনও ইসলাম গ্রহণ করেছে।

ঐতিহাসিকগণ আদীর ঘটনাকে বিভিন্নরূপে বর্ণনা করেছেন অন্য একটি বিশ্বস্ত বর্ণনায় আদী বিন হাতিম তাঈ-এর যখন বোনের কথা শুনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তিনি খুব সুন্দর পোষাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন আর নিজ গলায় সোনার ক্রুশ লটকানো অবস্থায় ছিল। কেননা তিনি আরবের সব থেকে বড় দানশীল এবং প্রত্যেক আরবীয়দের হৃদয় প্রিয় ব্যক্তির সন্তান ছিলেন এবং নিজ গোত্রের প্রধান ও ছিলেন। এজন্যই গ্রামের সকল লোক মদীনায় যাত্রাকালে তাকে বিদায় জানালেন।

আদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিজের বর্ণনা আমি রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে পৌঁছলাম আর আমার গলায় স্বর্ণের ত্রুশ লটকানো ছিল।

তিনি বললেনঃ

«يَا عَدِيّ! اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثْنَ»

“হে আদী! এই মূর্তিটিকে বের করে ফেলে দাও।”

আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে তেলাওয়াত করতে শুনেছিঃ

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾

অর্থঃ “এসব লোক (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ) আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পন্ডিতদের ও পাদরীদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে।” (সূরা তাওবাঃ ৩১)

এই আয়াত শুনে আদী বললেনঃ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা নিজেদের আলেমদের ইবাদত তো করেনি?

এই আয়াত শুনে আদী বললেনঃ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা নিজেদের আলেমদের ইবাদত তো করেনি? তিনি এরশাদ করলেনঃ

«أَمَّا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ»

“একথা ঠিক যে তারা নিজ আলেমদের ইবাদত করেনি; কিন্তু তাদের আলেমরা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল করেছে এবং তারা তা হালাল হিসেবে মেনে নিয়েছে। আর যখন আল্লাহর হালাল করা বস্তুকে তাদের আলেমরা হারাম করে দিয়েছে, তারা সেটাকে হারাম হিসেবে মেনে নিয়েছে। এটাই তাদের ইবাদত।” (তিরমিযী-৩০৯৫)

একথা শুনে আদী মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলেন।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখিত বাণীতে এটা সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালার হালাল করা বস্তুকে হারাম সাব্যস্তকারী এবং আল্লাহ তায়ালার হারাম বস্তুকে হালাল সাব্যস্তকারীর অনুসরণও আনুগত্য করা প্রকৃতপক্ষে তারই ইবাদত। অথচ ইবাদতের যোগ্য কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা। তার ব্যতীত কারো বিন্দুমাত্রও ইবাদত শিরক। তারই উপর ভরসা করা আবশ্যিক। তাঁরই নামে শপথ করতে হবে। আর তিনি কোন বস্তুকে হালাল করতে পারেন এবং কোন বস্তুকে হারাম করা তারই কাজ। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট; কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করবে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহের অবমাননা করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে অপদস্ত করবেন।

এই মহিলাটি জান্নাতে প্রবেশ করবে

ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, একবার আতা বিন রাবাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন এমন সময় সামনে দিয়ে কালো রংয়ের এক দাসী অতিবাহিত হলো। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আতার দিকে তাকালেন এবং বলতে লাগলেনঃ আমি কি তোমাকে এক জান্নাতী নারী দেখাব? আতা আশ্চর্য হয়ে বললেন যে, এক জান্নাতী নারী?

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, হ্যাঁ এক মহিলা আছে যখন সে মৃত্যুবরণ করবে, তখন জান্নাতে প্রবেশ করবে। আতা খুব আশ্চর্য হলেন। তিনি বললেন, আমাকে দেখান সে কোন সৌভাগ্যবতী নারী যে জান্নাতী হবে। আমাদের মাঝে থাকেন এবং আমাদের কাছেই যাতায়াত করেন। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সেই কালো বুড়ি দাসীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। তিনি বললেন, এই বৃদ্ধা জান্নাতী। আতা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞাস করলেন, ইবনে আব্বাস আপনি কি করে জানলেন যে সে জান্নাতী?

তিনি উত্তর দিলেনঃ অনেক বছর পূর্বে এ কালো বর্ণের কাদাকর চেহারার মহিলাটি আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট আসে তখন সে মৃগী রোগে আক্রান্ত। আর সে তাতে বার বার তাতে পতিত হত, অতএব সে আল্লাহর রাসূলের নিকট এসে রোগ থেকে আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা করতে করতে। সে বলতে লাগল, আমার জীবন বৃথা, শিশুরা আমাকে ভয় পায়, আমাকে তিরস্কার করে আমার উপর হাসে। আমি বাজারে থাকি অথবা বাড়িতে অথবা লোকজনের সাথে মৃগী রোগ আমাকে আক্রমণ করে যার ফলে আমার হুঁশ থাকে না? আমার জীবনে নৈরাশ্যতা চলে এসেছে। হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে আমার রোগ মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করুন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদেরকে ধৈর্যের সবক দেয়ার জন্য তাকে বললেনঃ

«إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكَ»

“যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর তবে তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি রোগ থেকে মুক্তি চাও তবে আমি আল্লাহর কাছে তোমার রোগ মুক্তির জন্য দু’আ করব।”

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কথা সমাপ্ত করলেন, মহিলাটি খুব চিন্তা-ভাবনা করলেন। নিজের অবস্থা ও অসুস্থতার প্রতিও লক্ষ্য করলেন। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কথাও মনে মনে ভাবলেন। এখন তিনি দু’টি বিষয়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন যে, কোন বিষয়টি অবলম্বন করবেন? ধৈর্যকে না কি দুনিয়ার আরামকে? ভাবলেন যে দুনিয়াটা অস্থায়ী এটা একদিন শেষ হয়ে যাবে আমি জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা কেন করব না? অতঃপর তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হলেনঃ

“হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আমি ধৈর্যধারণ করব; কিন্তু আমার যখন; মৃগী রোগ ওঠে তখন আমি বেপর্দা হয়ে যাই। এজন্য আপনি আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করেন, তিনি যেন আমাকে বেপর্দা না করেন।” রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জন্য দু’আ করলেন। (বুখারী-৫৬৫২, মুসলিম-২৫৭৬)

জান্নাতুল ফেরদাউসের বাসিন্দা

হারিছ ইবনে সুরাকা এক আনসারী সাহাবী ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাকে বদর যুদ্ধের শহীদদের মধ্যে গণনা করেছেন। বদর যুদ্ধ কুফর ও ইসলামের মাঝে প্রথম যুদ্ধ এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের জন্য অনেক সফলতা বহনকারী ছিল। সত্য-অসত্যের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী যুদ্ধ ছিল।

এজন্য এটাকে “গায়ওয়াতুল ফুরকান” (হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী যুদ্ধ)ও বলা হয়ে থাকে। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জেহাদের দাওয়াত দিলেন এবং তাদেরকে কুফরের মোকাবেলার জন্য বের হতে বলা হলো সে মুহূর্তে হারিছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের মার কাছে আসলেন। তাঁর মা বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পিতা প্রথমেই মৃত্যুবরণ করেছিল। বৃদ্ধার একমাত্র দেখা-শুনার একটি সন্তানই ছিল যার জন্য খুব বেশি ভালবাসা ছিল। এমনিতেই তো সকল মা তার সন্তানের প্রতি স্নেহশীল ও মমতাময়ী; কিন্তু তার ভালবাসা এক অতুলনীয় ভালবাসা ছিল। শীতকালে আশঙ্কা করতেন যে, কোথাও আমার সন্তানের ঠাণ্ডা না লাগে? আর গরমের সময় পেরেশান হতেন যে, আমার সন্তান গরমে অসুস্থ না হয়ে পড়ে।

আজ সেই সন্তান মায়ের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ছিল। মা তার সন্তানকে দেখে বললেনঃ হে বৎস! তুমি এখন অনেক বড় হয়েছে। এখন আমার একটিই আশা যে, আমি তোমাকে বিয়ে করিয়ে দিব। তোমার সন্তান হবে আমি তাদেরকে দিয়ে আমার প্রাণ তৃষ্ণা মিটাবো তাদের নিয়ে আনন্দ করব। আর তার সন্তান বলছেঃ “আম্মাজান আপনি জানেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জেহাদের ঘোষণা দিয়েছেন। আমি তাদের সাথে জেহাদে যেতে চাই। আপনার অনুমতির জন্য এসেছি। আম্মাজান আমাকে খুশি খুশি অনুমতি দিন।

মা বলতে লাগলেনঃ বৎস আমি তোমার বিচ্ছিন্নতা বরদাশত করতে পারব না। তুমি আমার কাছেই থাক। এদিকে সন্তান বার বার যুদ্ধের অনুমতির জন্য বলছে। মার হাত চুম্বন করে বলল আম্মাজান! আপনি খুশি খুশি অনুমতি দিয়ে দিন। যখন সন্তানের আপত্তির সীমা অতিক্রম করল তখন

বৃদ্ধা মা বললেনঃ বৎস! ঠিক আছে তুমি জেহাদে যেতে চাও, আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি! কিন্তু শোন! তোমাকে ব্যতীত প্রাণ বসবে না। যতক্ষণ না তুমি ফিরে আসবে আমার খাওয়া-দাওয়া ভাল লাগবে না। আমার স্বস্তি ফিরে আসবে না। অতঃপর মা তার সন্তানকে পোশাক পরিধান করালেন। তরবারি তার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর ছেলের কপাল চুম্বন করলেন এবং তাকে জেহাদের ময়দানে রাওয়ানা করলেন।

মুসলমানগণ বদরের স্থানে পৌঁছলেন এবং কূপের নিকট তাঁবু স্থাপন করলেন অন্যদিকে কুরাইশরাও তাদের সৈন্য বাহিনীর সাথে অবতরণ করল। অতপর সত্য অসত্যের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী দিন চলে আসল। মুসলমানগণ ও কাফেররাও লড়াইয়ের জন্য কাতারবন্দী হয়ে গেল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ হস্তে মুসলমানদের কাতার বন্দী করলেন এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাব্বাব বিন মুনযিরের পরামর্শ অনুযায়ী পানির কূপকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন এবং এর হেফাযতের জন্য আনসারী যুবক হাব্বান বিন আরকা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে নির্ধারণ করলেন, যেন কোন শত্রু তাতে বিষ মিশিয়ে না দেয়। সুতরাং তাকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, শত্রুর পক্ষের কোন ব্যক্তি যেন কূপের কাছেও আসতে না পারে। বনী নাজ্জারের এই সাহাবী তীর নিক্ষেপে পরদর্শী ছিলেন। তার লক্ষ্য বস্তু কমই লক্ষ্যচ্যুত হত।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছু পূর্বে হারেছা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পানি তৃষ্ণা পেল এবং তিনি কূপের দিকে অগ্রসর হলেন সেখানে পৌঁছে কূপ থেকে পানি বের করলেন। নিজের তৃষ্ণা মিটাতে চেয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে কূপ পাহারায় নিয়োজিত আনসারী সাহাবী মনে করলেন এ ব্যক্তি শত্রু পক্ষের, যে পানিতে বিষ মিশাতে চায় অথবা মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায়। তিনি বলতে লাগলেনঃ নাউজু বিল্লাহ ইসলামের এই শত্রু আমাদের কূপের পানি নষ্ট করার জন্য এসেছে। তিনি তীরের নিশানা সমস্ত শক্তি দিয়ে হারেছার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপর রাখলেন এবং নিক্ষেপ করলেন। হারেছার গলায় তীর বিদ্ধ হলো এবং এক চীৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মুসলমানগণ তাকে শত্রু পক্ষের ব্যক্তি মনে করল। কেউ তার দিকে দৃষ্টি দেয়নি। হারেছা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তীর বের করার চেষ্টা করলেন; কিন্তু

তার সময় ঘনিয়ে আসল। শাহ রগ কেটে গিয়েছিল রক্তের ফোয়ারা বইতে ছিল। আর এ অবস্থায় মহান প্রভুর নিকট চলে গেলেন। যখন তার মৃত্যু হয়ে গেল তখন কূপের দায়িত্বশীল সাহাবী অগ্রসর হলেন এবং তার তীরের নিশানা এক মুসলমান দেখে খুব বেশি পেরেশান হয়ে গেলেন যে, এটা কি হয়ে গেল? আমি এক মুসলমানকে হত্যা করেছি? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, আমি তো তাকে শত্রুর পক্ষের ব্যক্তি মনে করেছিলাম। (উসদুল গাবাঃ জীবনি, হারিছ বিন সুরাকা)

মানব জাতির শান্তির দূত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সংবাদ দেয়া হলো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনসারী সাহাবীকে ক্ষমা করে দিলেন, কেননা তার কোন দোষ ছিল না। আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দিলেন। মুসলমানরা খুশি খুশি মদীনায় আসলেন। তিনি প্রথমেই বেলাল ও যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মাধ্যমে সুসংবাদ দিয়ে মদীনায় পাঠালেন। আর বিজয়ী মুসলমান মুজাহিদগণ যখন মদীনায় ফিরে আসলেন তখন তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হলো। নারী, শিশু ও বৃদ্ধা মহিলারা নিজের স্বামী, পিতার ও সন্তানের অপেক্ষায় ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন নিজের প্রিয় আত্মীয়ের আনন্দে অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের মধ্যে হারেসার মাও ছিলেন। মুসলমান মুজাহিদগণ মদীনায় প্রবেশ করলেন শিশুরা অগ্রসর হয়ে তাদের পিতাদের সালাম করছে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে।

হারেসার মা ছেলের সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে, কখন তার কলিজার টুকরা দেখতে পাবেন। তাকে বুকে জড়াবেন এবং নিজের পেরেশানী দূর করবেন। তার সামনে দিয়ে কাফেলা একের পর এক আসতে থাকল এবং তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল; কিন্তু তার কলিজার টুকরা দৃষ্টি গোচর হচ্ছিল না। মনে অনেক রকম আশঙ্কা সৃষ্টি হচ্ছিল। অবশেষে মনের আবেগ না রাখতে পেরে এক সাহাবীর রাস্তা রুখে দাঁড়ালেন।

জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি হারেসাকে দেখেছ? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ দেখেছি; কিন্তু হারেসার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? হারেসার মা বললেনঃ

আমি তার মা। সাহাবী বললেনঃ তাহলে আপনি নিজ সন্তানের প্রতি ধৈর্যধারণ করুন। তোমার সন্তান নিহত হয়েছেন। হারেসার মা একথা শুনে শহীদের মর্যাদা তার মনে পড়ল আমি শহীদের মা। আমার সন্তান জান্নাতী আল্লাহ্ আকবার। আমার সন্তান আমার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। অনিচ্ছায় বলে উঠল আমার সন্তান শহীদ হয়েছে; কিন্তু আমি তাকে শহীদ মনে করি না।

সাহাবী উত্তর দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেনঃ কেন?

তাকে কি কাফেররা হত্যা করেনি?

বললেনঃ না তো।

জিজ্ঞাসা করলেনঃ সে কি মুসলমান ও কাফেরদের মাঝে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হয়নি? বললেনঃ না।

কি বললেন? আমার ছেলে নিজ ধর্মের জন্য ইসলামের শত্রুদের প্রতিরোধকালে শহীদ হননি?

আমার সন্তান কিভাবে নিহত হলো?

আমার হারেসা কোথায়? তিনি দুশ্চিন্তায় একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন।

সাহাবী বললেন যে, প্রকৃতপক্ষে আপনার সন্তান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই নিহত হয়েছেন। আর তাকে হত্যাকারীও মুসলিম। আপনার সন্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

আম্মাজান বললেন, আপনি নিশ্চিত যে, আমার সন্তান শহীদ হয়নি। সাহাবী বললেন, আল্লাহর করুণায় সে জান্নাত পেতে পারে। এই বৃদ্ধা মা যখন সকল ঘটনা জানতে পারলেন তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বলতে লাগলেন যে, বিশ্বজগতের ইমাম মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোথায়? সাহাবী বললেন যে ঐ দেখুন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসছেন। তিনি দৌড় দিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে দুঃখ-বেদনার পাহাড় তার মাথায়। এ অবস্থায় নবী (সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে পৌঁছলেন। দয়াল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মহিলাকে আসতে দেখে থেমে গেলেন। মা নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন কে? বললেন উম্মে হারেসা। বললেনঃ কি চাও। উত্তরে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ভাল করেই জানেন যে আমি হারেসাকে কত বেশি ভাল বাসতাম। আর আমি জানতে পারলাম যে, আমার সন্তান নিহত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলুন আমার কলিজার টুকরা কোথায়? যদি সে জান্নাতে থাকে তবে আমি ধৈর্যধারণ ও আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আর যদি সে জান্নাতী না হয় তবে আমি খুব চিৎকার করে কাঁদব এত কাঁদব যে আমার পূর্বে এমন কেউ কাঁদেনি। ততক্ষণ কাঁদব যতক্ষণ না আমার স্বস্থিরতা ফিরে আসে।

বিশ্বের দয়াবান ব্যক্তিত্ব দয়ার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। এক বৃদ্ধা মহিলা নিজ সন্তানের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এরপরও ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করছে। সে যদি তার সামনে থাকত তাকে গলায় জড়িয়ে ধরতো। কপালে চুম্বন দিত। আর কখনও তাকে তার থেকে পৃথক হতে দিত না।

উম্মে হারেসা অত্যন্ত গভীর বেদনায় দাঁড়িয়ে ফলাফলের অপেক্ষা করছেন। না জানি তিনি কি বলেন। দু'পা থরথর করে কাঁপছে। গলা শুকিয়ে গিয়েছে। চেহারা অশ্রু বইছে। আশা-আকাঙ্ক্ষার দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছেন সেই সত্যবাদীর মুখের প্রতি যার থেকে শুধুমাত্র সত্যই বেরিয়ে আসে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তার সন্তানের প্রতি এরূপ ভালবাসা লক্ষ্য করলেন। তখন এরশাদ করলেনঃ

«وَيَحْكُ أَوْ هَبْلَتْ أَوْ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جَنَّاتٌ كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ»

উম্মে হারেসা তোমার কি হয়ে গেল। সন্তানের ভালবাসায় পাগলের মত হয়ে গেছ। তুমি এক জান্নাতের কথা বলছো? মহান আল্লাহ অনেকগুলো জান্নাত দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করেছেন। তুমি খুশি হয়ে যাও। তোমার সন্তান জান্নাতুল ফেরদাউসে পৌঁছে গেছে। (বুখারীঃ ৩৯৮২, তিরমিযীঃ ৩১৭৪, আহমদঃ ১২৪/৩)

জান্নাতুল ফেরদাউসের ছাদ হলো অসীম দয়ালু প্রভুর আরশ। জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থান জান্নাতুল ফেরদাউস যার উপর আল্লাহ তায়ালার আরশ। যখন বৃদ্ধা মহিলা এই সুসংবাদ শুনতে পেলেন তখন গভীর শ্রদ্ধায় তার মাথা নত হয়ে গেল। তার চেহারার উজ্জ্বলতা ফিরে আসল। আর অশ্রু থেমে গেল। আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আল্লাহ্ আকবার! আল্লাহ তোমার করুণা। আমি এখন শহীদেদের মা, আমার সন্তানের জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ পাওয়া গেছে। আমার কি ভাগ্য। আমি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ চাই না, আর না দুনিয়ার কোন প্রতিদান। আমি তো চাই মহান প্রভুর খুশি, তার সন্তুষ্টি আর তার ভালোবাসা।

আমাকে বিবাহ করা আপনার জন্য বৈধ নয়

খাইয়রান বিনতে আতা খলীফা মাহদীর দাসীদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি খুবই বুদ্ধিমতি রমণী ছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রের গবেষণায় ভালো বুৎপত্তি ছিল। কেননা ইমাম আওয়যীর কাছে তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও পারদর্শিতা দেখে খলীফা মাহদী তাকে মুক্তি দিয়ে নিজের স্ত্রীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান; কিন্তু খাইয়রান তাকে বললেনঃ আপনি যদি আমার সাথে বিয়ে না করেন তাই উত্তম, কেননা আপনার জন্য আমাকে বিয়ে করা বৈধ নয়।

খলীফা তাঁর উত্তর শুনে খুবই আশ্চর্য হলেন। এক শাসক তার দাসীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন আর সে এভাবে আপত্তি তুলে ধরেন।

খলীফা মাহদী খাইয়রানের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন?

কি কারণে তুমি আমার স্ত্রী হতে পারবে না? অথচ তুমি পূর্ব থেকেই আমার দাসী?

খাইয়রান উত্তর দিলেনঃ

«لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَيَّ»

আপনার জন্য আমার কাউকে সতীন বানানো ঠিক নয়।

খলীফা মাহদী যখন খাইয়রানের সাথে বিয়ের সিদ্ধান্তে অটল তখন তিনি বললেনঃ কোন আলেমকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার জন্য আমার সাথে বিয়ে কেন অবৈধ?

খলীফা মাহদী বললেনঃ তুমি কি সুফিয়ান সাওরীর এ ব্যাপারে সমাধানকে সঠিক মনে করবে?

খাইয়রান বললেনঃ অবশ্যই আমি তাঁর সমাধানে রাজি আছি।

খলীফা মাহদী ইমাম সুফিয়ান সাওরীর সাথে কথা বললেন যে, মূলতঃ কি কারণে আমার এক দাসীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ নয়? অথচ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ﴾

অর্থঃ “রমণীদের মধ্যে যাদের তোমাদের পছন্দ হয় তোমরা তাদের সাথে বিয়ে করে নাও দু’টি করে, তিনটি করে অথবা চারটি।”

একথা বলে খলীফা মাহদী নীরব রইলেন। আর ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলতে লাগলেনঃ আপনি আয়াতোর একাংশ তো পড়েছেন ঠিকই কিন্তু এর পরের আয়াতটুকুও পড়েনঃ

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

অর্থঃ “যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, (একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে) ইনসাফ করতে পারবে না। তবে এক স্ত্রীই যথেষ্ট অথবা তোমাদের অধীনস্থ এক দাসী।” (সূরা নিসাঃ ৩)

ইমাম সাওরী (রহঃ) খলীফাকে বুঝিয়ে দিলেন যে আপনি খাইয়রানকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তার সাথে ইনসাফ করতে পারবেন না। এজন্য তাকে দাসী হিসেবে রাখাটাই উত্তম।

খলীফা সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) কে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার হিসেবে দিতে নির্দেশ দিলেন কিন্তু ইমাম সাওরী (রহঃ) নিতে অস্বীকার করলেন।

খাইয়রানের বুদ্ধিমত্তার সমাধান খলীফার সুস্পষ্ট বুঝে আসল যে, তিনি যদি খাইয়রানকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তবে তার সাথে পূর্ণ ইনসাফ করতে পারবেন না। তার সাথে অন্যান্য স্ত্রীদের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে এবং তাকে সকল পারিবারিক অধিকার অর্পণ করতে হবে।

সুতরাং কিছুদিন পর ১৫৯ হিজরীতে খলীফা খাইয়রানকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে বিয়ে করে নিলেন। তার গর্ভ হতে দু’টি সন্তান হয়ঃ এক হাদী আর দ্বিতীয় হারুনুর রশীদ। মাহদীর ওফাতের পর হাদী খলীফা হলেন আর হাদীর পর হারুনুর রশীদ খলীফা নিযুক্ত হলেন। খাইয়রান নিজ সন্তান হারুনুর

রশীদের খেলাফতকালে আল্লাহর ঘরের হজ্জ করলেন এবং নেকী ও কল্যাণমূলক কাজে এবং দারিদ্রতা মোচনে প্রচুর অর্থ-সম্পদ নিজ হাতে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিলেন।

খাইয়রান ১৭৩ হিজরীতে বাগদাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।^১

1. দেখুনঃ আল-‘আলাম লিল রিয়কলিঃ ২/৩২৮, ওয়াফিয়াতুল আ‘ইয়ানঃ ২/৩৮৯, আল বেদায়া ওয়ান নেহায়াঃ ১৩/৫৬৮।

হে পালনকর্তা! আমার রিযিক তোমার দায়িত্বে

আবু আব্দুল্লাহ বিন জাফর যে, বারকী উপাধিতে খ্যাত। তিনি বলেনঃ আমি এক বেদুঈন মহিলাকে দেখেছি যার ফসল মুশলধারে বৃষ্টি ও প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়াতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। লোকজন তার চতুর্পার্শ্বে ভীড় করেছিল। আর তার ফসলের ক্ষতিতে তারা তাকে আশ্বাস দিচ্ছিল।

মহিলাটি তাদের প্রতি দ্রুত দৃষ্টি না করে তার দৃষ্টি দিয়ে আকাশ পানে তাকালেন এবং বলতে লাগলেনঃ

«اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَأْمُولُ لِأَحْسَنِ الْخَلْفِ، وَبِيَدِكَ التَّعْوِضُ
عَمَّا تَلَفَ، فَافْعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، فَإِنَّ أَرْزَاقَنَا عَلَيْكَ،
وَأَمَّا لَنَا مَصْرُوفَةٌ إِلَيْكَ»

অর্থঃ “হে পরোয়ারদিগার! দুর্দশাগ্রস্ত, বিপদে পতিতদের দেখা-শোনার জন্য তোমারই কাছে আশা করা যায়। যা কিছু ধ্বংস হয়েছে এর বিকল্প ব্যবস্থা তোমার হাতেই অর্পিত। এজন্য তুমি আমায় অদৃশ্য, অজানা পন্থায় সাহায্য কর। কেননা আমার বিশ্বাস যে, আমাদের অর্থের ব্যবস্থা একমাত্র তোমার হাতেই এবং আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমার কাছে করা হয়।

আবু আব্দুল্লাহ বিন জাফর বলেনঃ আমি তখনও সেই মহিলাটির কাছেই ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে এসে পৌঁছল। আর আমরা জানি না যে, তিনি কে? কোথা হতে আসলেন? আর উদ্দেশ্যই বা কি? যখন তিনি মহিলার বিশ্বাস এবং আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসার বিষয় জানতে পারলেন তখন তিনি ৫০০ দিনার বের করলেন এবং সেই মহিলার খেদমতে পেশ করে চলে গেলেন। (মাজাল্লাতুল আরাবীঃ ১৮৮/৪৪৪ অতি মেধাবী নারীগণের বর্ণনাঃ ৪৪)

এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যেই ব্যক্তিই আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা করবে এবং পরহেয়গারীতা অবলম্বন করবে সে কখনও আল্লাহর নেয়ামত

থেকে বঞ্চিত হবে না। আর আল্লাহ তায়ালা এমন কোন পন্থায় রিষিকের ব্যবস্থা করে পৌঁছিয়ে দিবেন যা বান্দাহ কল্পনাও করতে পারে না। যেমন সেই গ্রাম্য মহিলাটির সাথে হয়েছে। এতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতেও স্পষ্ট হয়ঃ

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

অর্থঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে তিনি তার জন্য কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তির পথ প্রস্তুত করে দেন। আর তাকে এমন পন্থায় সম্পদ দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।” (সূরা তালাকঃ ৩-২)

উল্লেখিত ঘটনার ন্যায় আমি আরবী সাহিত্যের কতক পুস্তকে পড়েছি, এক দরিদ্র গ্রামবাসী মহিলা মরু প্রান্তরে তাঁবু লাগিয়ে ছিলেন। নিজ প্রয়োজনে তিনি চতুর্পার্শ্বে ফসল করেছিলেন তা দিয়ে তার সংসার চলে যেত। একদিন ঝড়ো-হাওয়া বইল বিদ্যুৎ চমকাল, আকাশ থেকে শিলা-বৃষ্টি পড়ল এবং ফসল ধ্বংস হয়ে গেল। যখন ঝড়ু থেমে গেল আর মহিলাটি ঘর থেকে মাথা বের করে দেখলেন সব কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি হতাশার দৃষ্টিতে দেখলেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকালেন এবং বলতে লাগলেনঃ

«اٰصْنَعْ يَا اِلٰهِي مَا شِئْتُ، فَاِنَّ رِزْقِيْ عَلَيْكَ»

অর্থঃ “হে আমার পালনকর্তা! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর (তোমাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারো নেই।) হ্যাঁ (একথা অবশ্যই যে,) আমার রিযিক তোমার দায়িত্বে।”

তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে সোজা করতে চেষ্টা করো না

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী লেখক ওয়াকেদী বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন খলীফা মাহদীর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং তার কাছে কতক হাদীস বর্ণনা করলাম। আমার বর্ণনাকৃত হাদীসসমূহ তিনি লিখে নিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ পর নিজ ঘরে প্রবেশ করলেন। যখন তিনি তার বাসভবন থেকে বের হলেন তার চেহারা রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমীরুল মুমেনীন! ভালো আছেন?

«دَخَلْتُ عَلَى الْخَيْرُرَّانِ فَقَامَتْ إِلَيَّ وَمَزَّقَتْ ثَوْبِي وَقَالَتْ:
مَا رَأَيْتُ خَيْرًا مِنْكَ»

খলীফা মাহদী বলতে লাগলেনঃ আমি আমার স্ত্রী খাইয়রানের নিকট গেলাম আর সে আমার কাপড় এত জোরে টান দিলো যে, ছিঁড়ে গেল এবং বলতে লাগলঃ আমি তোমার কাছে উত্তম কিছু পাইনি।

খলীফা আরও বললেনঃ হে ওয়াকেদী! আপনি ভাল করেই জানেন যে, আমি খাইয়রানকে এক দাস বিক্রেতার কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম। অতঃপর আমি তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে বিয়ে করি।

সুতরাং এখন সে শাহী ভবনে আমার স্ত্রী হিসেবে বিলাসিতার জীবন-যাপন করছে। এরপর এমন নেয়ামত উপভোগ করছে যা অন্যান্য স্বাধীন নারীদেরও নাগালের বাইরে; কিন্তু আজ সে এমন পরিবর্তন হয়ে গেল যে, সে আমার যাবতীয় প্রদানকৃত সবকিছুর উপর পানি মেরে দিল আর বলতে লাগল যে, আজ পর্যন্ত তোমার মধ্যে উত্তম কিছু দেখিনি!!

অথচ উভয় সন্তানের (হাদী ও হারুন) জন্য অগ্রিম (বাইয়াত) প্রজাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়ে নিয়েছি। আমার পর তারা উভয়েই একের পর এক মুসলিম জনগোষ্ঠীর খলীফা নিযুক্ত হবেন। এরপরও আমার উপর অপবাদ দিচ্ছে যে, আমি তার জন্য কোন ভাল কিছু করিনি!!

ওয়াকেদী খলীফা মাহদীর কথা শোনে বললেনঃ আমীরুল মোমেনীন! আপনি নারাজ হবেন না, কেননা নেয়ামতের অকৃতঘ্ন হওয়া নারীদের স্বভাবগত অভ্যাস। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»

“তোমাদের মধ্যে সেই সব থেকে উত্তম যে, তার পরিবারের জন্য উত্তম আর আমি পরিবারের জন্য তোমাদের সকল থেকে উত্তম।” (সহীহ ইবনে মাযাহ, বিবাহ অধ্যায়ঃ ১৯৭৭)

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

«اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنْ أَعْوَجَ شَيْءٌ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كُسْرَتُهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ»

“মহিলাদের বিষয়ে আমার উপদেশ সর্বদায় মনে রাখবে। নিশ্চয় নারী জাতি সীনার হাড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আর সীনার হাড়ের মধ্যে সব থেকে বেশি বাঁকা হলো সর্বো উপরেরটি যদি তুমি তা সম্পূর্ণ সোজা করতে চাও তবে শেষ পর্যন্ত তুমি তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি তা এভাবেই ছেড়ে দাও তাহলে সেভাবেই বাঁকা থাকবে। (আর এই বাঁকা অবস্থায়ই তার থেকে লাভবান হতে পার)।

সুতরাং তোমরা নারীদের বিষয়ে আমার উপদেশ মেনে চলো। মহিলাদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর!! (বুখারীঃ ৩৩৩১, মুসলিমঃ ১৪৬৮)

ওয়াকেদী এই বিষয়ে আরও অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেন। খলীফা মাহদী তাকে দু’হাজার দীনার দেয়ার নির্দেশ দিলেন। যখন ওয়াকেদী খলীফার নিকট থেকে নিজ গৃহে পৌঁছলেন সেই মুহূর্তে রাণী খাইয়রানের দূতও তার দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রায় দু’হাজার দীনার তাকে উপহার দিলেন এর সাথে কাপড় ও জুতাও ছিল। রাণী তার দূত দ্বারা এই উত্তম কাজের উপর ওয়াকেদীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। (দেখুনঃ আল-বিদায়া ওয়াননিহায়াঃ ৫৪৫/১৩)

সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী কে?

এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী ছিল। একদিন তার সর্ব কনিষ্ঠ স্ত্রী তাকে বললঃ

«أَحِبُّ أَنْ تُعْلِنَ أَمَامَ زَوْجَاتِكَ أَنَّي أَكْثَرُهُنَّ حُبًّا إِلَيَّ قَلْبِكَ»

“আমি চাই যে, আপনি আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের সামনে একথা ঘোষণা করে দিবেন যে, আমি আপনার অন্যান্য সকল স্ত্রীদের তুলনায় আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালবাসার পাত্রী ও সর্বাধিক প্রিয়।”

স্বামী অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এক দেরহাম নিজ পকেট থেকে বের করলেন এবং নিজের কনিষ্ঠ স্ত্রীর হাতে রেখে দিলেন এরপর অন্যান্য সকল স্ত্রীদের হাতেও গোপনে এক এক দিরহাম করে দিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে কেউ জানতে পারেনি যে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিরহাম দেয়া হয়েছে। যখন সকল স্ত্রী একত্রিত হলো তখন কম বয়সী স্ত্রী তার স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করলঃ

«مَنْ أَحَبُّ نِسَائِكَ إِلَيْكَ؟»

“আপনার দৃষ্টিতে আপনার স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী কে? একথা বলে সে ধারণা করে নিয়েছে যে, উত্তরে তার স্বামী তারই নাম নিবে; কিন্তু স্বামী উত্তরে বললেনঃ

«مَنْ أَعْطَيْتُهَا دِرْهَمًا»

আমার নিকট সব থেকে বেশি প্রিয় স্ত্রী সেই যাকে আমি এক দিরহাম দিয়ে রেখেছি।

একথা শুনে কনিষ্ঠ স্ত্রী খুশিতে হাত উঠাল এবং তাতে রাখা নিজের দিরহাম দেখাতে লাগল।

অন্যান্য স্ত্রীদের এই কথা বুঝাতে চাচ্ছিল যে, সে তাদের তুলনায় স্বীয় স্বামীর সর্বাধিক প্রিয়। এরই মধ্যে অন্যান্য স্ত্রীরাও নিজ নিজ হাত উঁচু করল এবং সকলের হাতে একটি করে দিরহাম ছিল!!

নাহরে যুবাইদা

এটা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর সময়কাল। এ সময় বিশ্বের চতুর্দিকে ইসলামের আলো উদ্ভাসিত হচ্ছিল। সেই আরব জাতিসমূহ যারা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে কিছুকাল পূর্বেই পরস্পর পরস্পরের প্রতিশোধের আগুনে জ্বলছিল। আজ ইসলামী শিক্ষার বদৌলতে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছিল। গোত্রসমূহের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ যুদ্ধ-কলহ অনেকটাই কমে গিয়েছিল। তবে পরস্পর বিরোধিতা নিঃসন্দেহে ছিল; কিন্তু যখন শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধে যখন লিপ্ত হতো তখন সকলেই পরস্পর এক গোত্র অন্য গোত্রকে সম্মান করে চলত। তরবারীর ছায়াতলে তাদের নামায আদায় হতো। আর যে সব এলাকায় তারা জেহাদের পতাকা উত্তোলন করতো সেই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে সুবিচার ও অধিকার দেয়া তাদের নৈতিকতা ছিল। অন্য দিকে মুসলমান প্রচারকগণ দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ চালু রাখতেন। সুতরাং মুসলমানের এসব গুণাবলীতে প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগল। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর শেষের দিকে ইসলামী রাজত্ব খলীফা হারুনুর রশীদের হাতে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুসলমানগণ আল্লাহর ঘরের হজ্জ আদায় করার জন্য আসতে থাকে। পবিত্র মক্কায় পানি খুব দুর্লভ। হাজীগণ এবং মক্কাবাসী খুবই কষ্ট করে কোন রকম পানির ব্যবস্থা করেন।

সেই সময়কালে রাণী যুবাইদা বিনতে জাফর হজ্জ পালনে পবিত্র মক্কায় আসলেন। তিনি যখন মক্কাবাসী ও হাজীগণকে পানির সমস্যায় জর্জরিত অবস্থায় দেখলেন তাতে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। সুতরাং তিনি নিজ অর্থ ব্যয় করে দীর্ঘ খাল খননের নির্দেশ দিয়ে এমন এক নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপনের কর্তৃত্ব অর্জন করেন যা কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতি স্মরণ করবে।

উম্মে জাফর যুবাইদা বিনতে জাফর বিন আবু জাফর মানসূর হাশেমী বংশের এক উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন। তিনি খলীফা হারুনুর রশীদের চাচাত

বোন ছিলেন। তার নাম “আমাতুল আযীয” ছিল। তার দাদা মানসুর তার শৈশবে তাকে নিয়ে খুব খেলতেন এবং তাকে আদর করে “যুবাইদা” নামে ডাকতেন। সুতরাং সবাই তাকে এ নামেই ডাকা শুরু করেন। আর মূল নাম লোকজন ভুলে যায়। তিনি খুবই সুন্দরী ও মেধাবী ছিলেন।

যখন যৌবনে পা রাখল তখন খলীফা হারুনুর রশীদের সাথে বিয়ে হয়ে গেল। এই বিয়ে বড় ধুম-ধামের সাথে ১৬৫ হিজরীর জিলহজ্জ মাসে সম্পন্ন হয়। হারুন রশীদ এই বিয়ের আনন্দের অনুষ্ঠানে রাজ্যের সাধারণ ও বিশেষ শ্রেণীর সকলকেই আমন্ত্রণ জানান। আর মেহমানদের মাঝে এত বেশি পরিমাণ অর্থ বিতরণ করা হয় যার দৃষ্টান্ত ইসলামের ইতিহাসে অন্যটি পাওয়া যায় না। তিনি এই সময় নির্ধারিত বায়তুল মাল হতে পঞ্চাশ মিলিয়ন দিরহাম ব্যয় করেন, যা তাঁর স্বীয় সম্পদ হতে যা খরচ করেন তা হতে পৃথক ছিল।

হারুন রশীদ রাণী যুবাইদাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। একবার তিনি তার স্ত্রীকে এই বলে ডাকলেনঃ “উম্মে নাহার! এদিক এসো! যুবাইদা পরবর্তীতে এক বিখ্যাত পণ্ডিত আসমায়ীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমীরুল মোমেনীন খলীফা আমাকে উম্মে নাহার বলে ডাকে এর কি অর্থ? আসমায়ী উত্তর দিলেনঃ যেহেতু জাফর আরবী ভাষায় “নাহার” খালকে বলা হয় আর আপনার ডাকনাম উম্মে জাফর। এজন্য খালের অর্থে তিনি এই নামে হয়ত ডেকেছেন।

যুবাইদা খুবই বুদ্ধিমতি রমণী ছিলেন। নিকটে অবস্থানকারী কারো কোন কথা শোনামাত্রই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন না। একবার এক কবি তার উদ্দেশ্যে কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন; কিন্তু হয়ত তিনি শব্দ চয়নে কথা সুসজ্জিতরূপে সাজাতে না পেরে নিজের মনের কথা ভাল করে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। কবিতার অর্থে রাণীর প্রশংসা ও মহত্ব বর্ণনার পরিবর্তে বেয়াদবী প্রকাশ পেয়ে যায়।

রাণীর সেবায় নিয়োজিতরা বেয়াদবী হিসেবেই নিশ্চিত হলেন এবং তাকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত নিলেন; কিন্তু রাণী তাদের বললেনঃ

«دَعُوهُ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ خَيْرًا فَأَخْطَأَ خَيْرٌ مِّمَّنْ أَرَادَ شَرًّا
فَأَصَابَ»

“তাকে ছেড়ে দাও কেননা যার নিয়ত ভাল কথা বলার; কিন্তু যদি সে ভুলবশতঃ অন্যায় কথা বলে এমন ব্যক্তি সেই ব্যক্তি থেকে উত্তম যার নিয়ত “উদ্দেশ্য” খারাপ; কিন্তু সে কথা ভাল বলে।”

রাণী যুবাইদার সেবায় নিয়োজিত একশত সেবিকা ছিল। যাদের কুরআনে কারীম মুখস্ত ছিল এবং তারা সর্বদায় কোরআন পাক তেলাওয়াত করত। তার ভবন থেকে মৌমাছির গুণগুণীর আওয়াজের ন্যায় শব্দ ভেসে আসত।

যুবাইদা পানির স্বল্পতার দরুণ সম্মানিত হাজীগণের ও মক্কাবাসীর সংকট ও সমস্যাগুলি নিজে পরিদর্শন করলেন। অতঃপর তিনি পবিত্র মক্কায় একখাল খননের সিদ্ধান্ত নিলেন। এর পূর্বেও মক্কাবাসীদের প্রচুর অর্থ দিয়ে সহায়তা করতে থাকেন এবং হজ্জ ও উমরার জন্য আগতদের সাহায্য সহায়তা করতেন এবং হজ্জ ও উমরার জন্য আগতদের সাহায্য সহায়তার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। এবার খাল খননের পরিকল্পনা সামনে আসল আর বিভিন্ন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারকে আহ্বান করা হলো। পবিত্র মক্কা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে উত্তর পূর্বে হুনাইন উপত্যকার “তাদ পাহাড়” থেকে খাল খননের পরিকল্পনা করা হলো। অন্য একটি খাল যার পানি কুবা পাহাড় থেকে নোমান উপত্যকায় গিয়ে পড়ত সেটাকেও যুবাইদা খালের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। এই স্থান আরাফাত থেকে ১২ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। এ ছাড়া মিনার দক্ষিণ প্রান্তে এক কুঁয়া ছিল যুবাইদা নামে যাতে বৃষ্টির পানি জমা করা হত তা থেকে পানি খালে নেয়া হয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে এক ছোট খাল মক্কার দিকে এবং অন্য একটি মসজিদে নামিরায় নেয়া হয়েছে। এই মহৎ উদ্যোগে সতের (১৭০০০০০) লাখ দীনার ব্যয় হয়েছিল।

রাণী যুবাইদা আশা ও নিষ্ঠার সাথে খালের খনন করিয়ে ছিলেন। তিনি সম্মানিত হাজীগণ ও মক্কাবাসীর পানির সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন আর এই কাজ তিনি একমাত্র আল্লাহর খুশির জন্যই করেছিলেন এটা অনুমান করা যায় এই কথা দ্বারা যে, যখন যুবাইদা খাল খননের উদ্যোগ নেয়া শুরু হলো তখন এর ব্যবস্থাপক ইঞ্জিনিয়ার এসে বললেনঃ “আপনি যে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছেন এর জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন কেননা এর বাস্তবায়নে বড় বড় পাহাড় কাটতে হবে, পাথর ভাঙতে হবে হাজার হাজার শ্রমিকদেরকে দিন রাত পরিশ্রম করতে হবে তবেই এই কাজে সফলতা আসতে পারে।

একথা শ্রবণ করে রাণী যুবাইদা যে উত্তর দিলেন তা খুবই হৃদয়গ্রাহী এবং তা থেকে তার সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে বললেনঃ

«اعْمَلْهَا وَلَوْ كَانَتْ ضَرْبَةُ فَأْسٍ بِدِينَارٍ»

“একাজ শুরু করে দাও যদি তা কোদালের এক আঘাতে এক দীনার ব্যয় হয়।”

এভাবে যখন খালের খননের কাজ সমাপ্তিতে পৌঁছল তখন ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বশীলরা ব্যয়ের হিসাবসমূহ রাণীর দরবারে পেশ করলেন। সে সময় রাণী দাজলা নদীর তীরস্থ নিজের বাস ভবনে ছিলেন। রাণী সেসব হিসাবের কাগজপত্র না দেখেই নদীতে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেনঃ

“হে আল্লাহ! আমি দুনিয়াতে কোন হিসাব-নিকাশ নিব না তুমিও আমার কাছ থেকে কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ নিও না।”

রাণী যুবাইদা এ মহৎ কাজ সম্পাদন করে সম্মানিত হাজীদের এবং মক্কাবাসীর পানি সংকটের সমস্যার সমাধান করলেন। আল্লাহ তায়ালা এ খাল-কে তার জন্য সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে গ্রহণ করেন।

তিনি জমাদিউল উলা ২১৬ হিজরী সনে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।^১

১. আল বিদায়া ওয়ান নেহায়া---এবং তারীখে মক্কা মুকাররমা, মুহাম্মাদ আব্দুল মাবূদ ও অন্যদের গ্রন্থ হতে সংকলিত)।

খেজুরে অলৌকিক বরকত

খন্দক যুদ্ধের প্রস্তুতি খুব জোরে শোরে চলছিল। মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর চারপাশে খন্দক খননে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক মুসলমানের ঘরে এক বেলার খাবার রুটিও ছিল না। এরপরও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালবাসায় সবাই তার নির্দেশ পালন করছিলেন। ক্ষুধায় কাতর হয়ে নিজের পেটে পাথর বেঁধে খন্দকের খনন কাজ করতেন যাতে অধিক ক্ষুধা বরদাশত করতে পারে। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও নিজের পেটে ক্ষুধার কারণে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন। আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ

«شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْجُوعَ فَرَفَعْنَا عَنْ بَطُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَجَرَيْنِ»

“আমরা আমাদের ক্ষুধার অভিযোগ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে করলাম এবং আমাদের প্রত্যেকেই নিজেদের পেটে একটি করে পাথর বাধা দেখালাম, আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের পেটে দু’টি পাথর বাধা দেখালেন। (জামে তিরমিযি, মিশকাতুল মাসাবিহ ৪৪৮/২)

খন্দক খননের জন্য সম্মানিত সাহাবাদের সংখ্যা এক হাজার এবং ওয়াকেদীর বর্ণনা অনুযায়ী তিন হাজার ছিলেন। খন্দক খননকালে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে একটি এক সাহাবীর বর্ণনা অনুযায়ী পেশ করা হল।

নোমান বিন বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বোনের বর্ণনা যে, আমার মা উমরা বিনতে রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমাকে ডাকলেন আর আমাকে দু’মুঠো খেজুর দিয়ে বললেনঃ এগুলো তোমার পিতা বাশীর এবং মামার (আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার) খেদমতে নিয়ে যাও। যাতে করে তারা দুপুরের খাবার হিসেবে কিছু খেয়ে নেয়। আমি খেজুরগুলো নিয়ে

আমার পিতা ও মামার খোঁজে বের হলাম। তার উভয়েই অন্যান্য সাহাবাদের সাথে খননের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তাদের খুঁজতে দেখে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ

«مَا الَّذِي مَعَكَ؟»

“তোমার কাছে কি?”

আমি বললামঃ

«هَذَا تَمْرٌ بَعَثَنِي بِهِ أُمِّي إِلَى أَبِي وَخَالِي يَتَغَدَّيَانِهِ»

এগুলো খেজুর যা আমার মা আমাকে দিয়েছেন আমার বাবা ও মামাকে দুপুরের খাবার হিসেবে খাওয়ার জন্য।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«هَاتِيهِ»

এ খেজুরগুলো আমাকে দিয়ে দাও।

আমি খেজুরগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে রেখে দিলাম, তার হাত ভরেনি। এরপর তার নির্দেশে চাদর বিছানো হলো। আর তিনি চাদরের উপরে খেজুরগুলো রেখে দিলেন। এরপর তিনি এক ব্যক্তিকে বললেনঃ “খন্দকবাসীদের ঘোষণা দিয়ে দাও যে, দুপুরের খাবার খেয়ে নিতে।”

এ ঘোষণা শোনামাত্রই খন্দক খননে ব্যস্ত সকল সাহাবী এসে দস্ত রখানে উপস্থিত হলেন এবং খেজুর খেতে লাগলেন। খন্দকবাসী খেজুর খাচ্ছিলেন আর খেজুর বাড়ছিল। সকল খন্দকবাসী খেজুর খেয়ে ফিরে গেলেন আর খেজুর এই পরিমাণ ছিল যে, চাদরের কোণা দিয়ে খেজুর পড়ে যাচ্ছিল।

1. (সীরাতে ইবনে হিশাম ২১৮/২ আল মাগাজী লিল ওয়াকেদী ৪৭৬/২, উসদুল গাবাঃ ৭/৪১৪)

উম্মে মা'বাদের নজীরবিহীন বাকপটুত্ব

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারা অভিমুখে যাত্রা করেন তখন রাস্তায় উম্মে মাবাদ খুজায়ার তাঁবুর কাছে দিয়েই অতিক্রম করেন। উম্মে মা'বাদের নাম আতিকা বিনতে খালেদ বিন মুনকায বিন রাবীয়াহ ছিল। তার স্বামীর নাম আকসাম বিন আবিল জাওন আল-খুজায়ী ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বরকতে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

উম্মে মা'বাদ মেহমানদের খুব ভাল আপ্যায়ন করতেন। তার তাঁবুর কাছে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে খাবার খাওয়াতেন। হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার তাঁবুর কাছে পৌঁছলে তার কাছে খাবার চাইলেন এবং এর বিনিময়ে মূল্য আদায় করে দেয়ার কথাও বললেন; কিন্তু তার কাছে কিছু না থাকায় তিনি বললেনঃ আমার কাছে কিছু থাকলে আপনাদের অবশ্যই খেতে দিতাম।

উম্মে মা'বাদের তাঁবুর এক কোণায় একটি হালকা-পাতলা বকরী ছিল যা দেখতে খুবই ক্ষধার্ত মনে হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, উম্মে মা'বাদ! আমি কি তোমার এই বকরীটির দুধ দোহাতে পারি?

উম্মে মা'বাদ বললেন, এই বকরীতে দুধ কিভাবে আসতে পারে? এটাতো ঘরের বাইরে অন্য বকরীর সাথে চরার জন্যও যেতে পারে না। কেননা এটা অনেক বেশী দুর্বল। তিনি বললেন, তবুও আমাকে অনুমতি দাও। উম্মে মা'বাদ বললেন, আমার মা-বাবা আপনার জন্য কুরবান! যদি আপনি এতে দুধ দেখতে পান তবে অবশ্যই দহন করেন।

একথার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বকরীর স্তনে হাত দিলেন। আল্লাহর নাম নিলেন আর প্রার্থনা করলেন। বকরী পা ফাঁক করে দিল। স্তনে প্রচুর দুধ চলে আসল। তিনি উম্মে মা'বাদের কাছে থেকে

বড় একটি পাত্র নিলেন যা একটি কাফেলার জন্য যথেষ্ট। পাত্র ভরে গেল। এরপর উম্মে মা'বাদকে পান করতে দিলেন, সাথীদের দিলেন অবশেষে নিজে পান করলেন। আবার দুধ দোহালেন এবং বাটি ভরে গেল আর উম্মে মা'বাদের কাছে রেখে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

এদিকে যখন উম্মে মাবাদের স্বামী বকরী চরিয়ে আসলেন আর ঘরে দুধ দেখে অবাক হয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, এই দুধ কোথা থেকে আসল? অথচ ঘরে কোন বকরী নেই, আর একটি বকরী যা আছে তা খুবই দুর্বল যার স্তন শুকিয়ে আছে?

উম্মে মা'বাদ উত্তরে বললেনঃ এর প্রকৃত বিষয় হল এখানে এক ব্যক্তি আগমন করেন, তিনি যখনই বকরীর স্তনে হাত দিলেন স্তন দুধে ভরে গেল। এরপর দুধ দোহালেন এবং সাথীদের পান করালেন এবং নিজেও পান করলেন এরপর অতিরিক্ত আমাদের কাছে রেখে চলে গেলেন।

আবু মা'বাদ বললেন, তিনিতো সেই কুরাইশী মনে হয় যাকে কুরাইশরা খোঁজ করছে। আবু মা'বাদ তার স্ত্রীকে বললেন, আচ্ছা সেই মোবারক ব্যক্তির আকৃতি বর্ণনা কর।

উম্মে মা'বাদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গড়ন-আকৃতি নিজস্ব ভঙ্গিতে বর্ণনা করেন। আরবী ভাষা-সাহিত্যের উপর তার দক্ষতা ও বাকপটুতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার এই বর্ণনায়। তার কথাকে সীরাতের কিতাব “রহমাতুল লিল আলামীনে” মানসূরপুরী এবং শায়খ সফিউর রহমান “রাহীকুল মাখতুমে” এভাবেই বর্ণনা করেছেন, যেভাবে উম্মে মা'বাদ উত্তম ভাষা প্রয়োগ করেছেনঃ “তিনি মহা সৌন্দর্যের অধিকারী, শারীরিক গঠন খুবই নিখুঁত, উজ্জ্বল রং, মাধুর্যপূর্ণ চেহারা। অতি চমৎকার গঠন, সুন্দর চুল, হাস্যোজ্জ্বল মুখমন্ডল, কাজল কালো চোখ, লম্বা পলক, ভারী আওয়াজ, লম্বা গরদান, সাদা-কালো চক্ষুদ্বয় সূক্ষ্ম এবং পরস্পর মিলিত ব্রু। উজ্জ্বল কেশ, নীরব অবস্থায় খুবই ভদ্র, কথা বললে খুবই আকর্ষণীয়, দূর থেকে দেখলে সব থেকে মনোমুগ্ধকর ও সুন্দর, কাছ থেকেও সুন্দর এবং মাধুর্যপূর্ণ, কথা খুব মধুর, বাক্য সুস্পষ্ট এবং স্বল্প

শব্দের। এত বেশী সংক্ষিপ্তও নয় আর এত বেশী লম্বাও নয়। কথা বললে মনে হয় যেন মালা থেকে মতি খসে পড়ছে, উচ্চতায় মধ্যম না খাট আর না এত লম্বা যে দেখতে খারাপ মনে হয়। দু'টি বৃত্তের মধ্যে এমন একটি বৃত্ত যা অতি সজিব ও মনোরম, সদাসর্বদা সঙ্গী-সাথীদের বেষ্টিত। কিছু যদি বলছেন, তারা অতি মনযোগসহ শ্রবণ করছে। কোন হুকুম দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালন করছে স্বেচ্ছায়ও স্বসম্মানে। না তিনি বদমেজাজী আর না অশ্লীলভাষী।^১

১. মূল আরবীর জন্য দেখুনঃ বেদায়া ওয়ান নেহায়াঃ ৬/২৯, যাদুল মাআদঃ ২/৫২।

শাসকের দায়িত্ব

একবার খেলাফতে উসমানিয়ার শাসক সুলাইমান কানুনীর (১৫২০-৬৬ খ্রিঃ) দরবারে এক বৃদ্ধ মহিলা এই অভিযোগ নিয়ে হাজির হলেন যে খলীফার সিপাহীরা তার পশু চুরি করে নিয়ে গিয়েছেন তখন সে ঘুমিয়ে ছিল তার ঘরে।

শাসক সুলাইমান বৃদ্ধার উত্তরে বললেনঃ

«كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْهَرِي عَلَى مَوَاشِيكَ وَلَا تَنَامِي»

“তোমার উচিত ছিল যে, নিজের পশুগুলো হেফাজতের জন্যে রাতে জেগে থাকা এবং ঘুম থেকে দূরে থাকা!!”

খলীফার কথা শুনে বৃদ্ধা কিছুক্ষণ নীরবে খলীফার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরপর খলীফার উত্তর এই বাক্যে দিলেনঃ

«ظَنَنْتُكَ سَاهِرًا عَلَيْنَا يَا مَوْلَايَ، فَنِمْتُ مُطْمَئِنَّةً الْبَالِ»

“আমি আপনার ক্ষেত্রে ভেবেছিলাম যে, আপনি আমাদের দেখা-শুনার জন্যে জেগে আছেন এজন্য আমি নিশ্চিন্তে প্রশান্তির ঘুম ঘুমিয়েছিলাম।”

বৃদ্ধার সন্তোষজনক উত্তরে সুলাইমানের নিজের ভুলের স্বীকৃতি ছাড়া কোন উপায় ছিল না। সুতরাং তিনি বললেনঃ

«مَعَكَ حَقٌّ»

“তুমি সত্য কথা বলেছ।”^১

ইঙ্গিতেই মর্মোদ্ধার

এক বেদুঈন তার ভ্রমণপথে মরুভূমি অতিক্রম করছিল। তার খুব বেশী তৃষ্ণা পেল। পানির খোঁজে সামনে চলতে লাগল; কিন্তু দূর-দূরান্তে পানির কোন চিহ্নও ছিল না। এদিকে তৃষ্ণার কারণে সে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। অনেক খোঁজাখোঁজির পর এক কুয়ার কাছে সে পৌঁছল যার পাশেই এক বেদুঈন যুবতী বসেছিল।

কুয়া দেখে বেদুঈনের দেহে প্রাণ ফিরে আসল, সে যুবতী বেদুঈনকে বললঃ

«أَهْوَنَ مَا عِنْدَكُمْ نُرِيدُ وَأَضْعَبَ مَا عِنْدَكُمْ لَا نَطْلُبُ»

“তোমার কাছে যা সহজলভ্য তাই আমি তোমার কাছে চাই আর যা তোমার জন্য কঠিন তা আমি চাইব না!”

এই ইঙ্গিত শুনে যুবতী তাকে পানি পান করতে দিল আর যখন পানি পান করে পরিতৃপ্ত হল তখন যুবতী বলতে লাগলঃ যদি তোমার নাম জানতে পারতাম তবে তোমাকে স্বাগত জানাতে পারতাম।

বেদুঈন উত্তর দিলঃ

«اسْمِي عَلَى وَجْهِكَ»

“আমার নাম তোমার চেহারায়।”

যুবতী বললঃ

«هَنِيئًا يَا حَسَنُ»

“হে হাসান! তোমার আগমন মোবারক হোক!”

আরবী ভাষায় হাসান সুন্দরকে বলা হয়। সুন্দরী যুবতী বেদুঈনের একথার মর্ম বুঝতে পেরে তাকে হাসান নামে অভিহিত করে।

বেদুঈন বললঃ

«وَأَنَا لَوْ عَرَفْتُ اسْمَكَ لَشَكَرْتُكَ»

“যদি আমি তোমার নাম জানতে পারতাম তবে আমি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতাম।”

বেদুঈন যুবতী উত্তর দিলঃ

«اسْمِي عَلَى جَنْبِكَ»

“আমার নাম তোমার পার্শ্বে।”

বেদুঈন তার পার্শ্বে তরবারী ঝুলিয়ে রেখেছিল। সে তৎক্ষণাত তার নাম বুঝতে পেরে বললঃ

«شُكْرًا يَا هِنْدُ»

“হে হিন্দ! তোমার অনেক অনেক শুকরিয়া।”

তরবারীর অনেক নামের মধ্যে এক নাম মুহান্নাদও যা তার পার্শ্বে ঝুলানো ছিল। হিন্দুস্তানের লোহা দিয়ে তৈরী তরবারীকে মুহান্নাদ বলা হয়। এর দ্বারা বেদুঈন সেই যুবতীর নাম জেনে নিল।

এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল যে, আরবের বেদুঈনরা কত মেধাবী ও বুদ্ধিমান। (মারায়্যা নেসাইয়্যাঃ ৭০, মেয়ে লোকের বুদ্ধিমত্তাঃ ৪৩)

সন্তোষজ্ঞাপন ও আত্মসমর্পণকারী রমণী

এই দুনিয়ায় সর্বাধিক নির্যাতিত ও নিপিড়িত সেই সকল মহা মানব হয়ে থাকেন যারা বান্দাকে বান্দার গোলামী থেকে বের করে এক সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের দিকে আহ্বান করেন। শিরক ও পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়ে একত্ববাদের ও সুন্নতের দিকে আহ্বান করেন। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) তেমনিভাবে আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্বের আওয়াজ বুলন্দ করেন এবং স্বীয় জাতিকে বাতিল উপাস্যের ইবাদত, উপাসনা পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করায় জাতির হৃদয়ে আগুন জ্বলে উঠল। আর তা শুধু নিজ বংশের লোকেরই নয়; বরং পুরো জাতির চোখে যেন কাঁটা হয়ে ফুটতে শুরু করল।

নমরুদ যখন দেখল যে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন তার অন্তরে তাওহীদের এ ধ্বনি বজ্রের মত আঘাত হানল। যদি সে সত্যের এ আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে তার রবের মর্যাদা থেকে নেমে বান্দা হতে হয় আর এক আল্লাহ তায়ালার জন্য মাথা নত করতে হয়। এই আহ্বানে সাড়া দেয়া এজন্য সম্ভব ছিল না। এ দাওয়াত তার গলায় কাটা হয়ে বিধল, না সে গিলতে পারে না বের করতে।

সুতরাং সে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর প্রাণের শত্রু হয়ে গেল। যেহেতু ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবারকে বাদশাহ দেখা-শোনা করতেন এজন্য পিতাও শত্রুতায় প্রভাবিত হয়ে নিজ কলিজার টুকরা সন্তান থেকে পৃথক হয়ে গেলেন এবং বাদশাহর পক্ষ নিলেন। রাষ্ট্র, নিজের সম্প্রদায়, নিজের পরিবারের বিরোধিতা ও শত্রুতে পরিণত হওয়ায় ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) নিজ প্রিয় মাতৃভূমি থেকে হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে শৈশব কাটিয়েছেন সেই মাটিই আজ তাকে গ্রহণ করছে না। এত প্রশস্থ যমীন হওয়া সত্ত্বেও সকলস্থান তার জন্য সংকীর্ণ করে দেয়া হল। শেষ পর্যন্ত তিনি ইরাক থেকে হিজরত করে

হাররান ও শাম হয়ে মিশরে আসলেন যাতে সেখানে তিনি মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন। তার সাথে সারাও ছিল যিনি ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর চাচাত বোন।

ভ্রমণ শেষে মিশরে পৌঁছলে বাদশাহকে জানানো হল যে, অন্য দেশের এক ব্যক্তি এখানে এসেছেন তার সাথে রয়েছেন তার এক সুন্দরী স্ত্রী। বাদশাহ হযরত সারাহকে ডেকে পাঠালেন। আর বাদশাহ খারাপ উদ্দেশ্যে সারাহর দিকে হাত বাড়ালে আল্লাহ তায়ালা সামনে বাড়তে বাধা দেন। সারাহর দিকে বাদশাহ তিন-চার বার অগ্রসর হয়েও প্রত্যেকবার প্রথম থেকে বেশী বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সুতরাং সে খুব ভীত হল এবং সারাহর সাথে কেরামতী শক্তি অনুমান করতে পারল। সে তার দরবারের লোকদেরকে বললঃ

«مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانَةً، أَرْجِعُوهَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَأَعْطُوهَا هَاجِرًا»

“তোমরা আমার কাছে এক জ্বিন শয়তান পাঠিয়েছ। তাকে ইব্রাহীমের কাছে ফিরিয়ে দাও এবং হাজেরাকে তার খেদমতের জন্য দিয়ে দাও।”

সারা হাজেরার সাথে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর কাছে ফিরে এসে সব ঘটনা বর্ণনা করলেন।

এই সেই হাজেরা যিনি ফিলিস্তীনে এসে ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর স্ত্রীর অন্তর্ভুক্ত হলেন এবং যার গর্ভে আল্লাহ তায়ালা ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-কে দান করলেন। ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) যখন বিশ্ব-জগতে ভূমিষ্ট হলেন তখন ২০৭৪ খ্রিস্টপূর্ব। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) অনেক প্রার্থনার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে দয়া করেছিলেন। তখনও ইসমাইল (আলাইহিস সালাম) মায়ের দুধের শিশুই

ছিলেন এমন সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তার আকাঙ্ক্ষিত কলিজার টুকরা এবং প্রিয় জীবন সঙ্গীনিকে মক্কার মরু প্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেন।

ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) নিজের অন্তরঙ্গ ও সান্তনা দাতা পবিত্র স্ত্রী, লজ্জা শরম যার ভূষণ কৃতজ্ঞতা ও ফরমাবরদারি যার উড়না এবং মাসুম মায়ের দুধপায়ু শিশু যা অনেক প্রার্থনা এবং আল্লাহর নিকটে অনেক কাকুতি-মিনতির পর ভাগ্যে জুটেছিল আজ তিনি তাদের নিয়ে আল্লাহর নির্দেশে এই ঐতিহাসিক ভ্রমণে বের হলেন। চলতে চলতে এমন এক স্থানে পৌঁছলেন যেখানে কাঁটাদার আগাছায় ঘেরা ছিল। মরুপ্রান্তর যেখানে পানির কোন অস্তিত্ব নেই। সেখানে তিনি নিজের জীবন-সঙ্গীনিকে এবং প্রাণপ্রিয় সন্তানকে আজকের জমজমের স্থানে এক গাছের নীচে বসে আরাম করতে বলেই প্রস্থান করতে লাগলেন। তখন সেখানে না কোন বসবাসের লোক আছে আর না পানির কোন চিহ্ন আছে। আর না সেখানে জীবন অতিবাহিত করার কোন উপকরণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, তবে পাশের এলাকায় জুরহম গোত্র বসবাস করত যাদের সাথে পরবর্তীতে ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) নিজ জীবন সঙ্গীনি এবং কলিজার টুকরা প্রাণপ্রিয় সন্তানের জন্য এক থলে খেজুর এবং এক মশকে অল্প পানি রেখে বিদায়ী সালাম জানিয়ে ফিরে যেতে লাগলেন। তৎমুহূর্তে ধৈর্যের পাহাড় ধৈর্যশীল স্ত্রী আঁচল ধরে বললেনঃ

«أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ بِهِ أَنْيْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟!»

“আপনি আমাদেরকে রেখে কোথায় চলে যাচ্ছেন? অথচ আমাদের এমন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছেন যেখানে না কোন মানুষ আছে? আর না প্রাণ বাঁচার কোন উপাদান রয়েছে?”

কিন্তু ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) স্ত্রীর কথার কোন উত্তর দিলেন না। এমনকি তাকিয়েও দেখেননি। শুনেও না শুনার ভান করে চলতে লাগলেন।

এরই মধ্যে হাজেরা উচ্চ কণ্ঠে বললেনঃ এই জন-মানবহীন, পানিবিহীন, শুষ্ক উপত্যকায় আপনি আমাদের কার আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছেন? হঠাৎ তিনি ভাবলেন হয়ত এটাই মহান প্রভুর নির্দেশ। সুতরাং জিজ্ঞেস করলেনঃ

«اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟»

“আল্লাহ তায়াল্লা কি আপনাকে এই নির্দেশ দিয়েছেন?”

ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ইঙ্গিত করলেন, হ্যাঁ! এটা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ।

উত্তর শুনে হাজেরা ধীর গতি ও প্রশান্তিমূলক কণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ

«إِذَا لَا يُضِيعُنَا»

“তবে তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না।”

ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) চলতে চলতে যখন ‘সানিয়া’ নামক টিলার কাছে পৌঁছলেন যা সে সময় শুবাইকা নামক স্থানে অবস্থিত এবং তিনি আশ্বস্ত হলেন যে, এখন হাজেরা তার দৃষ্টির আড়ালে আছেন, এবার তিনি আল্লাহর ঘরের দিকে মুখ করে অতিবিনয়ে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে এই প্রার্থনা করলেনঃ

﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْنِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾

অর্থঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্যে যে, তারা যেন নামায কায়েম করে; সুতরাং আপনি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের রুযীর ব্যবস্থা করুন; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।” (সূরা ইব্রাহীমঃ ৩৭)

এবার ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তায়ালায় নির্দেশ পালনের পর সন্তুষ্ট হয়ে মক্কা থেকে নিজ বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছেন। ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) খেজুর পানি যা তাদের কাছে রেখে এসেছিলেন অল্প সময়ে শেষ হয়ে গেল। এখন কত সময় পার হলো পেটের ক্ষুধার আগুন নিভানোর জন্য না খেজুর ছিল এবং তৃষ্ণা মেটানোর জন্য না এক ঢোক পানি ছিল। হাজেরা নিজের ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে পড়লেন অন্যদিকে মাসুম শিশুর সুন্দর প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত চেহারাটা মলীন হয়ে গেছে। কেননা মায়ের দুধের উৎস পানি না থাকায় মায়ের বুকে দুধও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শিশুটিও চীৎকার করে কাঁদতে লাগল।

এমন মুহূর্তে এক মায়ের কি অবস্থ হতে পারে এর অনুমান কোন পুরুষ নয় বরং এক দয়াশীল মা'ই করতে পারে। হাজেরার-এর মমতাময়ী নয়ন নিজের কলিজার টুকরার এই অবস্থায় কতক্ষণ সহিতে পারত। কাছেই অবস্থিত সাফা পাহাড়ের উপরে উঠে অনুসন্ধিৎসু নয়নে চারদিকে দৃষ্টি দিয়ে দৌড়াতে লাগলেন যে, হয়ত কোন পথহারা মানুষ অথবা যাতে কোথাও সামান্য পানি দেখতে পাওয়া যাবে যেন তিনি নিজের নিজ প্রাণপ্রিয় সন্তানের তৃষ্ণা মেটাবেন; কিন্তু নিরাশ হওয়া ছাড়া কোন কিছুই পেলেন না। সাফা পাহাড় থেকে নেমে দ্রুত উপত্যকা অতিক্রম করে মারওয়া পাহাড়ে উঠে গেলেন, এখানেও তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। সুতরাং দ্বিতীয়বার সাফার দিকে চললেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝে সামান্য নীচু স্থান ছিল যা তিনি দৌড়ে অতিক্রম করলেন।

এভাবে সাফা ও মারওয়ায় সাতবার যাতায়াত করলেন এবং প্রত্যেক চক্রে নিজের কলিজার টুকরাকেও দেখে যেতেন। শিশুর সংকটাপন্ন অবস্থা দেখে তিনি আরো বেশী দুঃশ্চিন্তায় পড়তেন।

হাজেরার এরূপ কর্ম আল্লাহ তায়ালায় কাছে এত অধিক প্রিয় হয়ে গেল যে, কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত হাজীগণের জন্য সাফা-মারওয়ার মাঝে চক্কর দেয়া উমরা ও হজ্জের রুকন হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা এক নবীর

স্ত্রী ও অন্য এক নবীর মায়ের স্মৃতি বহন করে। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

«فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا»

হাজেরার এরূপ সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো, লোকদের উপরও উভয়ের মাঝে দৌড়ানো ওয়াজিব করা হল।

সপ্তমবার যখন হাজেরা চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আর এবার তিনি এক শব্দ শুনতে পেলেন, তিনি শব্দের দিকে খুব নিবিড়ভাবে দৃষ্টি দিলেন, তিনি দ্বিতীয়বার আওয়াজ শুনতে পেলেন, তিনি আওয়াজের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং বললেনঃ

«قَدْ أَسْمَعْتُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ»

“তোমার শব্দ আমি শুনতে পেয়েছি, যদি তুমি আমার সাহায্য করতে পার তবে কর।”

হঠাৎ তার দৃষ্টি সামনে পড়তেই তিনি দেখতে পেলেন এক ফেরেশতা তার প্রাণপ্রিয় শিশুর কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) ছিলেন। তিনি তার পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন, অন্য আরেক বর্ণনায় আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করলেন অথবা পা দিয়ে আঘাত করলেন, আল্লাহর কুদরতে পানির ঝর্ণা বইতে লাগল। হাজেরা নিজের পানির পাত্রে (মশকে) পানি ভরতে লাগলেন, পানি অনবরত বইতেছিল। নিজেও পান করলেন নিজের শিশুকেও পান করালেন। যখন পানির পাত্র (মশক) ভরে গেল তখন ভাবলেন এই পানি এদিক ওদিক প্রবাহিত হলে শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি চারদিক বাধ দিতে লাগলেন এবং নিজ ভাষায় বললেনঃ (যমযম) যার অর্থ হলো থাম থাম! এভাবে এই পানির নাম আজ পর্যন্ত যমযম আখ্যায়িত হয়ে আসছে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ

تَغْرِفُ مِنْ زَمْزَمَ - لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا»

“আল্লাহ তায়ালা ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর মায়ের উপর রহম করুন! যদি তিনি যমযমের পানি এভাবেই ছেড়ে দিতেন এবং বাধ না দিতেন তবে যমযম এক প্রবাহিত খালের রূপ ধারণ করত।”¹

1. এ ঘটনা বুখারীঃ ৩৩৬৪, আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ, আল-বেদায়া ওয়ান-নেহায়া ইত্যাদি কিতাব থেকে সংকলন হয়েছে।

আমার কোন দুঃখ নেই

ইসলামের ইতিহাসে যে সব বিখ্যাত ও বীরত্বের অধিকারী বীরঙ্গনা রমনীদের বর্ণনা আসে তাদের মধ্যে যারকা বিনতে আদী বিন গালিব বিন কাইস হামদানিয়ার বর্ণনাও আসে। তিনি কূফার আধিবাসী ছিলেন এবং হযরত আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। নিজের আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে সিফফীন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি বাকপটু ও ভাষার অলংকারিত্বের বন্যা বইয়ে দেন, যার ফলে সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে বহু উৎসাহিত ও উদ্দীপনায় লড়াই করতে থাকে। তার উদ্ধৃতিতে এই বিষয়ে ইতিহাস এক হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষামূলক ঘটনা সংরক্ষণ করেছে।

আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ৪১ হিজরীতে খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। মুসলমানদের মাঝে চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কখনো কখনো যুদ্ধের বিষয়ে কোন কোন অধিবেশনে আলোচনা হতো। এক রাতে আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কিছু সাথীদের নিয়ে মিটিংয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ একজন সিফফীন যুদ্ধের আলোচনা শুরু করল। কূফাবাসীদের বীরত্বের আলোচনায় যারকার নামও চলে আসল। একজন বললেন যে, সেদিন এই মহিলা খুব জোরে-শোরে বক্তব্য রেখেছিলেন। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথীদের উৎসাহ দেয়। তাদের দৃঢ়তা ও স্থিরতাকে টিকিয়ে রাখতে এবং পরিপূর্ণ আবেগ দিয়ে সৈন্যবাহিনীর সামনে এমনভাবে বক্তব্য রাখে যে, ভীৰু থেকে ভীৰুও যদি শুনে যুদ্ধের মাঠে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে। সুতরাং তার উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভাষণে এমন সব লোক যুদ্ধে আবার ফিরে এসেছে যারা যুদ্ধ থেকে ফিরে চলে যাচ্ছিল।

আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মন্ত্রী-সভার আলোচনা শুনছিলেন আর ভাবছিলেন। এতো এক মহৎ নারী! এটা ঠিক যে বিরোধী শক্তি পক্ষের নারী; কিন্তু এত বড় বীরত্বের অধিকারিনী। এসব বিষয়ে আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রভাবিত হলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেনঃ সেই মহিলার বক্তব্যের বিশেষ কিছু কি তোমাদের মনে আছে?

অনেকেই উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ অবশ্যই।

তার মর্মস্পর্শী বক্তব্য ভুলার মত নয়। কম-বেশী সবার স্মৃতিতেই আছে। আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবার তাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ

«فَمَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ فِيهَا؟»

“এই মহিলার সম্পর্কে তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দিচ্ছ?”

অনেকেই এই মহিলাকে হত্যার পরামর্শ দিলেন; কিন্তু আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যিনি আরবের বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন তিনি তাদের বললেনঃ

«بُئْسَ مَا أَشَرْتُمْ بِهِ وَقُبْحًا لِمَا قُلْتُمْ! أَيَحْسُنُ أَنْ يَشْتَهَرَ عَنِّي أَنِّي بَعْدَ مَا ظَفِرْتُ وَقَدَرْتُ قَتَلْتُ امْرَأَةً وَفَتٍ لِمَصَاحِبِهَا، إِنِّي إِذْنٌ لِلَّيْمِ، لَا وَاللَّهِ! لَا فَعَلْتُ ذَلِكَ أَبَدًا»

“তোমরা আমাকে যা কিছু পরামর্শ দিচ্ছ ও বলছ তা খুবই খারাপ ও নিকৃষ্ট। এটা কি আমার জন্য কল্যাণকর হবে যে, আমি প্রশাসন ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে এমন এক নারীকে হত্যা করেছি যে নিজের সাথীর (আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু) হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে? আল্লাহর শপথ! আমি এরূপ কখনও করতে পারব না কেননা এমন অবস্থায় নীচ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রমাণ হবে।”

এরপর আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কূফার গভর্ণরের কাছে এক পত্র লিখে পাঠালেন যার ভাষা ছিল এইঃ

«أَنْ أُنْفِذُ إِلَيَّ الزَّرَقَاءَ بِنْتَ عَدِيٍّ مَعَ نَفَرٍ مِنْ عَشِيرَتِهَا وَفُرْسَانٍ مِنْ قَوْمِهَا، وَمَهْدٌ لَهَا وَطَاءٌ لَيْنًا وَمَرْكَبًا ذُلُولًا»

“যারকা বিনতে আদীকে, তার বংশের কিছু লোককে ও তার গোত্রের কিছু দক্ষ অশ্বারোহীর সাথে আমার দরবারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিন। তার

(যারকার) জন্যে নরম গদী এবং আরামদায়ক অনুকূল সওয়ারীর ব্যবস্থা করুন।”

কূফার গভর্ণর যখন যারকা বিনতে আদীকে আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর চিঠি সম্পর্কে জানালেন তখন তিনি নির্দেশ বাস্তবায়নে তাড়াতাড়ি করলেন এবং বললেন, আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশ মান্য করে চলা ওয়াজিব। আমি অমান্য করতে পারি না।

সুতরাং আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)র নির্দেশানুযায়ী কূফার গভর্ণর যারকাকে খলীফার দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করালেন। যখন যারকা আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দরবারে পৌঁছলেন তিনি তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ

“খালাম্মা! কেমন আছেন? আপনার সফর কেমন ছিল? কোন কষ্ট হয়নিতো?”

যারকা বিনতে আদী উত্তরে বললেনঃ

«رَبِيبَةَ بَيْتٍ أَوْ طِفْلًا مُّمَهَّدًا»

অর্থাৎ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালই আছি। আমাকে গৃহকর্ত্রীর মত সম্মানে এখানে পৌঁছানো হয়েছে অথবা কোলের শিশুর মত নিরাপদে আপনার দরবারে হাজির করা হয়েছে।

আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ বস্তুতঃ আমি এভাবে আপনাকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলাম। আপনি কি জানেন আমি আপনাকে এখানে আসার নির্দেশ কেন দিয়েছি?

যারকা বিনতে আদী বললেনঃ

«وَأَنْتَ لِي بِعِلْمٍ مَا لَمْ أَعْلَمْ؟! لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى»

অর্থঃ “অজানা বিষয় আমি কি করে জানতে পারব? অদৃশ্যের খবর তো কেবল আল্লাহ তায়ালাই জানেন।”

আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ সিফফীনের যুদ্ধে তুমি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথীদেরকে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোমার ক্ষুরধার বক্তব্যের মাধ্যমে উৎসাহিত করেছিলে। আর তুমিই সেই নারী যার যাদুময়ী বক্তব্যের মাধ্যমে উৎসাহিত হয়ে ভীরা ব্যক্তিগণও না জানি সাহস ও বীরত্বে অন্ধ হয়ে আমার বিরুদ্ধে ঝড়ের বেগে তরবারী চালিয়েছে। তুমি এমনও বলেছো যে, সূর্যের উজ্জ্বলতায় আলোতে প্রদীপের আলোর কোন মূল্য নেই। আর চাঁদের মোকাবেলা তারকা করতে পারে না। সুতরাং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ কর। ধৈর্য ও দৃঢ়তার আঁচল হাত থেকে ছেড়ে দিও না। এতেই তোমাদের শির উঁচু হবে। বাঁচ তো উত্তমরূপে আর মৃত্যুবরণ করতো উত্তমরূপে এবং জেনে রেখ!

«إِنَّ خِصَابَ النِّسَاءِ الْحِثَاءِ وَخِصَابَ الرِّجَالِ الدِّمَاءُ»

“যে, নারীর সাজ-সজ্জার উপাদান মেহেদী আর পুরুষের হল রক্ত আর রক্ত!!”

এরপর আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেনঃ

যারকা! আমি যা তোমার বিষয়ে বলছি তা কি সত্য নয়? যারকা বিনতে আদী হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলেন।

আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«لَقَدْ شَارَكْتَ عَلِيًّا فِي كُلِّ دَمٍ سَفَكَهُ»

“অবশ্যই তুমি প্রত্যেক সেই প্রবাহিত রক্তে অংশগ্রহণ করেছো যা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) করেছেন।”

যারকা বিনতে আদী উত্তর দিলেনঃ আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তায়ালা আপনার কথাগুলো গ্রহণ করে নিক কেননা এটা আমার জন্যে সুসংবাদ

থেকে কম নয়। নিশ্চয় আমি আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে ছিলাম এবং তার পক্ষ থেকে প্রত্যেক প্রবাহিত রক্তে আমার অংশগ্রহণ আমার জন্য গৌরবের বিষয়। আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, আপনি আমাকে এই সুসংবাদ দিয়েছেন।

আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এই মহিলার সাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে হেসে উঠলেন আর বললেনঃ

«وَاللَّهِ لَوْ فَأَوْكُم بَعْدَ مَوْتِهِ أَعْجَبُ عِنْدِي مِنْ حُبِّكُمْ لَهُ فِي حَيَاتِهِ»

“আল্লাহর কসম! আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুর পর তোমরা তার যেই হিতাকাঙ্ক্ষীতার প্রমাণ দিচ্ছ এটা আমার কাছে বেশী আশ্চর্য মনে হচ্ছে তার জীবিতাবস্থায় ভালবাসার চেয়ে।”

এরপর আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেনঃ “তোমার কোন প্রয়োজন থাকলে বল আমি তা পূরণ করতে প্রস্তুত।”

যারকা বিনতে আদী বললেনঃ

«يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا أَعَنْتُ عَلَيْهِ أَبَدًا»

“হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কসম করেছি যে, আমি যুদ্ধ প্রাপ্তরে যার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছি তার দরবারে হাত বাড়াবো না।”

আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ “আমাকে কিছু লোক তোমাকে হত্যার পরামর্শ দিয়েছিল।”

যারকা বললেনঃ “পরামর্শদাতারা সংকীর্ণ মনের অধিকারী। আপনি যদি তাদের কথামত আমাকে হত্যা করেন তবে আপনিও তাদের মধ্যে গণ্য হবেন।”

সুতরাং আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রশস্ত হৃদয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। আর বিদায়ের সাথে তাকে দিরহাম ও দীনারও দিলেন। এর সাথে তাকে একটি জায়গীরের ব্যবস্থা করলেন যার আয় বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম। আর তাকে তার বংশের লোকদের সাথে নিরাপদে কূফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে দিলেন। কূফার গভর্ণরকে পত্রও লিখলেন যে, এই মহিলা এবং বংশের লোকদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে।^১

১. দেখুনঃ কাসাসুল আরব-২৩৭, আল আকদুল ফরীদ-১০৬/২, বালাগাতুন নিসা-৩৭)

হে বৎস! সত্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ কর

মানুষ নিজের জীবনের একটি লক্ষ্য বস্তু নির্ধারিত করে তা অর্জনে জীবন বাজী রেখে সচেষ্ট থাকে। আর বিশেষ করে যখন নিশ্চিতভাবে সে জানতে পারে যে, সে যে লক্ষ্য বস্তু অর্জনে সচেষ্ট তা সঠিক পদক্ষেপ এর বিপরীত যা আছে তা সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্নকারী তবে সে নিজের জীবনের উপর ঝুঁকির কোন তোয়াক্কা করে না। যদিও তার পথে পাহাড়তুল্য বাঁধা আসে সে এই বাঁধা অতিক্রম করতে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা করে। এরূপ দৃঢ়তা ও অটলতা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ভেতরেও ছিল। তিনি যে বিষয়টিকে সত্য বলে জেনেছেন তার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়েছেন। তার ভেতরের এই আবেগ ও এই গুণের উপর প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন তার মা আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)।

৬৯২ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সেনাবাহিনী খেলাফতের দাবীদার আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে হরমে মক্কায় বন্দি করে রেখেছিল। যখন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) দেখলেন যে, কালচক্রে অধিকাংশ লোকজন তার বিরোধী হয়ে গেছে আর তাদের কাছে তার কোন মূল্য নেই। সুতরাং তিনি খুব ব্যথিত হলেন এবং তিনি নিজের মা আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর দরবারে হাজির হলেন এবং বললেনঃ আম্মাজান! আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে, আমাকে অধিকাংশ লোক অবহেলা করছে। আর আমার স্ত্রী-সন্তানরাও আমার মিশনের বিরুদ্ধে চলে গেছে। তাদের কাছেও আমার কোন মূল্য নেই। এখন গুটি কতক ব্যক্তিই আমার কাছে রয়ে গেছেন। তারাও এত দুর্বল যে, শত্রু পক্ষের মোকাবেলায় কিছু সময়ের জন্যও টিকতে পারবে না। আজ যদি আমি আমার মিশন থেকে সরে দাঁড়াই তবে আমাকে সমাজের সকলেই আপন করে নিবেন।

দুনিয়ার প্রচুর ধন-সম্পদ আমার কাছে আসবে। আর আমার জীবনের শত্রুও আমার নিকটতম বন্ধুতে পরিণত হবে।

অতএব এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত? আম্মাজান! এ মুহুর্তে আমি জীবন-মৃত্যুর মাঝে শ্বাস নিচ্ছি। আমার সামনে চলার জন্য আপনার পরামর্শ প্রয়োজন।

আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রিয় সন্তানের দুঃখজনক কথা শুনে বললেনঃ

হে আমার প্রিয় সন্তান! তুমি নিজের বিষয়ে যা জান তা অন্য কেউ জানতে পারে না। যদি তুমি তোমার নিজের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস থাকে যে, তুমি যে বিষয়ের প্রতি মানুষকে আহ্বান করছ তা সত্য ও সঠিক আর তোমার বিপরীতে যারা অবস্থান নিচ্ছে তারা অসত্যের উপর আছে তবে তুমি তোমার মিশন থেকে ফিরে এসো না এবং সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাক। ভীৰুতার পরিচয় দিও না আর তোমার গরদানকে এত ঢিলা করো না যে তোমার মাথা নিয়ে বনু উমাইয়্যার সন্তানেরা খেলা করে। আর যদি তুমি যে সব করছ তা পার্থিব সম্পদের লোভে হয়ে থাকে তবে তুমি একজন নিকৃষ্ট ব্যক্তি। তুমি নিজেকে এবং নিজের সাথীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছ আর তোমার সাথী যারা নিহত হয়েছে তাদের নিহত হওয়ার দায়-দায়িত্ব একমাত্র তোমার। আর যদি তোমার মতাদর্শ এই হয় যে, তুমি সত্যের উপর ছিলে; কিন্তু যখন তোমার সহযোগিরা দুর্বল হয়ে পড়েছে তখন তুমিও সাহস হারিয়ে মাথা নত করলে তাহলে এটা স্বাধীন ব্যক্তির পরিচয় নয় আর না দীনদার ব্যক্তির গুণ। শেষ পর্যন্ত তোমার জীবন এই দুনিয়ার জন্য কতটুকুই বা বাকী আছে। অপমানের সাথে বেঁচে থাকার চেয়ে উত্তম হল সম্মানের সাথে শহীদ হয়ে যাওয়া।

«وَاللّٰهُ لَضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عِزٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ فِي ذُلٍّ»

“আল্লাহর কসম! তরবারীর এক আঘাত অপমান লাঞ্ছনার অবস্থায় চাবুকের আঘাত থেকে আমার কাছে উত্তম।”

মায়ের এই ঈমান-দীপ্ত বক্তব্য শুনে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বললেনঃ

«إِنِّي أَخَافُ أَنْ قَتُلُونِي أَنْ يُمَثِّلُوا بِي»

আমি আশঙ্কা করছি যে, আমার শত্রুরা যদি আমাকে মেরে ফেলে তবে আমার অঙ্গসমূহকে বিকৃত করবে।

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ

«يَا بُنَيَّ! إِنَّ الشَّأَةَ لَا يَضُرُّهَا سَلْخُهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا»

“হে বৎস! ছাগলকে যবাই করার পর এর চামড়া উঠানো এর জন্য কোন কষ্টের কারণ হয় না (এজন্য তোমাকে হত্যার পর তোমার অঙ্গ-বিচ্ছেদ করলে তোমার কোন কষ্ট হবে না।”

একথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সামনে অগ্রসর হয়ে মায়ের মাথা চুম্বন করলেন এবং বললেনঃ “আল্লাহর কসম! এটা আমারও অভিমত যেই মিশনের আহ্বান আমি করছি তার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি সর্বদাই সচেষ্ট থাকব। আমি দুনিয়ার দিকে কোন সময় লোভ-লালসার দৃষ্টিতে তাকাইনি। আর না আমার ভেতরে দুনিয়ার লোভ-লালসার কোন সম্ভাবনা আছে।”

«وَمَا دَعَانِي إِلَى الْخُرُوجِ إِلَّا الْغَضَبُ أَنْ اللَّهَ تُسْتَحَلُّ حُرْمُهُ»

“আমি বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে লিপ্ত আছি তা একমাত্র ইসলামের খাতিরে। কেননা তাদের এই যামানায় আল্লাহ তায়ালার নিষেধকৃত বিষয়গুলোকে হালাল করা হয়েছে।”

এরপর তিনি বললেনঃ আম্মাজান! আমি আমার মিশন সম্পর্কে আপনার অভিমত নিয়ে নেয়া উচিত মনে করি। আলহামদুলিল্লাহ আপনার ঈমান-দীপ্ত কথাগুলো শুনে আমার দূরদর্শিতা আরো বৃদ্ধি পেল।

আম্মাজান! আজকেই আমাকে হত্যা করা হবে। আমার নিহত হওয়ায় আপনি চিন্তিত হবেন না। আর নিজের সকল কিছুই আল্লাহর ওয়াস্তে করে দিবেন কেননা আপনার এই সন্তান কখনো নাযায়েজ কাজের সংকল্পও করেনি। আমি আল্লাহর রাজত্বে কখনো অন্যায় অত্যাচার করিনি। কাউকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার দিয়ে ভঙ্গ করিনি। কখনো কোন মুসলিম ও অমুসলিমের উপর অত্যাচার করিনি। আমার শ্রমিকদের মধ্য থেকে কারো উপর যখনই অন্যায় অত্যাচারের অভিযোগ পেয়েছি আমি মজলুমের পার্শ্বে দাঁড়িয়েছি এবং তার আধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। আমি কখনো আল্লাহর রেজামন্দির উপর নিজের চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দেইনি; বরং সর্বদাই আল্লাহর খুশিকেই প্রাধান্য দিয়েছি।

«اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا تَرْكِیَّةً مِنِّي لِنَفْسِي - أَنْتَ أَعْلَمُ بِي - وَلَكِنْ أَقُولُهُ تَعْزِیَّةً لَأُمِّي لِتَسْلُو عَنِّي»

“হে আল্লাহ! এসব কথা আমি আমার আত্মশুদ্ধির জন্য বলছি না। আমি যা বলছি তা তুমি ভাল করেই জান; বরং আমি এসবকিছু নিজের মাকে সান্তনা দেয়ার জন্য বলছি যাতে তিনি আমার ভবিষ্যত দুঃখ-দুর্দশাকে ভুলে যান।”

এই দুঃখজনক কথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মা বললেনঃ

«إِنِّي لَأَرْجُو مِنَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ عَزَائِي فِيكَ حَسَنًا إِنْ تَقَدَّمَ مِنِّي وَإِنْ تَقَدَّمَكَ فَفِي نَفْسِي حَرْجٌ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَّا مَ يَصِيرُ أَمْرُكَ»

“আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে আশা করি যে, যদি তুমি আমার আগে আল্লাহর কাছে চলে যাও তবে তোমার জন্য আমার দুঃখিত হওয়া ভালই

হবে। আর যদি আমি তোমার আগে মৃত্যুবরণ করি তবে আমার হৃদয়ে এই উৎকণ্ঠা সর্বদাই বিরাজ করবে যে, আমি তোমার মিশনের চূড়ান্ত ফলাফল দেখতে পারিনি।”

এরপর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজের মায়ের কাছে দু’আ চাইলেন এবং বিদায় নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং সেদিনই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং তার সাথীরা তাকে হত্যা করল।^১

1. দেখুনঃ তারিখে তাবারী-১৮৮/৬, বালাগাতুন নিসা- ১৩০, আল আকদুল ফরীদ- ৪১৭/৪, কাসাসুল আরব- ১৩২/২)

খলীফাকে বৃদ্ধার উপযুক্ত জবাব

একবার আব্বাসী বংশের খলীফা মাহদী (৭৭৫-৮৫ খ্রিঃ) কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক বৃদ্ধা বেদুঈন মহিলার সাথে সাক্ষাত হল।

খলীফা জিজ্ঞেস করলেনঃ বৃদ্ধা মা! তোমার সম্পর্ক কোন বংশের সাথে? বৃদ্ধা তাৎক্ষণিক উত্তর দিলেন, তাঈ গোত্রের।

খলীফা মাহদী বললেনঃ

«مَا مَنَعَ طَيْئًا أَنْ يَكُونَ فِيكُمْ آخَرُ مِثْلَ حَاتِمٍ»

“তাঈ গোত্রে কি এমন বাধা যে, দ্বিতীয় আরেকজন হাতেম তাঈ কেন তৈরী হচ্ছে না।”

বৃদ্ধা সাথে সাথে উত্তর দিলেনঃ

«الَّذِي مَنَعَ الْمُلُوكَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مِثْلَكَ»

“এই বাধা সেরূপ যা বাদশাহদের জন্য এসেছে যে, তোমার মত কেউ হল না।”

খলীফা মাহদীর কাছে বৃদ্ধার উত্তর খুবই ভাল লাগল, পছন্দ হল এবং তিনি তাকে সম্মান ও পুরস্কৃত করার নির্দেশ দিলেন।

আল্লাহর কসম আমার বোনের দাঁত ভাঙবে না

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র যুগে দুই মহিলার মধ্যে ঝগড়া হয়। তাদের মধ্যে একজন আনাস বিন নাজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বোন রুবাই বিনতে নাজর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ছিলেন যিনি অন্য জনের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। যখন এই বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট পেশ করা হল তিনি বললেনঃ

«الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ»

“আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী দাঁতের বদলে দাঁত ভাঙা হবে।”

আনাস বিন নাজর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এক সাহাবী ছিলেন যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি বিধায় পরবর্তীতে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে দরখাস্ত করলেনঃ

«وَاللّٰهُ! لَئِنْ أَشْهَدَنِيَّ اللّٰهُ قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ اللّٰهُ مَا أَصْنَعُ»

“আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের সুযোগ দেন আল্লাহ তায়ালা দেখবেন আমি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখি।”

সুতরাং তিনি উল্লেখ যুদ্ধে কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করে শহীদ হন। শাহাদাতের পর দেখা গেল যে, তার শরীরে তরবারী, খঞ্জর ও তীরের আশিটি (৮০) যখম ছিল। আর কাফেররা এমনভাবে নাক-কান কর্তন করেছিল যে, তার বোন রুবাই বিনতে নাজর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে চিনতে পারেন নি; বরং অনেক চেষ্টায় তার আঙ্গুলের গিরার মাধ্যমে চিনতে পারেন।

মোটকথা হল যে, এই সাহাবীই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চান যে, আমার বোনের দাঁত ভেঙ্গে দেয়া হোক?”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«نَعَمْ، كِتَابُ اللَّهِ»

“হ্যাঁ! আল্লাহর কিতাবের এটাই ফয়সালা।”

আনাস বিন নাজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ “আল্লাহর কসম! আমার বোনের দাঁত ভাঙ্গা হবে না।” মূলতঃ এই শপথ কেমন ছিল?

আনাস বিন নাজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাহলে কি শরীয়তের নির্দেশের উপর অভিযোগ করেছেন? তিনি কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিচার গ্রহণ করেন নি?

কখনো এমনটি নয়; বরং তিনি এই শপথ এজন্য করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর কাছে এই আশা করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তার কসমকে অযথা যেতে দিবেন না; বরং অবশ্যই তিনি দ্বিতীয় কোন বিকল্প ব্যবস্থা করে দিবেন। তিনি মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছিলেন।

সুতরাং যখন আনাস বিন নাজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর কসম করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেনঃ “সেই আহত মহিলার বাড়ী যাও। যদি সে জরিমানায় রাযী হয়ে যায় তাহলে কোন সমস্যা নেই।”

লোকজন নিয়ে তিনি সেই আহত মহিলার বাড়ী গেলেন। তারা জরিমানায় রাযী হয়ে গেলেন। অথচ এর আগে তারা রাযী ছিলেন না তারা দাঁতের বদলায় দাঁত ভাঙতে চেয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা মুচকি হাসির আভা ছেয়ে গিয়েছিল এবং তিনি আনাস বিন নাজর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ছেঁড়া জামা এবং তার পাতলা শরীরের দিকে তাকালেন এরপর বললেনঃ

«إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ»

“নিশ্চয়ই আল্লাহর কিছু বান্দা এমনও আছে যে, যদি তারা আল্লাহর উপর (ভরসা করে) কসম করে বসে তবে আল্লাহ তায়ালা তাদের কসম পূর্ণ করে দেন।”

মুসলিম রমণী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার নারীর মধ্যে পার্থক্য

শায়খ আলী তানতাবীর সাক্ষাতকার আরবী দৈনিক খবরের কাগজ (আশ্শারকুল আউসাত্) ২৭ শে মুহাররম ১৪০৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

তিনি বলেন যে, এক অধ্যাপক আমাকে বলেন, তিনি আমেরিকার কোন এক কনফারেন্সে “মুসলিম রমণী” বিষয়ে স্বীয় প্রবন্ধ পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তিনি সম্মেলনের শ্রোতাদের সামনে মুসলিম রমণীদের অর্থনীতির উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, একজন মুসলিম রমণী সে নিজস্ব ফান্ড রাখতে পারে যার উপর তার স্বামীর কোন অধিকার নেই। আর না পিতা তার সম্পদ নিজের আয়ত্বে আনতে পারেন। যদি কোন মহিলার দারিদ্রতা চলে আসে আর দৈনিক প্রয়োজনীয় খরচসমূহের সমস্যা দেখা দেয় তবে এর দায়-দায়িত্ব তার পিতা অথবা তার ভাইয়ের উপর বর্তায়। যদি তার পিতা অথবা ভাই না থাকে তবে তার কোন নিকটাত্মীয় তার দেখা-শোনার দায়িত্ব বহন করবে যে, তার স্বত্বাধিকারী (ওয়ারিশ) হতে পারে। যদিও সে তার চাচাত ভাই হোক না কেন? এই মেয়ের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান তার বিয়ের আগ পর্যন্ত তার আত্মীয়ের উপর ওয়াজিব। এরপর যখন তার বিয়ে হবে তখন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর উপর বর্তাবে। মহিলা যদিও লাখপতি হয় আর স্বামী সাধারণ শ্রমিক তবুও মেয়েটিকে এমন বলা হবে না যে, সে যেন নিজের ভরণ-পোষণ নিজে ব্যবস্থা করে; বরং স্বামীর উপর ওয়াজিব হল যে, পরিশ্রম করে হলেও তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও মুসলিম রমণীদের অনেক অধিকার তাদের জন্য সংরক্ষিত যা থেকে অন্যান্য জাতির নারীরা বঞ্চিত।

এই প্রবন্ধটি শোনামাত্রই এক আমেরিকান নারী যে বিখ্যাত সাহিত্যিক দাঁড়িয়ে বলতে লাগলঃ যদি মুসলিম নারীদের জীবনের নিরাপত্তা তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) কাছে এমনই হয়ে থাকে যেমন তুমি এই মাত্র বর্ণনা দিলে। তবে তোমরা আমাকেও তোমাদের সাথে নিয়ে চল। আমি

তোমাদের সাথে ছয় মাস পর্যন্ত জীবন-যাপন করব, এরপর তোমরা আমাকে হত্যা করে দিও।

আমেরিকার নারীর কথা শুনে অধ্যাপকের খুবই আশ্চর্য মনে হল। সুতরাং মহিলাকে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। আমেরিকান নারী নিজের ও তার অন্যান্য আমেরিকান নারীদের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে অধ্যাপকের কথার উত্তরে বলেনঃ

যখন আমেরিকার নারীরা নারী স্বাধীনতার শ্লোগান দিতে বের হয় তখন বাস্তবে তারা বন্দী থাকে। নিজেদেরকে সম্মান ও মর্যাদার ধারক-বাহক মনে করে; কিন্তু বস্তুতঃ অপমান ও লাঞ্ছনা বঞ্ছনার গভীর গর্তে পতিত হয় যার উপলব্ধি তারা উপযুক্ত সময়ে করতে পারে না। পুরুষরা বা নারীদের দ্বারা সর্বনিম্ন স্তরের কাজের জন্য ব্যবহার করে আর তাকে প্রকাশ্যে খুব সম্মান ও ভালবাসা দেখিয়ে উৎসাহিতও করে দাবার গুটির মত থাকে; কিন্তু যখন কোন বড় ধরনের বিষয় আসে তো নারীকে ডালে পড়ে মরা মাছির মত বের করে নিক্ষেপ করে; বরং এমন অবস্থায় নারীর কাছে পরামর্শ নেয়াটাও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে।

হ্যাঁ তবে গাড়ী থেকে নামার সময় নারীর মোলায়েম হাত বড়ই যত্নের সাথে ধরে নেয় যাতে তার কোন কষ্ট না হয় এবং সে সহজে নেমে যেতে পারে। আর ভ্রমণ ও সাক্ষাতের বেলায় নারীকে সামনে যেতে দেয়া হয়। কখনো দেখা যায় রেল গাড়ী অথবা বাসে আসন থেকে উঠে দাঁড়ানো মহিলাকে বসতে দেয় অথবা তার জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয়া হয়; কিন্তু এর পেছনে যা করা হয় তা খুবই ঘৃণিত ও তার মর্যাদা হানিকর।

আমাদের সমাজে যখনই মেয়ে যৌবনে পা রাখে তখন থেকে তার পিতার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত। পিতা তার স্নেহের-মমতার হাত গুটিয়ে নেয়। নিজের যুবতী মেয়ের জন্য তার দরজা বন্ধ করে দেয় এবং তাকে বলেঃ যেখানে যাওয়ার যাও। তোমার আয়-রোজগার তুমি নিজে কর। আজ থেকে আমার উপর তোমার কোন অধিকার বাকী নেই। এখন নিরুপায় একটি যুবতী মেয়ে কোথায় কি করবে? জীবনের জন্য তো কিছু করতেই হবে।

সুতরাং সে বাড়ী থেকে বের হয়ে বাইরে পা রাখে। জীবনের কঠিন সমস্যার পাহাড় একাই অতিক্রম করে। এই দুনিয়ায় মানুষ নামে পশুর আধিক্য রয়েছে। চারদিকে ক্ষুধার্ত বাঘের ভীড়। রক্ত পিপাসু ভাল্লুক তার লোভাতুর জিহ্বা খুলে শিকারের তালাশে রয়েছে। আর তাদের সামনে মোলায়েম শ্রেণীর রূপে যেই তাজা তাজা শিকার রয়েছে সব তাদের লক্ষ্য। আহ! এই হল সেই আমেরিকার নারী যার যৌবনের উপর সবার লোভের দৃষ্টি! তার বাড়ীর পরিবারের সদস্যদের কখনো কোন ভাবনা হয় না যে, ঘর থেকে বের হলে তার সম্মান-মর্যাদা কোন পেশার মাধ্যমে টিকে থাকবে? হাতের পরিশ্রমের কাজ করে না কি পবিত্রতা ও সম্মান বিক্রি করে? কখনো ভুলেও জিজ্ঞেস করে না যে, নিজেরই এই সম্ভান নিজ হাতের পরিশ্রমের আয় দিয়ে চলছে না কি ইজ্জত-সম্মান বিক্রি করে? কোন অফিসে সেক্রেটারীর পদে নিজের শরীরের সৌন্দর্য দেখিয়ে বেতন পাচ্ছে না কোন শো-রুমে মডেলিং করে। আর হ্যাঁ! এই মরণব্যাধি শুধু আমেরিকাতেই নয়; বরং পাশ্চাত্য সভ্যতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে এমন সকল দেশেই রয়েছে।

মেয়ের প্রতি পিতার উপদেশ

খুমা রাওয়াই বিন আহমদ বিন তালুন বিশ বছর বয়সে নিজের পিতার মৃত্যুর পর মিশরের গভর্ণর হন। খলীফা মু'তামিদ আলাল্লাহর শাসনকাল (৯২-৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত বহাল থাকেন। মুতামিদের মৃত্যুর পর মু'তাজিদ বিল্লাহ খেলাফতের পদে অধিষ্ঠিত হন।

খুমা রাওয়াই দ্রুত উপহার উপঢৌকন নিয়ে খলীফার দরবারে উপস্থিত হন। খলীফা তাকে তার পদে বহাল রাখেন। খুমা রাওয়াই খলীফা মুতাজিদ বিল্লাহর সামনে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, খলীফার শাহজাদা মুকতাফি বিল্লাহর বিয়ে তার কন্যার সাথে দিয়ে দেন। সে সময় মুকতাফি বিল্লাহ যুবরাজ।

খুমা রাওয়াইয়ের কন্যা কাতরুন নাদা যার নাম আসমা ছিল, খুবই সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী ছিল যার বুদ্ধির ও সৌন্দর্যের কোন তুলনা হয় না।

খলীফা খুমা রাওয়াইকে বললেনঃ তোমার কন্যা কাতরুন নাদাকে আমি নিজেই বিয়ে করতে প্রস্তুত। খুমা রাওয়াই ২৮১ অথবা ২৮২ হিজরীতে নিজের কন্যার বিয়ে মুতাজিদ বিল্লাহর সাথে দিয়ে দেন। তার দেনমোহর দশ লাখ দিরহাম নির্ধারিত হয়েছিল।

যেহেতু কাতরুন নাদা খুব বেশী সুন্দরী ছিল এজন্য খলীফা তার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রেখেছেন। খলীফা তার জন্য বিশেষভাবে এক ঘর তৈরী করলেন, বিশ্বের সব রকম সাজ-সরঞ্জামাদি দিয়ে সাজালেন। এরপর খলীফা এর ভেতরে তার নববধুকে নিয়ে গেলেন যেন তার ভালবাসা ও প্রশান্তি লাভ করে।

কাতরুন নাদা খলীফার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে নিল আর খলীফা তার রানের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। যখন খলীফা গভীর ঘুমে নিমজ্জিত তখন কাতরুন নাদা তার মাথা বালিশের উপর রেখে রুমের বাইরে শাহী ভবনের উঠানে গিয়ে বসে গেল।

খলীফা যখন চোখ খুললেন তার পাশে স্ত্রীকে না পেয়ে খুবই নারাজ হলেন এবং খুব জোরে আওয়াজ দিলেন।

কাতরুন নাদা কাছেই ছিল সে আশ্তে উত্তর দিল। খলীফা তাকে বলল, তোমার ভালবাসায় আমি এই ভবন তৈরী করলাম এবং আমি আমার অন্য সকল স্ত্রীদের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে বিশেষভাবে তোমার জন্য আমার মন-প্রাণ উৎসর্গ করিনি? এরপরেও তুমি আমাকে রুমে একা রেখে চলে গেছ?

কাতরুন নাদা বললেনঃ আমি রুল মু'মিনীন আপনি আমার জন্য যেসব কিছু করেছেন আমি তা অস্বীকার করিনি আর না তা অবমূল্যায়ন করেছি; বরং আমি আমার পিতার উপদেশ পালন করে এমনটি করেছি। আমার আব্বাজান বলতেনঃ

«لَا تَنَامِي بَيْنَ جُلُوسٍ، وَلَا تَجْلِسْ مَعَ النَّائِمِ»

অর্থঃ “বসা অবস্থায় লোকজনের মাঝে ঘুম যেয়ো না আর কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তার পাশে বসে থেকো না।”

খলীফা তার কথা পছন্দ করলেন এবং তার রাগ দমন হল।

পোষাকটি নিজ সন্তানের চেয়েও

বেশী মূল্যবান

আবু যানাদ থেকে বর্ণিত আছে যে, আসমা বিনতে আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একটি জামা ছিল। জামাটি তিনি তার সন্তান আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে দিয়েছিলেন; কিন্তু যখন তাকে বিরোধীরা হত্যা করে দিল তখন এ মর্মান্তিক ঘটনার সময় জামাটি হারিয়ে গেল। এ ঘটনার পর প্রায় সময়েই আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলতেনঃ

«لَلْقَمِيصِ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ قَتْلِ عَبْدِ اللَّهِ»

“আমার কলিজার টুকরা আব্দুল্লাহর হত্যা এত বেশী দুঃখজনক নয় যতটুকু দুঃখজনক হল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামাটি হারিয়ে যাওয়াতে দুঃখ হয়।”

কিছুদিন পর শাম রাজ্যের এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামাটি সেই ব্যক্তির কাছে রয়েছে। জামাটির ব্যাপারে আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর এরূপ দুঃখের কথা যখন লোকটি জানতে পারল তখন লোকটি জামাটি ফেরত দেয়ার জন্য একটি শর্ত দিয়ে দিল যে, আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যেন তার মাগফিরাতের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করে।

সুতরাং সে বললঃ

«لَا أَرُدُّهُ أَوْ تَسْتَغْفِرَ لِي أَسْمَاءُ»

“আমি জামাটি তখনই ফেরত দিব যখন আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আমার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করে।”

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ

«كَيْفَ أَسْتَغْفِرُ لِقَاتِلِ عَبْدِ اللَّهِ؟»

“এটা কি করে সম্ভব যে, আমি আব্দুল্লাহর হত্যাকারীর জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করি?”

লোকজন বললঃ যদি তা না করেন সে জামাটি ফেরত দিবে না; অথচ আপনি সে জামার আকাজক্ষী।

আসমা বললেনঃ শামীকে আমার কাছে আসতে বল।

সুতরাং শামী জামাটি নিয়ে আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে উপস্থিত হল। সে সময় তার কাছে আব্দুল্লাহ বিন উরওয়াও ছিল। শামীর নামও আব্দুল্লাহ।

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) শামীকে বললেনঃ জামা আব্দুল্লাহ বিন উরওয়াকে দিয়ে দাও। শামী জামাটি আব্দুল্লাহ বিন উরওয়ার কাছে দিয়ে দিল। অতঃপর আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞাসা করলঃ

আব্দুল্লাহ জামা গ্রহণ করেছে?

আব্দুল্লাহ উত্তর দিলঃ হ্যাঁ।

এবার আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ

«غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ»

অর্থাৎ, “আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করুন!”

শামী মনে করল আব্দুল্লাহ বলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, অথচ আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আব্দুল্লাহ বিন উরওয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন; কিন্তু শামী বুঝতে পারেনি।

সতীনের বিরুদ্ধে আজব ফন্দি

এক ব্যক্তি ইরানের শহর আহওয়াজের অধিবাসী ছিলেন। আহওয়াজ বসরার উত্তর পূর্বে অবস্থিত। সে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিল। সে বিবাহিত ছিল। একবার কোন এক কাজে বসরায় ভ্রমণ করে। সেখানে একটি সুন্দরী মেয়েকে তার পছন্দ হলে বিয়ে করে নেয়। সে এখন প্রতি বছরে দু'একবার বসরায় তার নুতন স্ত্রীর কাছে যেত এবং তার প্রয়োজনীয় সবকিছু পূরণ করে আসত।

এদিকে প্রথম স্ত্রী যে আহওয়াজের বাসিন্দা ছিল সে জানত না তার স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে। বসরার স্ত্রীর চাচার কাছে চিঠি আদান-প্রদান হত। একবার এমন হল যে, বসরার স্ত্রীর চাচার চিঠি আহওয়াজের স্ত্রীর হাতে পৌঁছে গেল। চিঠির বিষয় থেকে সে জানতে পারল যে, তার স্বামী বসরায় কোন মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং এ কারণে বছরে একবার বসরায় ভ্রমণ করে। এই গোপন তথ্য জানতেই তার মন আগুনের মত জ্বলে উঠল। এখন থেকে সে ভাবতে শুরু করল এর বিরুদ্ধে কি করা উচিত।

সুতরাং সে এক ফন্দি আটল। সেই চিঠি যা বসরার স্ত্রীর চাচা লিখেছিল সেটার মধ্যে এই কথাগুলো লিখে দিলঃ আমি বসরা থেকে অমুক লিখছি। খুব দুঃখের সাথে আমি লিখছি যে, তোমার স্ত্রী আর এ দুনিয়ায় নেই এবং চিরদিনের জন্য এই অস্থায়ী জগত থেকে বিদায় নিয়েছে। এজন্য দ্রুত বসরায় পৌঁছার চেষ্টা কর।

একথা লিখে আহওয়াজিয়া চিঠিটি স্বামীর কাছে দিয়ে দিল। স্বামী চিঠিটি পড়ে যেন আকাশ থেকে পড়ল; কিন্তু স্ত্রীর সামনে নিজেকে সামলানোটাও জরুরী ছিল। এর কিছুক্ষণ পর সে বসরার ভ্রমণের প্রস্তুতি নিল। এদিকে প্রথম স্ত্রী সবকিছুর উপর নজর রাখছিল। হঠাৎ সে বলে উঠলঃ

«إِنِّي أَرَاكَ مَشْغُولَ الْقَلْبِ وَأَظُنُّ أَنَّ لَكَ بِالْبَصْرَةِ امْرَأَةً»

“আমি লক্ষ্য করছি যে, তোমার মন কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে এবং আমার মনে হয় যে, তুমি বসরায় কোন নারীকে বিয়ে করেছ।”

স্বামী উত্তরে বললঃ “আউযুবিল্লাহ! আমি কোন বিয়ে করিনি!”

মহিলাটি খুব রাগান্বিত হয়ে বললঃ

«لَا أَقْنَعُ بِقَوْلِكَ دُونَ يَمِينِكَ فَتَحْلِفُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ لِّكُلِّ امْرَأَةٍ
لَكَ غَائِبَةً أَوْ حَاضِرَةً»

“আমি তোমার শপথ করা ছাড়া তোমার কথায় আশ্বস্ত হতে পারি না, তুমি শপথ করে বল যে, আমাকে ছাড়া কোন উপস্থিত অনুপস্থিত প্রত্যেক স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছি।”

স্বামী এই শপথ করতে কোন সমস্যা মনে করেনি, কেননা তার বিশ্বাস যে, তার বসরার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছে।

সুতরাং সে শপথ করে তালাক উচ্চারণ করল।

স্বামী শপথ করায় স্ত্রী বললঃ

«لَا حَاجَةَ لَكَ فِي الْخُرُوجِ فَإِنَّ تِلْكَ بَائِنَتْ وَهِيَ فِي الْحَيَاةِ»

“এখন তোমার বসরা যাওয়ার প্রয়োজন নেই, কেননা তোমার বসরার স্ত্রী জীবিত আছে; কিন্তু তাকে তুমি চূড়ান্ত তালাক দিয়ে দিয়েছ।”

শয়তানের ছবি বানিয়ে দাও

জাহেয এক খ্যাতি সম্পন্ন সুসাহিত্যিক ছিলেন। তার নাম আবু উসমান বিন বাহার বিন মাহবুব ছিল। তিনি মুতাহিলা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তার গড়ন ও আকৃতি খুবই ভয়ংকর ছিল। যেন তিনি কুৎসিতের দিক দিয়ে প্রথম ছিলেন। তার আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও ভুল ছিল। তবে জ্ঞানের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অনন্য। অনেক বিষয়ের উপর তার দখল ছিল। সুতরাং তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন, যা অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হিসেবে প্রমাণিত। তার লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে দু'টি কিতাব খুব বেশী প্রসিদ্ধ আর তা হলঃ

«لَمْ يَقَعْ بِيَدِهِ كِتَابٌ قَطُّ إِلَّا اسْتَوْفَى قِرَاءَتَهُ حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يَكْتَرِي دَكَكِينَ الْكُتُبَيْنَ وَيَبِيتُ فِيهَا لِلْمُطَالَعَةِ»

তার ব্যাপারে ইতিহাস গ্রন্থে রয়েছেঃ “যে কোন পুস্তক তার হস্তগত হলে পাঠ করে শেষ করতেন। বরং তার অধ্যয়নে এত বেশী আগ্রহ ছিল যে, লাইব্রেরী ভাড়া করে সেখানে রাত যাপন করে অধ্যয়ন করতেন।”

তার চেহারা কুৎসিত হলেও তার জ্ঞানের গভীরতা তাকে সুন্দর বানিয়ে দিয়েছিল। আজো তিনি তার পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে ইতিহাস ও সাহিত্যের পাতায় জীবন্ত। তার কুৎসিত চেহারা সম্পর্কে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ যা এক নারীর সাথে ঘটেছিল। আর এজন্য এই ঘটনাকে আমার নারী সম্পর্কীয় কিতাবে উল্লেখ করা প্রয়োজনবোধ করলাম। ঘটনাটি হল এইঃ জাহেয নিজেই বর্ণনা করেন-

«مَا أَخْجَلَتْنِي قَطُّ إِلَّا امْرَأَةٌ مَرَّتْ بِي إِلَى صَائِعٍ، فَقَالَتْ لَهُ: اْعْمَلْ مِثْلَ هَذَا»

“আমাকে একটি মহিলা ছাড়া কখনো কোন নারী অপমান করেনি। সে আমাকে এক স্বর্ণকারের কাছে নিয়ে গেল এবং তাকে বললঃ এর মত তৈরী করে দাও।”

একথা বলে সেই মহিলাটিতো চলে গেল; কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম। এরপর আমি কারিগরের কাছে জিজ্ঞেস করলামঃ এই মহিলা আমার সম্পর্কে তোমার কাছে কি বলে চলে গেল ?

স্বর্ণকার উত্তর দিলঃ

«هَذِهِ امْرَأَةٌ أَرَادَتْ أَنْ أَعْمَلَ لَهَا صُورَةَ شَيْطَانٍ، فَقُلْتُ: لَا أَذْرِي كَيْفَ أَصَوِّرُهُ، فَآتَتْ بِكَ إِلَيَّ لِأَصَوِّرَهُ عَلَى صُورَتِكَ»

“এই মহিলা (তার আংটির উপর) আমার কাছে শয়তানের ছবি বানাতে চাচ্ছে। তাকে আমি বললাম আচ্ছা আমি আজ পর্যন্ত কোন শয়তানকে দেখিইনি আমি কি করে শয়তানের আকৃতি তৈরী করতে পারব? সুতরাং সে আপনাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে যাতে আপনার আকৃতি দেখে তার আংটির উপর শয়তানের আকৃতি এঁকে দিই।”

1. আল-মুসতাতিরাফঃ ১/৩৮, সিয়ার আলামুন নুবালাঃ ১১/৫২৬, মু'জাম আল উদাবাঃ ৫/২১০১, বেদায়া অন নেহায়াঃ ১৪/৫১৪ দারু হিজর।

এক দাসীর উপস্থিত বুদ্ধি

ঐতিহাসিক মাদায়েনী বর্ণনা করেন যে, একবার উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ অশ্বারোহীদের সাথে বের হলেন। অশ্বারোহীরা এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল যার সাথে এক দাসীও ছিল সে দাসী খুব সুন্দরী ছিল। অশ্বারোহীরা ধমকি দিয়ে তাকে ডাকল আর বলল এই দাসী আমাদের দিয়ে দাও। সেই ব্যক্তির কাছে এক ধনুক ছিল। সে তার ধনুক দিয়ে এক ব্যক্তির উপর তীর নিক্ষেপ করল আর ধনুকের তার ছিঁড়ে গেল। অশ্বারোহীরা সুযোগ পেয়ে গেল।

সুতরাং তাকে ধরার জন্য সবাই মিলে ঘেরাও করল এবং দাসীকে ছিনিয়ে নিল। সেই ব্যক্তিটি নিজের জীবন বাঁচাতে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল। যেহেতু তাদের উদ্দেশ্য একমাত্র দাসীই ছিল সেজন্য তারা আর সে ব্যক্তিটির পিছু ধাওয়া করল না। অশ্বারোহীদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাসীর কানের দুলের প্রতি লক্ষ্য করল। সে দেখতে পেল যে এই দুল খুব মূল্যবান মতি দ্বারা তৈরি।

দাসী বললঃ এই মতি বেশী দামী নয়, যদি তোমরা সেই ব্যক্তির টুপি খুলে দেখতে তবে তোমরা দেখতে পেতে যে, সে টুপির নীচে কত বেশী মতি লুকিয়ে রেখেছে। সেই মতির তুলনায় এরতো কোন মূল্যই নেই।

একথা শোনামাত্র সকল অশ্বারোহী সেই ব্যক্তির পেছনে ছুটতে লাগল আর তার কাছে পৌঁছে উচ্চ কণ্ঠে বললঃ তোমার টুপির নীচে যা আছে তা আমাদের দিয়ে দাও। আমরা তোমাকে ছেড়ে দিব। সেই ব্যক্তির টুপির নীচে ধনুকের তার রাখা ছিল যা সে যেন বিপদ-আপদ ও সংকটাপণ্য মুহূর্তে ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু প্রচণ্ড ভয়-ভীতির কারণে সে তা ভুলে গিয়েছিল। এবার তার সে কথা মনে পড়ল এবং সে খুব সতর্কতার সাথে ধনুকে তার বাঁধল এরপর অশ্বারোহীদের বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়ালো যখন

অশ্বারোহীরা তার এই দুঃসাহসিকতা দেখতে পেল তখন তারা পালাতে লাগল আর দাসীটিকে ছেড়ে চলে গেল। এভাবে দাসীর উপস্থিতি বুদ্ধি ইবনে যিয়াদের লোকদেরকে পরাভূত করে দিল।^১

১. আরবী সাপ্তাহিক পত্রিকাঃ ৯৮, মেয়েলোকের বুদ্ধিমত্তাঃ ১১৮।

ইশারা ও ইঙ্গিতে কৃতিত্ব

আব্দুল্লাহ বিন তাহের খুরাসানের গভর্ণর ছিলেন। সাহিত্যের প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। লোকজন তাকে অনেক ইজ্জত ও সম্মান করতেন কেননা তিনি একজন অভিজাত রাজনীতিবিদ এবং পণ্ডিত ছিলেন। দানশীলতায় তিনি খুবই উদার ছিলেন।

খলীফা মামুনুর রশীদও (১৯৮-২১৪ হিজরী) তার অনেক সম্মান করতেন; বরং তার ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতেন। মামুন তাকে মিশর ও আফ্রিকারও গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

একদিন খলীফা মামুন আব্দুল্লাহ বিন তাহেরের উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ তাহের যখন মামুনের অসন্তুষ্টির কথা জানতে পারল তখন তিনি খলীফার দরবারে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন যাতে পুনরায় উভয়ের মধ্যে কথা-বার্তার মাধ্যমে সম্পর্ক পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। কেবলই যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন, ইতিমধ্যেই তার এক বন্ধুর চিঠি পৌঁছল। চিঠিতে দু'টি বাক্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না; বরং তাতে কেবল লিখা ছিল, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু, এছাড়া কাগজের এক কোণায় (হে মূসা!) লিখা ছিল।

আব্দুল্লাহ বিন তাহের চিঠি দেখে খুব ভাবতে লাগল যে, এতে (হে মূসা!) লিখার উদ্দেশ্য কি? আমার বন্ধু কী লিখতে চেয়েছিল? আমাকে কী বলতে চায়? তিনি এসব ভাবছিলেন তখন তার যে বুদ্ধিমতী দাসী ছিল বললঃ বস্তুতঃ আপনার বন্ধু আপনাকে এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করতে চায়ঃ

﴿يَمْوَسَىٰ ابْنَ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾

অর্থঃ “হে মূসা! এখানের নেতৃবর্গ আপনাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে এজন্য আপনি পলায়ন করুন আমি নিশ্চয়ই আপনার জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী।” (সূরা আল-কাসাসঃ ২০)

দাসীটি যখন এই আয়াত পড়ে শোনাল তৎমুহূর্তে আব্দুল্লাহ বিন তাহের বিষয়টি ভাল করেই অনুধাবন করতে পারলেন এবং তিনি খলীফা মামুনের সিদ্ধান্ত জেনে সতর্কতা অবলম্বন করলেন।

আব্দুল্লাহ বিন তাহের ৪৮ বছর বয়সে ২৩০ হিজরীতে নিশাপুরে ইন্তে কাল করেন।

এই ঘটনাটি কিতাবুল আযকিয়াঃ ২৫৫ থেকে নেয়া হয়েছে যার মূল উৎস সিয়ার আলামুননুবালা ৬৮৪/১০ এবং অফিয়াতুল-আইয়ান ৮৩-৮৩/৩ ও অন্যান্য পুস্তকাদি থেকে লিখা হয়েছে।

সন্তানের মৃত্যুতে আহাজারীর ওয়র

আসমাঈ বর্ণনা করেন যে, এক বেদুঈন মহিলার কলিজার টুকরার ইন্তেকাল হয়ে গেল। সে অতিরিক্ত চোখের পানি ফেললো। কাঁদতে কাঁদতে তার চেহারায় দাগ পড়ে গেল। এরপর সে বললঃ হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে তুমি পিতা-মাতার তাদের সন্তানের প্রতি সীমাহীন ভালবাসা সম্পর্কে জানতে এজন্য হয়ত তুমি পিতা-মাতাকে নির্দেশ দাওনি তাদের সন্তানের প্রতি উত্তম ব্যবহার করার জন্য। এর বিপরীতে তুমি এটাও জানতে যে, সন্তান তার পিতা-মাতার নাফরমানি করতে পারে তাই তুমি সন্তানদেরকে নির্দেশ দিয়েছ যে, তারা যেন তাদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করে।

হে আমার প্রভু! নিশ্চয়ই আমার এই সন্তান নিজের পিতা-মাতার অনুগত ছিল ও তাদের প্রত্যেক নির্দেশ মেনে চলত। সুতরাং তুমি আমার সন্তানকে তার পিতা-মাতার আনুগত্যের উসীলায় তোমার নিজ বিশেষ রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দিও এবং তাকে তোমার নেয়ামত ও রহমত দিয়ে বেষ্টিত কর।

এই বেদুঈন নারীর স্বামী তার স্ত্রীর কথা শুনে বললঃ সত্যিই তুমি উত্তম দোয়া করেছ; কিন্তু ভাল হতো যদি তুমি হায়-হতাশ না করতে।

বেদুঈন উত্তর দিলেনঃ প্রকৃতপক্ষে আমি যে আমার সন্তানের ওফাতের জন্য অশ্রুসিক্ত করেছি তা আমার অনিচ্ছায়। আমি লাখোবার চেষ্টা করেও আমি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। তা নিয়ন্ত্রণের শক্তি সামর্থ্যই আমার ছিল না। এজন্য আল্লাহর মেহেরবানীতে আমার নিকট ওয়র রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَّحِيمٌ﴾

“তবে যে ব্যক্তি (এরূপ কঠিন সংকট কাটিয়ে না উঠতে পেরে) ইচ্ছাকারী এবং সীমাতিক্রমকারী না হয় তার জন্য পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অতি ক্ষমাশীল এবং অতি দয়ালু।” (সূরা বাকারা)

বেদুঈন নারীর বুদ্ধিমত্তা

আসমাঈ বলেনঃ আমি এক বেদুঈন নারীকে দেখলাম যে খুবই সুন্দরী ছিল; কিন্তু তার স্বামী একজন কুৎসিত ও অসুন্দর ব্যক্তি ছিল। আমি সেই নারীকে বললামঃ

«يَا هَذِهِ أَتَرْضِينَ أَنْ تَكُونِي تَحْتَ هَذَا؟»

“হে বেগম! তুমি (এত সুন্দরী হওয়ার পরও) এমন কুৎসিত পুরুষের স্ত্রী হিসেবে থাকতে কিভাবে মেনে নিয়েছ?”

উত্তরে সে বললঃ

«يَا هَذَا، لَعَلَّهُ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ فَجَعَلَنِي ثَوَابُهُ،
وَأَسَأْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ رَبِّي فَجَعَلَهُ عَذَابِي أَفَلَا أَرْضَى بِمَا
رَضِيَ اللَّهُ بِهِ؟»

“দেখুন! হতে পারে আমার সেই স্বামী নিজের প্রভুর নির্দেশ পালনকারী হওয়ার কারণে আল্লাহ তায়ালা খুশি হয়ে আমার মত সুন্দরী স্ত্রীকে তার জন্য নির্ধারিত করেছেন। এর বিপরীতে হতে পারে আমার থেকে আল্লাহর নির্দেশ পালনে ত্রুটি হয়েছে বিধায় আমার মত সুন্দরী ও রূপসীর জন্য শাস্তি স্বরূপ এমন কুৎসিত স্বামীকে নির্ধারণ করেছেন।

আপনি কি মনে করেন আমার আল্লাহ তায়ালায় সিদ্ধান্তে খুশি থাকা উচিত নয়?¹

অটল ও দৃঢ় ঈমান

ইসলামিক ঐতিহাসিক ইবনে খালকান স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থ অফিয়াতুল আ'ইয়ানে এক ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি লিখেনঃ

এক দুঃশরিত্র নারীর বর্ণনাঃ

«مَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا فَتَنَتْهُ مَا خَلَا طَاوُوسَ»

“আমি যাকে চেয়েছি তাকেই আমার জালে বন্দী করেছি; কিন্তু তাউস নামক এক ব্যক্তিকে আমার জালে বন্দী করতে পারিনি। তিনি এক খ্যাতিসম্পন্ন তাবিঈ।”

সেই দুঃশরিত্র নারীর বর্ণনা যে আমি খুব ভালরূপে সাজ-সজ্জায় তাউস বিন কীসানের কাছে গেলাম এবং পাপের আহ্বান জানাই। তিনি প্রকাশ্যে আমার ডাকে সাড়া দিয়ে বললেনঃ

«إِذَا كَانَ وَقْتُ كَذَا فَتَعَالِي»

“অমুক সময়ে তুমি আমার কাছে চলে এসো।”

সুতরাং আমি তার থেকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে চলে আসলাম। আমি ভাবতে লাগলাম যে আজ এই বুয়ুর্গ ব্যক্তিকেও নিজের জালে ফাঁসিয়েছি। আমার সৌন্দর্যে পাগল হয়ে তাকওয়া পরহেযগারী ত্যাগ করেছে। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আমি তার কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে মসজিদুল হারামে চলে গেলেন। সেখানে পৌঁছে আমাকে বললেনঃ

«اضْطَجِعِي»

“চল শুয়ে যাও!”

আমি বললামঃ এখানে! এটা আপনি কি বলছেন এমন পবিত্র স্থানে এমন কাজ?

তিনি বললেনঃ

«الَّذِي يَرَانَا هُنَا يَرَانَا ثُمَّ»

“যিনি আমাকে এখানে দেখছেন তিনি সর্বস্থানেই দেখেন।”

এরপর দুঃশ্চরিত্র নারী সেখান থেকে বিমূখ হয়ে ফিরে গেল।^১

১. অফিয়াতুল আ'ইয়ান, ইবনে খালকানঃ ৫১০/২।

সতী নারীর অসম্ভব প্রকাশ

প্রত্যেক পরিবারেই কখনো না কখনো পরস্পরের মধ্যে সামান্য হলেও ঝগড়া-বিবাদ হয়েই থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝি হয়েই যায়। কখনো স্ত্রী স্বামী থেকে অসম্ভব আর কখনো স্বামী স্ত্রী থেকে অসম্ভব হয়ে থাকে। বিশ্বজগতের সর্বোৎকৃষ্ট ঘরেও কখনো কখনো এমন সামান্যতম বিষয় ঘটে থাকত। তারা কিভাবে দুঃখ প্রকাশ করতেন?

আসুন একটি হাদীস পড়ি। হাদীসটি অধ্যয়নের পর অনেকগুলো বিষয় আমরা অবগত হতে পারব।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললেনঃ

«إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتُ عَلَيَّ غَضَبِي»

“যখন তুমি আমার উপর খুশি থাক তখন আমি জানতে পারি আর যখন আমার উপর অসম্ভব থাক তখনও আমি জানতে পারি।”

আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ

«مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟»

“আপনি কিভাবে তা বুঝতে পারেন?”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«أَمَّا إِذَا كُنْتُ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ،
وَإِذَا كُنْتُ غَضَبِي قُلْتُ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ»

“যখন তুমি আমার উপর খুশি থাক তখন তুমি বল মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রবের কসম! আর যখন তুমি আমার উপর অসম্ভব থাক তখন তুমি বলে থাক ইব্রাহীমের (আলাইহিস সালাম) রবের কসম!”

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ

«أَجَلٌ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ»

“আল্লাহর কসম! আপনি সঠিক বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অসম্ভুষ্টি অবস্থায় কসম করলে কেবল আপনার নাম উল্লেখ করি না।”^১

লক্ষ্য করুন অসম্ভুষ্টি প্রকাশের কি সূক্ষ্ম পদ্ধতি! আর স্ত্রীর মেজাজকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কত গভীর অনুভূতির মাধ্যমে বুঝে নেন। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, মহান ব্যক্তিদের অসম্ভুষ্টি প্রকাশের ধরণও নীরবতার সাথে ও ভদ্রতার সাথে হয়ে থাকে।

১. বুখারীঃ ৫২২৮, মুসলিমঃ ২৪৩৯

কোরআনের দলীল দিয়ে নিরুত্তর করে দিল

ইবনে আবী আওয়ান আল কাতিব তার গ্রন্থ আল-উযুবাতে লিখেনঃ
বিশর আল-মারিসির মা কোন এক বিচারকের বিচারালয়ে উপস্থিত ছিল।
আদালতে অন্য এক মহিলার সাক্ষী নেয়া হচ্ছিল, আর মাঝে মধ্যে উম্মে
বিশর সেই মহিলাকে সাক্ষীর বিষয় মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

এটা দেখে বিবাদী পক্ষ বিচারককে বললঃ

«مَا تَرَاهَا تُلَقِّنُهَا؟»

“কাজী সাহেব! আপনি দেখেন না, এই মহিলা আমার বাদী মহিলার
সহযোগিতা করছে।”

বিশরের মা বললেনঃ

«يَا جَاهِلُ! إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:
﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾»

হে জাহেল! আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ “সাক্ষাতে যদি এক মহিলা ভুলে
যায় তবে তাকে অন্য মহিলা স্মরণ করিয়ে দিবে।” (সূরা বাকারাহঃ ২৮২)

উম্মে বিশর কোরআনের দলীল দিয়ে বিপক্ষকে নিরুত্তর করে দিলেন।

খলীফার কাছে স্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে খুব অশান্তিতে ছিল। তার স্ত্রীর ব্যবহার খুব দুঃখজনক ছিল। এজন্যে লোকটি বেশী পেরেশানীতে ছিল। তিনি ভাবলেন যে, উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে এই বিষয়ে পরামর্শ কেন নিচ্ছি না? স্ত্রীর বিষয়ে অভিযোগও করব। সুতরাং তিনি খলীফার দরবারে উপস্থিত হলেন। আর জানতে পারলেন যে, আমীরুল মু'মিনীন নিজেও তার স্ত্রীর পক্ষ থেকে অশান্তিতে আছেন। তিনি ভাবলেন যে, অভিযোগ করে লাভ নেই। আর কিছু না বলেই উঠে চলে যেতে লাগলেন।

উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই ব্যক্তিকে চলে যেতে দেখে ডাক দিলেনঃ শোন! তুমি কোন কাজে এসেছিলে? তুমি নিজের বিষয় কিছুই বললে না আর চলে যাচ্ছ?

তিনি বললেনঃ আমীরুল মু'মিনীন! আমি আমার স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করতে এসেছিলাম; কিন্তু আমি দেখলাম যে আপনি নিজেও এই সমস্যায় জর্জরিত যার জন্য আমি দুঃখ-কষ্টে আছি। এজন্যে অভিযোগে কোন লাভ নেই।

উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে বললেনঃ শোন আমার প্রিয় ভাই! আমার স্ত্রী আমার জন্য খাবার তৈরি করে। আমার কাপড় পরিষ্কার করে। আমার বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। আমার শিশুদের দুধ পান করায়। যদি কখনো অনুচিত কাজ করে বসে তবে আমার উচিত নয় যে, আমি তার সমস্ত ভাল কাজ অবমূল্যায়ন করে তার বিষয়গুলোকে নিয়ে আসা শুরু করে দেই।

হ্যাঁ যদি তুমি নিজের স্ত্রীর দ্বারা বেশী পেরেশানী ও কষ্টে থাক তবে জেনে রাখ আমাদের ও আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালার দু'টি দিন রয়েছে এক হল যদি আমরা মৃত্যুবরণ করি তবে তারা শান্তি পাবে আর দ্বিতীয় হল তারা যদি এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায় তবে আমরা তাদের পক্ষ থেকে প্রশান্তি লাভ করব।

এক নারী পরাজিত করল বাহাদুরকে

মক্কা বিজয়ের দিনে বনু মাখযূমের দুই ব্যক্তি উম্মে হানি^১ বিনতে আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে আশ্রয় নিল। তাদের দু'জনের মধ্যে একজন হারিছ বিন হিশাম^২ উম্মে হানি (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দের মধ্যে ছিল।

এরই মধ্যে তার ভাই আলী বিন আবু তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার কাছে আসল। উম্মে হানি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাকে বললেন যে, তিনি এক মুশরিককে আশ্রয় দিয়েছেন। এই মুশরিকও কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিল না। কাফেরদের বড় সরদার আবু জাহেলের ভাই ছিল। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর এই শত্রুকে অবশ্যই হত্যা করব। এরপর তিনি তরবারী বের করলেন। এটা দেখে উম্মে হানি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন যে, ভাই! এমন করবেন না সে আমার আশ্রয়ে আছে। তাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি; কিন্তু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের বোনের কথায় লক্ষ্যপ না করে হারিছকে হত্যার জন্য অগ্রসর হলেন।

উম্মে হানি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) দৌড়ে তার হাত ধরে নিলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি তাকে হত্যা করতে পারেন না। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের বোনের হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন তো উম্মে হানি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরো শক্ত করে ধরেন। এমন

১. তিনি আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বোন উম্মে হানি বিনতে আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। তার বিয়ে হুবাইরা বিন আমর বিন মাখযূমীর সাথে হয়েছিল।
২. তিনি হারিছ বিন হিশাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবু জাহেলের ভাই মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। জাহেলী যুগে যেমন ভদ্র ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন; ইসলামেও তা পরিপূর্ণতায় ছিল। ১৮ হিজরীতে শাহাদাতবরণ করেন। উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পর তার স্ত্রী ফাতেমাকে বিয়ে করেন।

সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসলেন আর এই দৃশ্য দেখে মুচকি হাসলেন।

উম্মে হানি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি দেখছেন আমি এক ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছি আর আলী তাকে হত্যা করতে চাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«يَا أُمَّ هَانِيَّة! قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتَ»

“হে উম্মে হানি! যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ তাকে আমরাও আশ্রয় দিয়েছি আর যাকে তুমি জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছ তাকে আমরাও নিরাপত্তা দিয়েছি।”

এরপর উম্মে হানি (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাত ছেড়ে দিলেন। কোন কোন ইতিহাস গ্রন্থে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ “হে আলী! তোমার উপর এক নারী জয়ী হয়েছে।”

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এই মহিলা আমাকে এত শক্ত করে ধরেছে যে, আমি আমার পা পর্যন্ত মাটি থেকে উঠাতে পারিনি।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা শুনে হেসে উঠেন এবং বলেন, আবু তালিবের সকল সন্তান বাহাদূর।

দূরদর্শিতা

আল্লামা ইবনে জাওযী^১ (রাহিমাহুল্লাহু আলাইহি) তিনি তার “কিতাবুল আযকিয়ায়” লিখেন—

দু'ব্যক্তি কুরাইশ বংশের এক মহিলার দরবারে হাজির হল এবং তার কাছে একশত দীনার আমানত রেখে বলল, যে পর্যন্ত আমরা উভয়ে একত্র হয়ে অর্থ না চাইব সে পর্যন্ত আপনি এই আমানত ফেরত দিবেন না। আমাদের উভয়ের উপস্থিতি আমানত ফেরত দেয়ার জন্য জরুরী।

সেই মহিলা তাদের আমানত রেখে দিল এবং এক বছর অতিক্রম হয়ে গেল। এক বছর পর তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সেই মহিলার কাছে আসল এবং বলল যে আমার সাথীর ইন্তেকাল হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের আমানত ফেরত দিয়ে দিন। মহিলা আমানত ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন, তোমরা আমানত রাখার সময় উভয়েই এই শর্ত আরোপ করেছিলে যে, আমি তোমাদের একজনের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয়জনকে অর্থ ফেরত দিব না। এজন্য আমি আমানত ফেরত দিতে পারব না। সেই ব্যক্তি অর্থ ফেরত নেয়ার জন্য মহিলার পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীদের সহায়তা চাইল। তারা সকলেই তার কাছে সুপারিশ করল যে, তাকে আমানত দিয়ে দাও, তার সাথী ইন্তেকাল করেছে। লোকজনের খুব বেশী বলাতে এবং সুপারিশে সেই মহিলা আমানত ব্যক্তিটিকে দিয়ে

১. তিনি হলেন ইমাম আবুল ফযল আব্দুর রহমান বিন আলী বিন আল-জাওযী। তিনি ৫১০ হিজরী সালে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৯৭ হিজরী দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি এতীম অবস্থায় নিজের চাচীর দ্বারা লালিত-পালিত হন এবং মামা শায়খ আবুল ফযল বিন আমেরের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞানের সাগর ছিলেন। ইসলামী জ্ঞান আহরণের পর ওয়াজ-নসীহতের মজলিশ প্রতিষ্ঠা করেন। তার মজলিশ দরসে হাদীস ও ইলমে নববীর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তার খ্যাতি সারা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি হাদীসের হাফেজ উপাধিতে ভূষিত হন।

দিল। এরপর আরো এক বছর অতীত হল আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে তার বন্ধু মৃত বলেছিল সে উপস্থিত হয়ে আমানত ফেরত চাইল।

মহিলাটি বললঃ তোমাদের দ্বিতীয় সাথী এসেছিল এবং সে আমাকে বলল যে, তুমি মৃত্যুবরণ করেছো এজন্য আমানত আমি তাকে দিয়ে দিয়েছি।

সেই ব্যক্তি এই মহিলার সাথে ঝগড়া করতে লাগল এবং বলল যে আমি তো সুস্থরূপে বেঁচে আছি। আমার আমানত ফেরত দিয়ে দাও। মহিলাটি বলল আমি তো সেই অর্থ তোমার সাথীকে দিয়ে দিয়েছি। এবার লোকটি মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগটি উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আদালতে নিয়ে গেল।

উমর ফারুক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উভয়ের অভিযোগ শুনলেন এবং তিনি ভাবলেন যে এর ফয়সালা লোকটির পক্ষে করে দিতে। হঠাৎ তিনি কিছু ভাবলেন, এরপর তিনি বললেন, এর ফয়সালা করার জন্য আলী বিন আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে বিষয়টি পাঠাচ্ছি।

আর অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি নিজেই উভয়কে নিয়ে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে যান। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উভয়ের বর্ণনা শুনেন এবং তিনি বিষয়টি থেকে বুঝলেন যে, এই মহিলার সাথে ধোকাবাজী হয়েছে।

সুতরাং তিনি বললেন, তুমি কি এই মহিলার সাথে এই শর্ত আরোপ করনি যে, অর্থ একজনের অনুপস্থিতিতে অন্যজনকে ফেরত দিবে না?

সেই ব্যক্তিটি বলল, হ্যাঁ এই শর্ততো আরোপ করা হয়েছিল।

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তোমার অর্থ আমাদের কাছে আছে। তোমার সাথীকে নিয়ে এসো, এরপর আমরা তোমাদের উভয়ের অর্থ ফেরত দিয়ে দিব।

রাসূল (ﷺ)-এর নিকট এক রমণীর অভিযোগ

খাওলা বিনতে সালাবা^১ আওস বিন সামিতের^২ সহধর্মিনী ছিলেন। বয়সের ভারে আওস বিন সামিতের মেজাষও খিট খিটে স্বভাব ধারণ করেছিল। এক দিন স্ত্রীর কাছে এসে কোন এককথায় বিতর্ক করতে লাগলেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে একথা বলে ফেললেনঃ

أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرٍ أُمِّي..

অর্থঃ “তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের মত।”

আরবে ইসলামপূর্ব যুগে তালাকের এক পদ্ধতি এমনও ছিল যে, স্ত্রীকে বলে দিত তুমি আমার মায়ের মত। একথা বলে আওস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাড়ী থেকে বের হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের এক বৈঠকে চলে গেলেন। এরপর যখন বাড়ী ফিরলেন এবং স্ত্রীর কাছে তার চাহিদা পূরণের জন্য আবদার করলেন। স্ত্রী উত্তর দিলেন কখনো নয় আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে আসতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত

1. খাওলা বিনতে সা'লাবা তিনি আউস বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী ও চাচাতো বোন ছিলেন। তিনি স্বীয় স্বামীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট অভিযোগ করেন। তাঁর স্বামী তার সাথে যেহার (অর্থাৎ তালাক) করেছেন। এই সম্মানিতা সাহাবীয়ার সম্পর্কে আল্লাহ রাক্বুল ইযযত কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন যা কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত হতে থাকবে।
2. আউস বিন সামেত বিন কায়েস বিন ফেহের বিন খায়রাজ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উবাদা বিন সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভাই এবং বদরী সাহাবী। তিনি ঐ প্রথম শ্রেণীর সাহাবী যাঁরা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যিনি নিজের চাচাতো বোন বিয়ে করেছিলেন যাঁর সম্পর্কে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই সম্মানিত বদরী সাহাবী উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খিলাফতের সময় ৮৫ বছর বয়সে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার একথার বিষয়ে মীমাংসা না করে দেয়।

আওস বিন সাবিত স্ত্রীর সাথে জোরাজোরি করলেন; কিন্তু তার স্ত্রী তাকে তার উদ্দেশ্য সফল হতে দেননি। (আল-ইসাবাঃ ৮/১১৪)

এরপর খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রতিবেশীর কাছ থেকে এক চাদর নিয়ে তা পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি সব কিছু বর্ণনা করলেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উপদেশ দিলেন খাওলা! তোমার চাচাত ভাই বৃদ্ধ। তার বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। খাওলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত যাব না। এরই মধ্যে আল্লাহর রাসূলের উপর ওহী অবতরণের রূপ ধারণ করল এবং জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) আগমন করলেন। যখন ওহী অবতরণ সমাপ্ত হল তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে খাওলা আল্লাহ তায়ালা তোমার ও তোমার স্বামীর ব্যাপারে কোরআনের ফয়সালা অবতীর্ণ করলেন।

অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খাওলার সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করে শুনানঃ

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

অর্থঃ “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সেই নারীর কথা শুনেছেন, যে আপনার সাথে তার স্বামীর ব্যাপারে বিতর্ক করছিল এবং আল্লাহর কাছে নিজের অভিযোগ করছিল। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উভয়ের আলোচনা শুনেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সবকিছুই শুনেন ও দেখেন।” (সূরা মুজাদালাঃ ১)

এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আওস বিন সামিতকে একটি দাসমুক্ত করতে বল।

খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার দাস মুক্ত করার সামর্থ কোথায়? সে বরং নিজেই দরিদ্র মুখাপেক্ষী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে সে দু'মাস অনবরত রোযা রাখবে। খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, আল্লাহর শপথ! সে বৃদ্ধলোক, এতগুলো রোযা রাখা তার সামর্থের বাইরে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তবে সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাবে যার পরিমাণ এক ওয়াসাক খেজুর।

জ্ঞাতব্য যে, এক ওয়াসাক সমান ৬০ সা' আর এক সা সমান প্রায় ২.৫ আড়াই কিলোগ্রামের হয়ে থাকে।

খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতেও তার সামর্থ নেই।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাহলে আমি এক বুড়ি খেজুর তাকে দিয়ে দেই যাতে তার সহায়তা হয়।

খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এক বুড়ি খেজুর আমিও আমার স্বামীর জন্য দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বিষয়টির প্রশংসা করলেন এবং এরশাদ করেনঃ

«قَدْ أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتِ، فَادْهَبِي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِي بِابْنِ عَمِّكَ»

“তুমি সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছ এবং উত্তম কাজ করলে। যাও এই খেজুর নিজ স্বামীর পক্ষ হতে দান করে দাও এবং নিজের চাচাত ভাইয়ের সাথে উত্তমরূপে বসবাস কর।”

এরপর খাওলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ফিরে আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ বাস্তবায়ন করলেন। (ইমাম আহমাদ এই হাদীসটি স্বীয় সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

নবুওয়াতের দরবার থেকে নিরাপত্তার পরোয়ানা

সে ইসলামের এক বড় শত্রু ছিল। তার পিতা তার থেকেও বড় শত্রু ছিল। তার পিতাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই উম্মতের ফেরাউন উপাধি দিয়েছিলেন।

ইসলামের এ পরম শত্রুর নাম ইকরামা বিন আবু জাহেল ছিল। মক্কা বিজয় হলে ইসলাম জয়ী হল। নবুওয়াতের নির্দেশ জারি হলঃ নয় ব্যক্তি এমন যারা ইসলামের পরম শত্রু তাদের সর্বাবস্থায় হত্যার নির্দেশ হল যদিও তারা কাবা শরীফের গোলাফে লুকিয়ে থাকে। তাদের অপরাধ খুব ভয়ঙ্কর ছিল। তাদের তালিকায় ইকরামা বিন আবু জাহেলও শীর্ষে ছিল।

ইকরামা নবুওয়াতের সিদ্ধান্ত অবগত হয়ে ভয়ে ইয়ামানের দিকে পালাতে লাগল। অন্যদিকে তার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারেছ বিন হিশাম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল।

স্বীয় স্বামীর প্রতি ভক্তির প্রমাণ এ ঘটনায় হয় যে, সে জানে স্বামীর হত্যার হুকুম জারী হয়ে গেছে, তার পরেও এই নারী তার স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি এজন্য যে, আপনি আমার স্বামী ইকরামার প্রাণের নিরাপত্তা দিবেন এবং অনুমতি দিবেন আমি যেন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারি।

দয়ালু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলেন এবং উম্মে হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললেন যে, যাও তুমি তোমার স্বামীকে খুঁজে নিয়ে আস।

উম্মে হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজের স্বামীকে তালাশ করার জন্য বের হলেন। অন্যদিকে ইকরামা মক্কা থেকে তায়েফের পথে যাত্রা করেছে। এখানেও তিনি আশ্বস্ত হতে পারেন নি তিনি তিহামা পাহাড়ের দিকে যাত্রা

শুরু করেন। আবহা এলাকা অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হয়ে সামনে সমুদ্র পেলেন। জাহাজে আরোহণ করলেন। জাহাজ ভরতি মুসাফিরদের নিয়ে জাহাজ সমুদ্রে চলতে লাগল হাবশার দিকে। হঠাৎ সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। জাহাজ হেলতে লাগল। ইকরামা লাত ও উজ্জাকে ডাকল। মাঝিরা বললঃ

«أَخْلِصُوا، فَإِنَّ إِلَهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاهُنَا»

অর্থঃ “এমন সমস্যায় যখন সমুদ্র ঝড় তোলে তখন লাত ও উজ্জার নয়; বরং তাদের প্রভু যার কোন অংশীদার নেই তিনিই সাহায্য করেন। যদি সাহায্য চাইতে হয় তবে কেবলমাত্র এক প্রভুর কাছে সাহায্য চাও।”

ইকরিমা মাঝিদের একথা শুনে থেমে গেলেন হঠাৎ তার মনে হলো যে, যেই সত্ত্বা সমুদ্রের ভয়াবহ ঝড়ের বিপদ থেকে রক্ষা করেন সেই সত্ত্বাই স্থলেও বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। তিনি বললেনঃ

«اللَّهُمَّ لَكَ عَلَيَّ عَهْدٌ إِنَّ عَافَيْتَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ: أَنْ آتِيَ
مُحَمَّدًا حَتَّى أَضَعَ يَدِي فِي يَدِهِ فَلَا جِدَّةَ عَفُوءًا كَرِيمًا»

অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তোমার নিকট অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি যে, যদি তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর তবে আমি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে হাতে হাত রেখে ইসলামে দীক্ষিত হব আর তাঁকে আমি অবশ্যই ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণকারী পাব।”

সামান্য কথায় দৃষ্টি খুলে গেল এবার তার জাহাজ সৈকতে ভীড়ছিল আর যখন তিনি স্থলে নেমে আসলেন এবং তিনি চমকিত হলেন যে, তার স্ত্রী সেখানে তার অপেক্ষায় রয়েছেন। তার স্ত্রী তাকে দেখামাত্র বললেনঃ

ইকরামা! তুমি কার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ? শুনে রাখ! তুমি এমন উত্তম ব্যক্তি থেকে পালাচ্ছ যার মত মানুষ এই বিশ্বে কোথাও নেই। আমি তোমার জন্য তার কাছে নিরাপত্তা চাওয়া মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ নিরাপত্তার অঙ্গীকার করলেন। পূর্বেই মাঝিদের কাছে এক প্রভুর সাহায্যের কথা শুনে আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসে দৃঢ়তা এসেছিল। বাকি ছিল তার বাস্তবায়ন।

ইকরামা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ “আমার স্ত্রী উম্মে হাকীম বলেছেন যে, আপনি আমার জন্য নিরাপত্তা দিয়েছেন।”

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ “হ্যাঁ তোমার জন্য নিরাপত্তার পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।”

ইকরামা বলেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হলাম আর লজ্জায় আমার মাথা নত ছিল। আমি বললামঃ আমি

সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তার কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। আপনি এই ভূ-পৃষ্ঠে সমস্ত মানবকুলের মধ্যে সর্বোত্তম ও সত্যবাদী এবং সবচেয়ে বেশী পরোপকারী। হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোন প্রকার শত্রুতায় লিপ্ত থাকলে অথবা কোন শিরকের কোন কিছু আমার কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছে এমন বিষয়ের জন্য আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে দু'আ করলেনঃ

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعِبْرِمَةٍ كُلِّ عِدَاوَةٍ عَادَانِيهَا، أَوْ مَوْكِبٍ أَوْضَعَ فِيهِ، يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ عَنْ سَبِيلِكَ»

“হে আমার মাবুদ! ইকরামা আমার সাথে যেমনই শত্রুতা করুক এবং তোমার রাস্তায় চলার পথে যাই বাঁধা সৃষ্টি করে থাকুক তুমি তার সবকিছুই ক্ষমা করে দাও।”

ইকরামা বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কল্যাণকর যাই উপদেশ দিবেন আমি তা পরিপূর্ণরূপে মান্য করব।”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ তুমি বল—

«أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»

এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কর।

ইকরামা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণের আগে ইসলামের রাস্তায় বাঁধা সৃষ্টির জন্য যত পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছি, আল্লাহর শপথ! আমি এখন আল্লাহর রাস্তায় অনেকগুণ বেশী সম্পদ ব্যয় করব। আর যেভাবে আমি ইসলামের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছি এবার আল্লাহর রাস্তায় অনেক বেশী জেহাদ করব।^১

ইকরামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর আবেগ সত্য ছিল। এক সৎ রমনীর স্পর্শে জান্নাতের রাস্তার পথিক হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে তার স্ত্রী উম্মে হাকীম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার ইসলাম গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে ইসলাম ত্যাগকারীদের (মুরতাদদের) বিরুদ্ধে অবিরাম জেহাদ করে যান এবং এই ফেতনা মিটিয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতের যুগে ১৩ হিজরীতে শাম দেশের আজনাদাইন যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন। (উসদুল গাবা, সিয়রু আলামুন নুবালা)

এক সাহসী রমণীর কাহিনী

তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফুফু ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে অন্যান্য নারীদের সাথে তিনিও যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছলেন। সেই যুদ্ধে তার ভতিজা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), ভাই হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং তার সন্তান যুবাইর বিন আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উপস্থিত ছিলেন। এক নারীর পক্ষে এই তিনটি বন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। তার নাম সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। তার মাতা হালা বিনতে ওয়াহাব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খালা।

সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হিজরত করেছেন। তার দু'সন্তান যার একজন যুবাইর বিন আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আশারায় মুবাম্বাশারার অন্তর্ভুক্ত এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাওয়ারী উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

উহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লে গুটি কতেকজনই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চতুষ্পার্শ্বে রইলো। এই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে এই বাহাদুর নারী সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং এক ব্যক্তির বললম ছিনিয়ে নিয়ে লোকজনের বাঁধা অতিক্রম করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে ধাবিত হলেন। বাঘের মত গর্জে উঠে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করলেনঃ

«وَيَحْكُمُ أَنْصَرَفْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ»

“আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন! তোমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ছেড়ে কোথায় পালাচ্ছ?”

যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দৃশ্য দেখতে পেলেন তিনি আশঙ্কা করলেন যে, না জানি সাফিয়া তার ভাই হামযার লাশ দেখে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, কেননা মুশরিকরা হামযার লাশের নাক ও কান কেটে অঙ্গহানী করে ভয়ঙ্কর রূপে অঙ্গচ্ছেদ করে অপদস্থ করেছিল।

তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর পুত্র যুবাইর বিন আওয়াম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ইঙ্গিত করে বললেনঃ হে যুবাইর! তোমার শ্রদ্ধেয় মাতাকে থামাও। তাকে বুঝিয়ে এদিকে নিয়ে এসো। যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ মাতার দিকে ধাবিত হয়ে বললেনঃ আম্মাজান থামুন! আম্মাজান থামুন!

সাফিয়া সন্তানের ডাকে কোন দ্রুপেক্ষ না করে উচ্চস্বরে বললেনঃ

«تَنَحَّ لَا أُمَّ لَكَ»

“আমার রাস্তা ছেড়ে দাও, আমাকে যেতে দাও, তোমার মাতা না থাকুক।”

যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ আম্মাজান! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রত্যুত্তরে বললেনঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আমার ভাই হামযাকে মুশরিকরা নাক কান কেটে অঙ্গহানী করেছে। কোন ব্যাপার না। এসব আল্লাহর রাস্তায় হয়েছে। আমি ধৈর্যধারণ করব।

এবার যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিশ্চিত হলেন যে, এ বাহাদুর নারী নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন এবং আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দিকেই সবকিছুর উর্ধ্বে মেনে চলবেন তখন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ “হে যুবাইর! সাফিয়ার রাস্তা ছেড়ে দাও!” সুতরাং যুবাইর তার রাস্তা ছেড়ে দিলেন।

সাফিয়া এ যুদ্ধে আহতদের পানি পান করিয়েছেন এবং তাদের ক্ষতস্থানে পট্টি লাগিয়েছেন। অন্যান্য মহিলাদের সহায়তা করেছেন। খন্দক যুদ্ধেও তার বীরত্ব ছিল অনন্য। সেখানে তিনি তাবুর এক খুঁটি দিয়ে এক ইয়াহুদীকে হত্যা করেন।

সাফিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফতকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন।

তাবেয়ীকূল শিরোমণীর কন্যাই যখন----

উমাইয়া খলীফা আমীরুল মু'মিনীন আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান।^১ প্রসিদ্ধ বুয়ুর্গ তাবিয়ী এবং মসজিদে নববীর ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের^২ কাছে নিজের খাদেম পাঠালেন।

তিনি এসে বললেন যে, মুসলিম খলীফার ইচ্ছা হলো যে, আপনি আপনার কন্যার বিয়ে খলীফা আব্দুল মালিকের পুত্র ওয়ালিদের সাথে করিয়ে দেন। আমি খলীফার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি।

ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের কন্যা রূপে গুণে অনন্যা ছিলেন। বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানী ছিলেন। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীসেও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

ইমাম সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের কাছে বিয়ের প্রস্তাব আসলে তিনি দ্বিধাহীনভাবে তা অস্বীকৃতি জানান।

খলীফার দূত জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি কেন প্রস্তাবে রাজী হচ্ছেন না?

১. তিনি ওলীদ বিন আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান বিন হাকাম উমুবি। স্বীয় পিতার পরে ৮৬ হিজরীতে খলীফা নিযুক্ত হন। তিনি পিতার বড় সন্তান ছিলেন। তাঁর জন্ম ৫০ হিজরীতে হয়। তিনি মসজিদে নববীর নির্মাণ এই পর্যন্ত করেন যে হুজরা শরীফ মসজিদের গম্বুজ ভেতর এসে যায়। এই মহান শাসক দুনিয়া থেকে বিদায় নেন ১৫ই জমাদিউস সানী রোজ শনিবার ৯৬ হিজরীতে এবং তাঁর বড় ছেলে আব্দুল আযীয জানাযার নামায পড়ান।
২. ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব সর্বসম্মতিক্রমে তাবেয়ীদের সরদার ছিলেন। তিনি আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কন্যাকে বিয়ে করেন এবং তার থেকে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর জন্ম উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ইত্তিকালের দুই বছর পর হয় এবং ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের ইত্তিকাল ৯৪ হিজরীতে হয়।

সাইদ বিন মুসাইয়্যিব বললেনঃ কেননা খলীফার পুত্রের চরিত্র আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

উত্তরে দূত বললেনঃ আপনি কি সম্মান প্রতিপত্তি ধন-দৌলত অস্বীকার করছেন? আর আমীরুল মু'মিনীনের মর্যাদা আপনার দৃষ্টিতে কোন গুরুত্বই রাখে না?

সাইদ বিন মুসাইয়্যিব (রাহিমাহুল্লাহ) উত্তরে বললেনঃ যেখানে সারা বিশ্ব আল্লাহ তায়ালার কাছে এক মাছির পালকের সমতুল্যও নয় আর আমীরুল মু'মিনীন তো এই মূল্যহীন দুনিয়ার এক অংশ মাত্র।

লোকটি বললেনঃ আমি আপনার ব্যাপারে আশঙ্কা করছি যে খলীফা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

সাইদ বিন মুসাইয়্যিব উত্তর দিলেনঃ

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

অর্থঃ “মু'মিনদেরকে আল্লাহ তায়ালা (শত্রু থেকে) রক্ষা করেন।”
(সূরা হুজ্জঃ ৩৪)

এ উত্তর শুনে খলীফার দূত আফসোস করে ও লজ্জিত হয়ে ফিরে গেলেন।

ইমাম সাইদ বিন মুসাইয়্যিব (রাহিমাহুল্লাহ) মসজিদে নববীতে প্রতিদিন নিজ শিষ্যদের আসর নামাযের পর পাঠ দান করতেন। শিষ্যদের মাঝে আব্দুল্লাহ বিন আবু বিদায়া নামে এক বুয়ুর্গ পরহেজগার যুবকও ছিল। কোন কারণবশতঃ তিনি কয়েকদিন অনুপস্থিত ছিলেন। সেদিন যখন দরস শুরু হলো তখন উস্তাদের দৃষ্টি সেই শিষ্যের উপর পড়ল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ গত কয়েকদিন তোমাকে দেখিনি, তুমি কোথায় ছিলে?

আব্দুল্লাহ বললেনঃ আমার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছেন, তাই আমি বাড়ীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

সাইদ বিন মুসাইয়্যিব (রাহিমাল্লাহ) বললেনঃ আমাদের জানাওনি কেন? জানালে আমরা তোমার শাস্তনার জন্য আসতাম।

আব্দুল্লাহ উত্তরে বললেনঃ শ্রদ্ধেয় উস্তাদ! আমি আপনাকে জানাইনি এজন্য যে, ইলমে নববীর ছাত্রবৃন্দের এই সমষ্টির আপনার কাছে জ্ঞান আহরণ করতে বিঘ্ন সৃষ্টি যাতে না হয়। আপনার সময় খুবই মূল্যবান। আপনার পাঠদান আমার দুঃখে অংশগ্রহণ থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

সাইদ বিন মুসাইয়্যিব বললেনঃ স্ত্রীর মৃত্যুর পর কোথাও কোন বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছ?

আব্দুল্লাহ বললেনঃ আল্লাহ আপনার উপর দয়া করুন, আমাকে কে বিয়ে করবে? আমার কিছু দিরহাম ছাড়া কোন অর্থ সম্পদ নেই।

সাইদ বিন মুসাইয়্যিব বললেনঃ যদি আমি আমার কন্যাকে তোমার সাথে বিয়ে দেই তবে কি তুমি রাযী হবে?

আব্দুল্লাহ হতবাক হয়ে তার দৃষ্টি নত করে নিল। এটা আমি কি শুনতে পাচ্ছি?

সাইদ বিন মুসাইয়্যিবের জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য? তার বিশ্বাস হচ্ছে না। উস্তাদ তাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন এবং প্রিয় শিষ্য মাথা হেলিয়ে হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলেন।

আব্দুল্লাহ স্বয়ং নিজের কথা বর্ণনা দেন যে, আল্লাহর শপথ! উস্তাদের কথায় আমার বিশ্বাস হলো না; কিন্তু হঠাৎ তিনি সকলকেই নিজের কাছে ডেকে নিলেন। সে স্থান ছিল মসজিদে নববী। তিনি নিজের হাত আমার হাতের উপর রাখলেন এবং বিয়ে পড়ানো শুরু করলেন। বিসমিল্লাহ পড়ে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরুদ পড়লেন।

অতঃপর বললেনঃ হে মুসলিম জনতা! তোমরা একথার সাক্ষী হয়ে থাক যে, আমি সাইদ বিন মুসাইয়্যিব নিজ কন্যার বিয়ে নবীর সুন্নত

অনুযায়ী তিন দিরহাম মোহরানায় আব্দুল্লাহ বিন বিদায়ার সাথে দিয়ে দিলাম।

মসজিদে নববীতে তিনি দরস সমাপ্ত করে নিজ বাড়ীতে ফিরে এলেন এবং তিনি তার কন্যাকে কোরআন পাক তেলাওয়াত করতে দেখলেন। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোরআন পাকের মর্মার্থ বুঝতে পারছ?

কন্যাঃ হ্যাঁ আব্বাজান! তবে এখন একটি আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে পারছি না। চেষ্টা করছি বুঝার জন্য।

তিনি বললেনঃ কোন আয়াত তুমি বুঝতে পারছ না?

কন্যাঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

অর্থঃ “এবং তাদের মধ্যে কতিপয় লোক রয়েছে যারা প্রার্থনা করে হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর!” (সূরা বাকারাঃ ২০১)

আমি এটাতো বুঝতে পারছি যে, আখেরাতে কল্যাণ হল জান্নাত; কিন্তু দুনিয়ার কল্যাণ দিয়ে কি বুঝানো হয়েছে?

সাইদ বিন মুসাইয়্যিবঃ হে আমার কন্যা! দুনিয়ার মঙ্গল দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সেই সৎ নারী যে সৎ স্বামীর ঘরে আসে। আর আব্বাহ তোমাকে এক সৎ স্বামী দান করেছেন। সুতরাং আস আমি তোমাকে তোমার শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অতঃপর সাইদ বিন মুসাইয়্যিব (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ কন্যাকে নিয়ে জামাতার ঘরে পৌঁছে যান।

এদিকে আব্দুল্লাহ নিজ ঘরে বসে বিয়ের আয়োজনের ব্যাপারে ভাবছিলেন এমন সময় দরজায় আওয়াজ হল।

জিজ্ঞেস করলেনঃ কে?

উত্তর আসলঃ সাঈদ।

আব্দুল্লাহর বর্ণনাঃ আমি দরজা খোলার জন্য উঠলাম আর আমার মনে হল যে, হয়ত এই বিয়ের ব্যাপারে উস্তাদ কোন কারণবশতঃ স্থগিত করেছেন অথবা মেয়েটিই হয়ত অস্বীকৃতি জানিয়েছে; কিন্তু দরজা খুলে আমি হতবাক হলাম।

আব্দুল্লাহঃ উস্তাদ! এত তাড়াহুড়ার প্রয়োজন ছিল না যার জন্য আপনি এত কষ্ট করলেন।

সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবঃ হে আব্দুল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা এটা অপছন্দ করেন যে কোন ব্যক্তি স্ত্রী ছাড়া এক রাত কাটিয়ে দিক আর এরই মধ্যে শয়তান তার জালে ফাঁসিয়ে দিক। এই তুমি তোমার স্ত্রীকে গ্রহণ করে নাও। আল্লাহ তায়ালা উভয়ের মাঝে বরকত দান করুন। একথা বলে তিনি চলে গেলেন আর নববধূ তার স্বামীর গৃহে প্রবেশ করল।

আব্দুল্লাহ নিজে বর্ণনা দেন যে, আমি যখন মাকে এই বিষয়ে জানাই তিনি তা বিশ্বাস করতে পারেন নি। এরপর তিনি যখন সত্য বাস্তবে দেখতে পেলেন, সীমাহীন আনন্দ প্রকাশ করেন। এরপর আমি ছাদে উঠে প্রতিবেশীদের ডাক দেই।

প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করলেনঃ কি ব্যাপার আব্দুল্লাহ? আমি বললাম বিশ্বখ্যাত আলেম তার কন্যার সাথে আমার বিয়ে দিয়েছেন আর সে এখন আমার বাড়ীতে রয়েছে। এরপর প্রতিবেশী নারী-পুরুষ আমার বাড়ীতে আসলেন। নারীরা নববধূকে সাজাল। আর পুরুষরা আমাকে প্রস্তুত করল। সবকিছুই ইসলামী নিয়মানুযায়ী হল। কোনকিছুই অর্থহীন তামাশামূলক হয়নি।

আমি বাসর ঘরে প্রবেশ করলাম আর আমি আমার সামনে অপূর্ব এক সুন্দরী রমণীকে পেলাম; কোরআনের হাফেজা, হাদীসের আলেমা এবং দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ সচেতন এক নারীকে পেলাম।

অনুযায়ী তিন দিরহাম মোহরানায় আব্দুল্লাহ বিন বিদায়ার সাথে দিয়ে দিলাম।

মসজিদে নববীতে তিনি দরস সমাপ্ত করে নিজ বাড়ীতে ফিরে এলেন এবং তিনি তার কন্যাকে কোরআন পাক তেলাওয়াত করতে দেখলেন। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি কোরআন পাকের মর্মার্থ বুঝতে পারছ?

কন্যাঃ হ্যাঁ আব্বাজান! তবে এখন একটি আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে পারছি না। চেষ্টা করছি বুঝার জন্য।

তিনি বললেনঃ কোন আয়াত তুমি বুঝতে পারছ না?

কন্যাঃ আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

অর্থঃ “এবং তাদের মধ্যে কতিপয় লোক রয়েছেন যারা প্রার্থনা করে হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর!” (সূরা বাকারাঃ ২০১)

আমি এটাতে বুঝতে পারছি যে, আখেরাতে কল্যাণ হল জান্নাত; কিন্তু দুনিয়ার কল্যাণ দিয়ে কি বুঝানো হয়েছে?

সাইদ বিন মুসাইয়্যিবঃ হে আমার কন্যা! দুনিয়ার মঙ্গল দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, সেই সৎ নারী যে সৎ স্বামীর ঘরে আসে। আর আল্লাহ তোমাকে এক সৎ স্বামী দান করেছেন। সুতরাং আস আমি তোমাকে তোমার শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অতঃপর সাইদ বিন মুসাইয়্যিব (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ কন্যাকে নিয়ে জামাতার ঘরে পৌঁছে যান।

এদিকে আব্দুল্লাহ নিজ ঘরে বসে বিয়ের আয়োজনের ব্যাপারে ভাবছিলেন এমন সময় দরজায় আওয়াজ হল।

বিয়ের প্রথম দিনগুলো খুব সুন্দর ছিল। বাস্তবেই সে উত্তম এক স্ত্রী ছিল। এক সপ্তাহ পর সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের সাথে সাক্ষাত হলে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমাদের মেহমানকে কেমন পেলে?

আমি বললামঃ যে পর্যন্ত মানুষ কল্পনা করতে পারে সে পরিমাণ ভাল পেয়েছি। এরপর আমি একদিন আমার স্ত্রীকে বললামঃ “কতদিন হয়ে গেল আমি দরসে যাইনি। আমি আজ থেকে আবার জ্ঞান অন্বেষণে যাব।” সে জিজ্ঞাসা করলো কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা?

আমি বললামঃ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের দারসে যাব।

সে বললঃ আমার কাছে থাকুন! সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের জ্ঞান আমার কাছেই আপনি পাবেন। এরপর আব্দুল্লাহ তার স্ত্রীর কাছে দরস নিতে থাকেন। কিছুদিন পর সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব সাক্ষাতের জন্য আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আব্দুল্লাহ! দরসে আসা বন্ধ করলে কেন?

আব্দুল্লাহ উত্তর দিলেনঃ আমি সাঈদ বিন মুসাইয়্যিবের জ্ঞান তার কন্যার কাছে পেয়ে গেছি।

আল্লাহই রিযিকদাতা

হাতেমুল আসাম' তিনি সে যুগের অনেক বড় বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। হজ্জ যাত্রার ইচ্ছা করলে তার সন্তানদের জানিয়ে দেন যে, আমি হজ্জের জন্য যাত্রা করছি। ঘরের আর্থিক পরিস্থিতি পূর্ব থেকেই কোন রকম খুব স্বাভাবিকরূপে চলে। এখন বাড়ীর একমাত্র রোযগারকারী ব্যক্তি হজ্জের জন্য বের হচ্ছে, তবে তার বাড়ীর সংসার কিভাবে চলবে। তার সন্তানেরা জিজ্ঞেস করলেন যে, আব্বাজান আপনি হজ্জ যাচ্ছেন আমাদের কার কাছে সমর্পণ করে?

হাতেমের উত্তর দেয়ার আগেই এক ছোট্ট শিশু কন্যা উত্তর দিল, ভাইয়েরা! তোমাদের রিযিকের মালিক তোমাদের পিতা নন; বরং তোমাদের প্রভু আর তিনি তোমাদের বিপদে ঠেলে দিবেন না, কেননা আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা আমাদেরকে আল্লাহর সোপর্দ করে যাচ্ছেন।

হাতেমুল আসাম হজ্জের জন্য রওয়ানা হলেন। কিছুদিন পর ঘরে খোরাকী শেষ হয়ে গেল। শিশুরা রাতে অনাহারে কাটাল। হঠাৎ একদিন এমন হলো যে, সে সময়ের গভর্ণর কোন এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছিলেন। হাতেমের বাড়ীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি পানির পিপাসা অনুভব করলেন। তিনি সাথীদের কাছে পানি চাইলেন। হাতেমের বাড়ী কাছেই ছিল। তার সাথীরা হাতেমের বাড়ীর দরজা খটখটালেন এবং পানি চাইলেন। শিশুরা তৎক্ষণাৎ পানি পরিবেশন করল। তিনি পানি পান করে জিজ্ঞেস করলেন, এ বাড়ী কার? বলা হলো, হাতেমের। এরপর তিনি দিরহাম ভর্তি থলে হাতেমের বাড়ীতে নিক্ষেপ করলেন।

গভর্ণর তার সাথীদের বললেনঃ

«مَنْ أَحْبَبَنِي وَافَقَنِي»

1. তিনি অত্যন্ত পরহেযগার, দ্বীনদার ও আবেদ ছিলেন। ইতিহাসে তিনি “এ উম্মতের লোকমান” নামে পরিচিত ছিলেন। অনেক ইতিহাস গ্রন্থেই তাঁর আলোচনা রয়েছে, যেমনঃ সিয়ারু আলামুন নুবালাঃ ১১/৪৮৪, হলইয়াতুল আউলিয়াঃ ৮/৮৩-৮৪।

“যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে সে যেন আমার অনুসরণ করে।”

এবার যারা তার সাথে ছিলেন, সকলেই সামর্থ অনুযায়ী দিরহাম আর দীনার নিষ্ক্ষেপ করতে শুরু করলেন।

বাড়ীর সদস্যরা যখন এই বিশাল সম্পদ দেখতে পেল তখন তারা খুবই আনন্দিত হল যে, কোথায় দারিদ্র আর কোথায় দিরহাম ও দীনারের বৃষ্টি।

ওদিকে হাতেমের ছোট কন্যা শিশুটি এ দৃশ্য দেখে কান্না শুরু করল। বাড়ীর অনেকেই তাকে ধমকালেন যে, আমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা রহমতের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন আর তুমি কাঁদছ।

বালিকাটি উত্তর দিলেনঃ

«مَخْلُوقٌ نَظَرَ إِلَيْنَا فَأَغْتَنَيْنَا فَكَيْفَ لَوْ نَظَرَ الْخَالِقُ إِلَيْنَا؟»

“আল্লাহর সৃষ্টি জীব আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিলেন তাতেই আমরা অল্প সময়ে সম্পদশালী হয়ে গেলাম। যদি এই সৃষ্টির স্রষ্টা আমাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দেন তবে আমাদের সম্পদের পরিস্থিতি কি হবে?”

উল্লেখ্য যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে পরিবার-পরিজনের ব্যয় দিয়ে যাওয়া জরুরী; কিন্তু প্রাচীনকালের এই বুয়ুর্গ আল্লাহর সাথে নিজের গভীর সম্পর্ক এবং তার উপর পরিপূর্ণ ভরসা থাকার দরুণ তিনি কখনো কখনো তার পরিবার-পরিজনকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে চলে যেতেন।

আমানতদারীর এক বিরল দৃষ্টান্ত

ব্যক্তিটির নাম ছিল মোবারক। সে একটি বাগানের মালি হিসেবে বহুদিন থেকে কাজ করছিল। একদিন বাগানের মালিক কতক মেহমান সাথে নিয়ে আসলেন এবং নির্দেশ দিলেনঃ মোবারক! মেহমান এসেছেন, মিষ্টি দেখে কিছু ডালিম নিয়ে এসো। অল্প সময়ের মধ্যে ডালিম পেড়ে নিয়ে আসল। মালিক তা খেতে মুখে দিলে টক পেলেন। সে দ্বিতীয়বার গেল এবং ডালিম নিয়ে আসল; কিন্তু এবারও টক পেলেন।

বাগানের মালিক মালির উপর ভীষণ রেগে গেলেন এবং বললেনঃ তুমি এত বছর যাবৎ বাগানে কাজ করছ অথচ তুমি এখনো পর্যন্ত কোন ধরনের ডালিম মিষ্টি আর কোন ধরনের ডালিম টক তা বুঝতে পারো না।

মোবারক বললঃ আমার মনিব! আমি অবশ্যই তা পার্থক্য করতে পারি না। আমি আজ পর্যন্ত এই বাগানের ফল খেয়ে দেখিনি যে, আমি বুঝতে পারি যে, কোনটি মিষ্টি আর কোনটি টক।

বাগানের মালিক একথা শুনে হতবাক হয়ে বললেনঃ কেন খাওনি?

মোবারক বললঃ আপনি বাগানের দেখা-শুনার দায়িত্বে আমাকে রেখেছেন, আমাকে ফল খাওয়ার অনুমতি আপনি দেননি।

মোবারকের এই উত্তর শুনে মালিক আর তার মেহমানগণ সকলেই হতবাক।

মালিকের কন্যা বিয়ের উপযুক্ত বয়সে পৌছে গিয়েছিল। আর তার জন্য পাত্র খোজা হচ্ছিল। হঠাৎ তার ভাবনায় আসল যে আমার কন্যার উপযুক্ত মোবারকের থেকে অন্য কেউ হতে পারে না।

তিনি মোবারককে বললেন যে, আমি যদি তোমাকে আমার জামাতা হিসেবে গ্রহণ করি তবে তোমার কি মতামত?

সে বললঃ যে, ইয়াহুদীরা বিয়ের জন্য কন্যা পক্ষের সম্পদশালী হওয়াটাকেই প্রাধান্য দেয় আর খ্রিস্টানরা সৌন্দর্যকে, আর উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার লোকেরা পরহেযগারী আর ধার্মিকতাকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করে।

মালিক তার এই উত্তর শুনে আরো বেশী প্রভাবিত হলেন। বাড়ীতে এসে নিজ পরিবারের সাথে পরামর্শ করলেন। তিনি বললেন, আমার দৃষ্টিতেও মোবারকের থেকে ভাল সম্পর্ক মেয়ের জন্য কোথাও পাবো না।

এভাবে মোবারকের বিয়ে সেই বাগানের মালিকের কন্যার সাথে হয়ে গেল। এরপর এই মোবারক জোড়াকে আব্বাহ তায়াল্লা নিজেই বরকত দান করেছেন। তাদের কাছে এক সন্তান আসল। তার নাম তারা আব্দুল্লাহ রাখলেন যিনি বড় হয়ে এক বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস হলেন এবং যিনি নিজ জ্ঞানের দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করেন। গোটা মুসলিম বিশ্ব আজ তাকে ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মোবারক (রাহেমাহুল্লাহ) নামেই জানেন।

এক ঈমান বিক্রেতার ঘটনা

এই ঘটনাটি ইমাম কুরতুবী (রাহেমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ মিশরের কোন এক মসজিদে এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল থেকে মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করছিল। লোকজন তার পরহেযগারী আর পবিত্রতায় তার উদাহরণ দিত। তার চেহারা থেকে নূর বলকিত।

মসজিদের এক কোণায় সুউচ্চ মিনারা ছিল। সে পাঁচ ওয়াক্ত এই মিনারায় চড়ত এবং সুউচ্চ কণ্ঠে আযান দিত। তার উঁচু আওয়াজের সুললিত কণ্ঠের আযান চারিদিকে বয়ে যেত।

একদিন আযানের জন্য মিনারায় উঠল এবং হঠাৎ সে নীচের দিকে দৃষ্টি ফেলল। এক খ্রিস্টানের বাড়ী মসজিদের পাশেই ছিল। মিনারা থেকে বাড়ীর আঙ্গিনা পরিস্কার দেখা যেত। আঙ্গিনায় তার দৃষ্টি পড়লে এক অতি সুন্দরী মেয়ে বসা দেখতে পেল। তৎক্ষণাৎ সে সুন্দরীর জালে বন্দী হয়ে গেল। সে আযান না দিয়ে নীচে আসল এবং খ্রিস্টানের বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হল।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করলঃ তুমি কে এবং কি চাও?

মুয়াজ্জিন বললঃ আমি তোমার সৌন্দর্য দেখে আমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। আমি সর্বাবস্থায় তোমাকে চাই।

মেয়েটি বললঃ আমি তোমার ভালোবাসার উত্তর হ্যাঁ বোধক দিচ্ছি; কিন্তু এখানে একটি বড় বাঁধা রয়েছে।

মুয়াজ্জিন বললঃ বল, আমি সব বাঁধা অতিক্রম করতে প্রস্তুত আছি।

‘আমার বাবা তোমার সাথে আমার বিয়ে দিতে কখনো রাজী হবেন না। কেননা তুমি মুসলিম আর আমি খ্রিস্টান, মেয়েটি বলল।

মুয়াজ্জিনঃ তবে এর সমাধান কি? আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না।

মেয়েটিঃ এর একটিই সমাধান, তা হল যে, তুমি ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর।

মুয়াজ্জিনঃ আমার কোন আপত্তি নেই। আমি তোমার জন্য যে কোন ধর্মই গ্রহণ করতে পারব।

মেয়েটিঃ তা যদি হয় আমি তোমার সাথে বিয়েতে রাজি আছি। এরপর সেই বদবখত মুরতাদ হয়ে গেল এবং খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে নিল। তার বিয়ের আয়োজন হল। সে খুব আনন্দিত ছিল যে, তার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। এবার তার প্রেমিকার সাথে একাকিত্বে সাক্ষাতের পালা।

অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালার ফয়সালাও নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। সে কোন কাজে ছাদে উঠল তার পা পিছলে গেল এবং সে ছাদ থেকে পড়ে জাহান্নামে পৌঁছে গেল। একেই বলে খারাপ পরিণতি, যে সে বদনসীবের প্রেমিকাও হাসেল হল না আর তার আখেরাতও বিনষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের উপর করুক।^১

১. এই ঘটনা ইমাম কুরতুবীর কিতাব আততায়কিরাঃ ১/৫৪ তে রয়েছে।

আমি যমীন-আসমানের অধিপতিকে

লজ্জা পাই

খলীফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের এক মুয়াজ্জিন ছিল। যে খেলাফত ভবনে পাঁচ ওয়াক্ত আযান দিত। একবার খলীফার দাসী তার দরবারে অভিযোগ করল যে, আপনার মুয়াজ্জিন আমার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকায়।

খলীফা সুলাইমান খুব আত্মমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মুয়াজ্জিনকে শাস্তি দিতে চাইলেন। সুতরাং তিনি দাসীকে নির্দেশ দিলেনঃ তুমি সুন্দর পোষাক পরে তার কাছে যাও এবং বল যে আমি তোমায় ভালবাসি এবং আমি তা স্বীকার করছি। খলীফাকে ভয়ের কোন কারণ নেই কেননা তিনি জানতেই পারবেন না যে, আমরা পরস্পর ভালবাসি। এধরণের কথা শিখিয়ে দিয়ে দাসীকে মুয়াজ্জিনের কাছে পাঠালেন। সে এসব কথা মুয়াজ্জিনকে বললে মুয়াজ্জিন তার চেহারা আকাশের দিকে করলেন এবং বললেনঃ

«يَا جَلِيلُ؛ أَيْنَ سِتْرُكَ الْجَمِيلُ؟»

অর্থঃ “হে প্রভু! তোমার পর্দা কোথায় যে, আমি তাতে আত্মগোপন করব?”

এরপর দাসীকে বললেন যে, দ্বিতীয়বার কখনো আমার কাছে আসবে না। শীঘ্রই আমাদের এমন সত্তার কাছে পৌঁছতে হবে যিনি কখনো ধোকাই পড়েন না।

মুয়াজ্জিন কথা শুনে দাসী খলীফার কাছে ফিরে গিয়ে মুয়াজ্জিনের সাথে কথোপকথন সম্পর্কে জানালেন।

খলীফা সেই মুয়াজ্জিনের কথায় খুব প্রভাবিত হয়। তিনি মুয়াজ্জিনকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন যে আমি তোমাকে অমুক দাসীর সাথে বিয়ে দিতে চাই। আর খরচের জন্য পঞ্চাশ হাজার দিরহামও উপহার দিচ্ছি।

মুয়াজ্জিন বললেনঃ আমীরুল মু'মিনীন! আমি শ্রদ্ধার সাথে আপনার দেয়া উপহার ফেরত দিচ্ছি। আমাকে তা থেকে দূরেই রাখুন। আল্লাহর শপথ! আমার দৃষ্টি যখন প্রথম তার দিকে পড়ল আমি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি এবং আমার অন্তরে তাকে পাওয়ার ইচ্ছা জাগল; কিন্তু সাথে সাথে আমার মধ্যে মহান প্রভুর ভীতি সৃষ্টি হল। যার ফলে আমি আমার চাওয়া ভুলে গেলাম। তার চিন্তা স্বীয় অন্তঃ হতে বের করে দেই এবং সেই আকাজক্ষাকে মহান প্রভুর নিকট জমা করে রাখি। সুতরাং এখন যদি পুনরায় আপনার উপহার গ্রহণ করতে যায় তবে আমি যমীন আসমানের অধিপতিকে লজ্জা পাই। কেননা যে জিনিসকে আমি তাঁর নিকট জমা রেখেছি তা পুনরায় ফিরিয়ে নেয়া অসম্ভব।

খলীফা বারবার তাকে উপহার গ্রহণ করতে বললে তা সে গ্রহণ না করায় তিনি খুবই আশ্চর্য হন এবং অনেকবার তা স্বীয় সহচরদেও নিকট আলোচনা করেন।

এক আত্মমর্যাদাপূর্ণ স্বামী

সে এক নারী। যে পরিপূর্ণ পর্দার সাথে কাজীর সামনে দাঁড়িয়েছিল। সে তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রেখেছিল যে, আমার স্বামী আমার মোহরানা পাঁচশ দীনার আদায় করছেন না।

কাজী সাহেব স্বামীর কাছে এর সত্যতা জিজ্ঞেস করলে সে তা অস্বীকার করে। আদালত এবার সাক্ষী তলব করেন।

নারীটি কতিপয় সাক্ষী পেশ করলেন। সাক্ষীগণ বললেন, আমরা মহিলার চেহারা দেখেই সাক্ষী দিব যাতে বুঝতে পারি যে, আমরা যে মহিলার সাক্ষীর জন্য এখানে এসেছি এটা সেই মহিলা।

আদালত নির্দেশ দিল যে, মহিলাটি চেহারার হিজাব তুলে নিক যাতে সাক্ষীর চিনতে পারে। এদিকে মহিলাটি ইতঃস্ত করছিল যে, সে পর্দা খুলবে কিনা?

হঠাৎ তার আত্মমর্যাদাশীল স্বামী বলে উঠলেনঃ আমি এটা কখনো মেনে নিতে পারি না যে, কোন ব্যক্তি আমার স্ত্রীর চেহারা দেখুক। আর সাক্ষীদের আমার স্ত্রীর চেহারা দেখারও কোন প্রয়োজন নেই। তার মোহরানা সত্যি সত্যিই আমার জিম্মায় রয়েছে।

আদালত এখনই ফয়সালা দিতে প্রস্তুত হতে না হতেই মহিলাটি বলে উঠলঃ শ্রদ্ধেয় বিচারপতি! যদি আমার স্বামী আমার চেহারা অন্য কেউ দেখুক তা বরদাশত করতে না পারে তাহলে আমিও তার অপমান বরদাশত করতে পারব না।

সুতরাং মামলা খারিজ করে দিন। আমি আমার মোহরানা ক্ষমা করে দিলাম। আমি এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে ভুলই করেছি।^১

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের কন্যার প্রশ্ন আর ইমাম শাফেয়ীর উত্তর

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রাহিমাল্লাহ) নিজের পরিবার-পরিজনের সাথে ইমাম শাফেয়ীর পাণ্ডিত্য ও অগাধ জ্ঞান ও পরহেযগারী সম্পর্কে প্রায়ই বর্ণনা করতেন।

একদিন আহমাদ (রাহিমাল্লাহ) ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাল্লাহ)-কে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানলেন। ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাল্লাহ) আসলেন এবং রাতের খাবার খেয়ে মেহমান খানায় গিয়ে তৎক্ষণাৎ বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহ)-এর কন্যা সকালে পিতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আব্বাজান! তিনি কি ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাল্লাহ) যার সম্পর্কে আপনি আমাদের কাছে প্রায়ই বর্ণনা করে থাকেন?

ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহ) বললেনঃ হ্যাঁ।

ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহ)-এর কন্যা বললেনঃ আমি তার মাঝে তিনটি এমন বিষয় দেখেছি যা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে।

ইমাম আহমাদ (রাহিমাল্লাহ) বললেনঃ তা কি কি?

কন্যা বললঃ

প্রথমতঃ তিনি রাতের খাবার খুব পেট ভরে খেয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ খাবার খেয়ে তিনি মেহমান খানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। রাতে তিনি তাহাজ্জুদের নামাযও পড়েন নি।

তৃতীয়তঃ তিনি ফজরের নামায ওয়ূ ছাড়াই আমাদের পড়িয়েছেন। পানির পাত্র যা ওয়ূর জন্য রাখা হয়েছিল, তাতে তিনি হাতও লাগান নি।

ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) কন্যার সব কথা শুনলেন আর ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে এই তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা চাইলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) ব্যাখ্যা দিচ্ছেনঃ আহমাদ! আমি অধিক পরিমাণ খাবার এজন্যই খেয়েছি কেননা আমার বিশ্বাস যে, আপনার খাবার হালাল, আপনার জীবিকা হালাল আর আপনি দানশীলও, আর দানশীল ব্যক্তির খাবার চিকিৎসা স্বরূপ আর কৃপণের খাবার অসুস্থতা নিয়ে আসে। আর আমি পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য বেশী খাবার খাইনি; বরং তা খেয়েছি শারীরিক সুস্থতার জন্য।

দ্বিতীয়তঃ কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ পড়িনি এজন্য যে, প্রকৃত পক্ষে আমার মাথা শোয়ার জন্য বালিশে রাখলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কতক হাদীস আমার মাথায় আসল। আমি তাতে গবেষণা শুরু করলাম এবং তা থেকে ৭২টি মাসয়ালা (ফিকহি মাসায়েল) উদ্ভাবন করেছি যার দ্বারা মুসলিম জাতি উপকৃত হতে পারবে। এজন্য আমি তাহাজ্জুদ নামাযের সুযোগ পাইনি।

তৃতীয়তঃ আর ওয়ূ ছাড়া নামায পড়ানোর যেই কথা তবে শোন! আল্লাহ তায়ালার কসম! আমি সারাটি রাত চেতনায় ছিলাম। ঘুম আমার চোখে মোটেও আসল না। সুতরাং নতুন করে ওয়ূর প্রয়োজন পড়েনি। এ কারণে আমি এশার ওয়ূর দ্বারাই তোমাদেরকে ফজরের নামায পড়িয়েছি।

এ ছিল উম্মতের শিরোমণিদের পবিত্র জীবনের এক ঝলক!

ফেরাউনের মন্ত্রীবর্গ তাদের থেকে উত্তম ছিল

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে পরাজিত করার পর নিজ মজলিসে বসা ছিলেন। তিনি তাঁর দারওয়ানকে আহ্বান করলেন এবং বললেনঃ সেই হারুরিয়া মহিলাকে আমার দরবারে উপস্থিত কর।

(হারুরিয়া খারেজী সম্প্রদায়ের এক গ্রুপ যা কুফার কাছে হারুরা স্থানের প্রতি নিসবত হয়েছে সেই স্থানে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বৈঠক হয়েছিল। এই দল দ্বীনের মধ্যে চরম পন্থা অবলম্বন করত পরবর্তীতে তারা ধর্ম ত্যাগ করে।)

যখন সেই মহিলা হাজ্জাজের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমিই কি সেই নারী যে গতকাল পর্যন্ত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে থেকে লোকদেরকে আমাকে ও আমার সাথীদেরকে হত্যা করতে এবং ধন-সম্পদ লুটে নিতে উদ্বুদ্ধ করছিলে।

মহিলাটি উত্তর দিলঃ হ্যাঁ আমি এমনটিই করছিলাম। মহিলাটির এরূপ উত্তর শুনে হাজ্জাজ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে মন্ত্রীদের দিকে তাকিয়ে তাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ এই মহিলাটির ব্যাপারে তোমাদের কি মতামত?

মন্ত্রীবর্গ বললেনঃ একে এখনই হত্যা করে দিন।

যখন মহিলাটি একথা শুনল সে হা হা করে হেসে দিল এবং হাজ্জাজ আর তার মন্ত্রীদের উপহাস করতে লাগল। হাজ্জাজের চেহারা রেগে লাল হয়ে গেল।

এরপর সে জিজ্ঞেস করলঃ তোমার হাসার কি কারণ?

মহিলাটি উত্তর দিলঃ আমি লক্ষ্য করছি যে, ফেরাউনের মন্ত্রীবর্গ তোমারি এই মন্ত্রী পরিষদ থেকে উত্তম ছিল।

একথা শুনে হাজ্জাজ মন্ত্রীদের প্রতি তাকিয়ে দেখল যাদের চেহারা য লজ্জার আলামত ভাসছিল।

হাজ্জাজ মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলঃ এটা কিভাবে হতে পারে?

মহিলাটি উত্তর দিলঃ যখন ফেরআউন তার মন্ত্রীদের কাছে মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে হত্যার ব্যাপারে পরামর্শ চাইল তখন ফেরআউনকে তারা এই পরামর্শ দিল,

﴿أَرْجِهْ وَأَخَاهُ﴾

অর্থাৎ “মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং তার ভাইয়ের ব্যাপার অন্য কোন সময়ের জন্য রেখে দিন (যাতে করে তাদের ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়)।” (সূরা শুয়ারাঃ ৩৬)

কিন্তু তোমার এসব মন্ত্রীবর্গ তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছে যে শীঘ্রই আমার রক্তে তোমার তরবারী রঞ্জিত হয়ে যাক। এর দ্বারা আমি বুঝতে পারছি যে, তোমার মন্ত্রীগণ ফেরআউনের মন্ত্রীদের তুলনায় অনেক বেশী বোকা।

মহিলাটির এধরণের কথা হাজ্জাজ শুন্য পর অনিচ্ছায় মুচকি হাসলেন। তার কাছে মহিলাটির কথার অনেক ওজন মনে হল। তিনি এই মহিলাকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাকে দিরহাম ও দীনার উপহার হিসেবে দান করেন।

এক নারীর তাৎক্ষণিক অভিযোগ দায়ের

আব্দুল্লাহ বিন মুসআব বর্ণনা করেন যে, আমীরুল মু'মিনীন উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর যুগে লোকজন মোহরানা অনেক বেশী ধার্য করা শুরু করল। একদিন তিনি লোকজনকে বললেন যে, তোমরা নারীদের মোহরানা চল্লিশ ওকিয়া থেকে বেশী ধার্য করো না যদিও সেই মহিলা কোন বড় নেতৃস্থানীয় লোকের কন্যা হয়ে থাকে। যদি কেউ এর বেশী ধার্য করে তবে আমি তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সোপর্দ করব।

এক মহিলা একথা শুনে বললেনঃ আপনি কে, যে চল্লিশ ওকিয়া পর্যন্ত মোহরানা নির্ধারণকারী অথচ আব্দুল্লাহ তায়ালা এর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করেন নি?

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেনঃ তা কিভাবে হতে পারে?

মহিলাটি উত্তরে বললেনঃ এজন্য যে, আব্দুল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারীমে এরশাদ করেনঃ

﴿وَأَتَيْنَهُمْ إِحْدَنَهُنَّ وَقِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾

অর্থঃ “যদি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের কাউকে মোহরানা হিসেবে সম্পদের বিশাল ভাণ্ডারও দিয়ে থাক তাও তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না।” (সূরা নিসাঃ ২০)

একথা শুনে উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«أَصَابَتْ امْرَأَةً وَأَخْطَأَ عُمْرُ، كُلُّ النَّاسِ أَفْقُهُ مِنْكَ يَا عُمَرُ»

“মহিলার উপস্থাপনা সঠিক আর উমর তা বুঝতে পারেনি। হে উমর! সকলেই তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান।”

আমাদের সমাজে বিয়ের সময় কখনো কখনো শরীয়তের মোহরানা শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে যা সাধারণত ৩২ রূপি হয়ে থাকে এটা ঠিক নয়। শরীয়ত মোহরানার কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। যেমন উল্লেখিত ঘটনায়

বর্ণনা করা হয়েছে। ছেলের মান অনুযায়ী মোহরানা ধার্য করা হবে। যদি মেয়ে অথবা মেয়ের বাবা রাজী থাকে তবে স্বল্প মোহরানা সঠিক হবে, যেমনঃ ইমাম সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রাহিমাহুল্লাহ) নিজ কন্যার মোহরানা শুধুমাত্র তিন দিরহাম ধার্য করেছিলেন; কিন্তু যদি ছেলে বিত্তশালী হয়ে থাকে বাড়ী-গাড়ীর মালিক হয়ে থাকে বিয়ের অনুষ্ঠানে লাখ লাখ টাকা খরচ করে দেয় এমতাবস্থায় পরস্পরের রাজি-খুশীতে যা ধার্য করা হবে তাই সঠিক। এরপর এ নিয়ে কোন ঝগড়া-বিবাদে যাওয়া যাবে না।

মোটকথা, এটি মেয়ের অধিকার। অতএব তা সমপর্যায়ের মেয়েদের অনুরূপ যথাযথ মোহরানা পাওয়া উচিত।

(সঠিক অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই অবগত আছেন।)

সাহসিকতা পূর্ণ উত্তর

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী উম্মে আলকামা নামে এক রমণীর সাথে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলতে ছিল। কথোপকথনের মাঝে মহিলাটি এক মুহূর্তের জন্যও হাজ্জাজের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখলেন না।

হাজ্জাজ মহিলাটিকে বললেনঃ আমি তোমার সাথে এক ঘণ্টা প্রায় কথা বলছি; কিন্তু তুমি একবারও আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলনি।

সেই মহিলাটি নির্দিধায় উত্তর দিলেনঃ

«أَكْرَهُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ»

অর্থঃ “আমি এমন ব্যক্তির দিকে তাকানো পছন্দ করি না যার দিকে আল্লাহ তাকান না।” (আলামুন নেসাঃ ৪/২২৮)

উত্তরাধিকারের সুষ্ঠু বণ্টন

খলীফা মামুনুর রশীদ খেলাফত ভবনে তার মন্ত্রীবর্গ আমীরগণ এবং উলামাদের সাথে বসা ছিলেন। এক মহিলা প্রবেশ করলেন এবং বললেনঃ আমীরুল মুমিনীন! আমার উপর যুলুম করা হয়েছে। আমার প্রতি ইনসাফ করুন।

খলীফা জিজ্ঞেস করলেনঃ বল তোমার সাথে কি অন্যায় করা হয়েছে।

সে বলতে লাগলঃ আমার ভাই ইস্তেকাল করেছে। সে ৬০০ দীনার রেখে গেছে, তা থেকে আমি শুধু এক দীনার পেয়েছি। এখন বলুন ৬০০ দীনারে বোনকে শুধুমাত্র এক দীনার এ অন্যায় নয় কি?

মামুনুর রশীদ অল্পক্ষণ ভাবলেন, এরপর বললেন তোমার পাওনা এক দীনারই। তোমার অংশে এক দীনার আসবে। শুন তোমার ভাই দু'টি কন্যা সন্তান, মা, স্ত্রী, বারজন ভাই এবং এক বোন (আর সে তুমি) রেখে গেছেন।

মহিলাটি বললঃ আপনি নিশ্চয় সঠিক বলেছেন।

মামুন বললেনঃ শুন! এর বণ্টন কিভাবে হবে। দু'টি কন্যা সন্তানের ওয়ারাসাতের অংশ দুই তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চারশত দীনার হয় যা তারা পেয়েছে। মার জন্য এক ষষ্ঠাংশ আর তা হল ১০০ দীনার। স্ত্রীকে এক অষ্টমাংশ ৭৫ দীনার দেয়া হয়েছে। এখন বাকী থাকে ২৫ দীনার। ১২ ভাই দু' দু' দীনার করে ২৪ দীনার পাবে। এরপর এক দীনার বাকী থাকে যা তুমি উত্তরাধিকারে পেয়েছ।

খলীফা মামুনুর রশীদের এরূপ সমাধান দেয়াতে উপস্থিত সকলেই তার বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানগর্ভে হতবাক।

খলীফা মামুনের চমৎকার শিকারী

আবু আব্দুল্লাহ নুমাইরির বর্ণনাঃ আমি একদিন খলীফা মামুনের কাছে কুফায় ছিলাম। তিনি এক প্রাটুন সৈন্য সাথে নিয়ে শিকারে বের হলেন। তিনি যে মুহূর্তে বাড়ী ফিরছিলেন তখন এক শিকার দৃষ্টিতে পড়ল। তিনি নিজের ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলেন এবং ঘোড়াকে শিকারের পিছনে ছুটালেন। শিকার প্রাণ বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে ছুটছিল।

খলীফার ঘোড়া শিকারের পেছন ছুটতে ছুটতে ফোরাত নদীর তীরে পৌঁছে গেল; কিন্তু শিকার হাত ছাড়া হয়ে গেল।

হঠাৎ এক বেদুঈন যুবতী দৃষ্টিতে পড়ল যে গঠন-গড়নে খুবই সুন্দরী ছিল। সে এক মশক পানি ভর্তি করে নদীর তীর দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার পা পিছলে গেল আর সে চিৎকার করে বলে উঠলঃ

«يَا أَبَتِ! أَدْرِكُ فَاهَا قَدْ غَلَبَنِي فُوهَا، لَا طَاقَةَ لِي بِفِيهَا»

অর্থঃ “আব্বাজান! আমার মশকের মুখ ধরে ফেলুন এর মুখ আমার হাত থেকে ছুটে গেল আর আমি এর মুখ ধরে রাখার শক্তি আমার নেই।”

মেয়েটির সাহিত্যপূর্ণ ও সুন্দরভাবে সাজানো শব্দাবলী দিয়ে বাক্য উচ্চারণে খলীফা আশ্চর্যবোধ করলেন। এদিকে মেয়েটি পানির পাত্র ফেলে দিল।

খলীফা মামুন অগ্রসর হয়ে মেয়েটির কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ

«يَا جَارِيَّةُ! مِنْ أَيِّ الْعَرَبِ أَنْتِ؟»

অর্থঃ “এই মেয়ে! তুমি আরবের কোন বংশের?”

মেয়েটি উত্তর দিলঃ

«أَنَا مِنْ قَوْمٍ كِرَامٍ، غَيْرُ لِثَامٍ، يَقْرُونَ الضَّيْفَ وَيَضْرِبُونَ
بِالسَّيْفِ»

অর্থঃ “আমি বনু কিলাবের বংশ থেকে যে বংশের লোকেরা খুবই ভদ্র ও মর্যাদাশীল। মেহমানদের আপ্যায়ন করা তাদের বৈশিষ্ট্য এবং শত্রু পক্ষকে তরবারীর আঘাতে পরাস্ত তাদের নীতি।”

এরপর সে বললঃ জনাব! আপনার সম্পর্ক কোন বংশের সাথে?

খলীফা মামুনঃ সব আরবের বংশ সম্পর্কে কি তোমার ধারণা আছে।

বেদুঈনঃ কিছু ধারণাতো অবশ্যই আছে।

খলীফা মামুনঃ আমি মুযার গোত্রের।

বেদুঈনঃ মুযারের কোন শাখা?

খলীফা মামুনঃ মুযারের সে বংশ যার বংশানুক্রম মর্যাদাপূর্ণ, বিরল মহত্ব এবং মা-বাবা উভয়ের বংশানুক্রম মর্যাদাপূর্ণ। যাদেরকে অন্য সকল গোত্র ভয় করে চলে। আর যাদের সম্মান ও মর্যাদা সবার কাছে গ্রহণীয়।

বেদুঈনঃ আমার ধারণা আপনি বনু-কেনানার বংশ থেকে?

খলীফা মামুনঃ তোমার ধারণা সঠিক।

বেদুঈনঃ কেনানার কোন উপশাখার সাথে আপনার সম্পর্ক?

খলীফা মামুনঃ যাদের সন্তান সম্মান ও মর্যাদার পাত্র হয়ে থাকে। যারা বাস্তবেই উদার মনের মানুষ। দান করা যাদের বৈশিষ্ট্য এবং যাদের ভীতি কেনানার সকল গোত্রেই রয়েছে।

বেদুঈনঃ হ্যাঁ এবার বুঝেছি আপনার সম্পর্ক কুরাইশের সাথে।

খলীফা মামুনঃ তুমি সঠিক বুঝেছ।

বেদুঈনঃ কুরাইশের কোন উপশাখা থেকে?

খলীফা মামুনঃ যার চর্চা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে রয়েছে। যার গৌরব ও মর্যাদার অন্য উদাহরণ নেই এবং যার ভীতি কুরাইশের অন্য সকল গোত্রের উপর প্রভাবশালী।

বেদুঈনঃ আল্লাহর কসম! আপনি বনু হাশেম গোত্রের।

খলীফা মামুনঃ সম্পূর্ণ সঠিক।

বেদুঈনঃ বনু হাশেমের কোন বাড়ির সাথে আপনার সম্পর্ক?

খলীফা মামুনঃ যেই বাড়ির মর্যাদা সুখ্যাত ও সর্বোচ্চ। যার ভীতি বনু হাশেমের সকল বংশের উপর রয়েছে। একথা শুনে মেয়েটি বলে উঠলঃ

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَخَلِيفَةَ الْمُسْلِمِينَ»

অর্থঃ “আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক হে আমীরুল মু’মিনীন ও খলীফাতুল মুসলিমীন।”

বেদুঈন মেয়েটির বুদ্ধিমত্তা ও বংশের বিষয়ে এত পরিমাণ ধারণায় খলীফা মামুনকে খুব বেশী প্রভাবিত করেছে।

তিনি বললেনঃ

«وَاللَّهِ! لَا تَزَوَّجَنَّ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِأَنَّهَا مِنْ أَكْبَرِ الْغَنَائِمِ»

অর্থঃ “আল্লাহর কসম! আমি এই মেয়েটিকে অবশ্যই বিয়ে করব কেননা সে অনেক বড় সম্পদ। খলীফা সেখানে তার সৈন্যদের অপেক্ষায় ছিলেন। এরই মধ্যে তারা সেখানে পৌঁছে গেল। এরপর খলীফা মামুন সেই মেয়েটির মা-বাবাকে বিয়ের প্রস্তাব জানালেন। তারা অতি আনন্দে

মেয়েটিকে বিয়ে দিতে রাজি হলেন। এরপর তিনি বিয়ে করে আনন্দের সাথে ফিরে এলেন। যেখানে তিনি তো এক শিকারকে হারিয়েছেন; কিন্তু সেখানেই এক পরমা সুন্দরী শিকারী তার ভাগ্যে জুটে গেল যা উক্ত শিকার থেকে অনেক গুণ বেশী ছিল। এই মেয়েটি খলীফা মামুনের পুত্র আব্বাসের মা হন।”^১

সন্তানকে অনৈতিক আচরণের সুযোগ কেন দিয়েছ?

উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দরবারে এক ব্যক্তি নিজ পুত্রের অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হল। অভিযোগ শুন্যর পর উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। যখন সে উপস্থিত হল আর উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পিতার সাথে নাকফরমানি এবং বাবার অধিকার সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

ছেলেটি বললঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! পিতার উপর সন্তানেরওতো কিছু অধিকার আছে?

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ হ্যাঁ আছে।

ছেলেটি বললঃ সেই অধিকারগুলো কি?

উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«أَنْ يَنْتَقِيَ أُمَّهُ، وَيُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيَعْلَمَهُ الْقُرْآنَ»

অর্থঃ “তার মাকে তার বাবা সঠিকরূপে নির্বাচন করবে এবং তার ভাল নাম রাখবে এবং তাকে কুরআনুল কারীম শিক্ষা দিবে।”

ছেলেটি বললঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার বাবা এর একটিও করেন নি। আমার মা জানজিয়া (কালোজাতি) যে কোন অগ্নি উপাসকের কাছে ছিলেন। আমার বাবা আমার নাম জাআল রেখেছেন (যার অর্থ হলঃ সংকীর্ণ নাকওয়ালা, খারাপ আকৃতির এবং কালো, ঝগড়াটে ইত্যাদি)।

ছেলেটির কথা শুনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে বললেনঃ

«جِئْتَ إِلَيَّ تَشْكُو عُقُوقَ ابْنِكَ وَقَدْ عَقَّقْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْقَكَ،
وَأَسَأْتَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْكَ»

অর্থঃ “তুমি আমার কাছে তোমার নিজের সম্ভানের অভিযোগ নিয়ে আমার দরবারে এসেছ, অথচ তুমি তার অনৈতিক আচরণের আগেই তুমি তার অধিকার রক্ষা করেনি। সে তোমার সাথে অন্যায় করার আগেই তুমিই তার সাথে অন্যায় করেছ।”

কুরাইশ বংশের রমণীগণ

উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচাত বোন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুয়তের আগে নিজের চাচার কাছে উম্মে হানীর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দেন; কিন্তু বিশেষ কিছু কারণে তিনি অস্বীকার করেন এবং তার বিয়ে অন্য কোথাও হয়ে যায়। এরপর এমন এক সময় আসল যখন তিনি বিধবা হয়ে গেলেন। স্বামী মৃত্যুবরণ করল। আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বড়ই আশা ছিল যে, যদি তার বিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হয়ে যেত তবে কতইনা ভাল হত।

সুতরাং আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সুযোগ পেয়ে একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে প্রস্তাব রাখলেন যে যদি আপনি উম্মে হানী বিনতে আবু তালিবকে বিয়ে করেন তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে দু'টি আত্মীয়তার সম্পর্কে পুরস্কৃত করবেন। সে আগে থেকেই আপনার চাচাত বোন আর দ্বিতীয়ত আপনার সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর পরামর্শ পছন্দ করলেন এবং উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তিনি প্রস্তাবের উত্তর দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়। উনার অধিকারও গুরুত্বপূর্ণ। আমার সন্তানগণ ইয়াতীম, যাদের আমি প্রতিপালন করি। আমি ভয় করি যে, যদি আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হক্ক আদায় করতে যাই তবে আমার ইয়াতীম সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্বে অবহেলা আসবে। আর যদি তাদের দায়িত্ব পূর্ণ করতে যাই, তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন উম্মে হানী (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর উত্তর শুনলেন তখন খুবই খুশি হলেন এবং এরশাদ করলেনঃ

«نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرٌ نِّسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، أَخْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ،
وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ»

অর্থঃ “কুরাইশদের রমণীগণ অন্যান্য সকল নারীদের চেয়ে উত্তম উটের উপর আরোহণও করতে পারে আবার ছোট শিশুদের প্রতিও যত্নশীল ও দয়াবান। আর নিজের স্বামীর কাজেও পরিপূর্ণ সহায়তা করে থাকে।”^১

মেহমানের খোঁজে

সুলাইমান কুরাশীর বর্ণনা ইয়ামানে আবাসিক এলাকার এক রাস্তায় হেটে চলছিলাম। হঠাৎ এক ছেলে আমার সামনে পড়ল যে তার দু'কানে দু'টি বালা পরিয়ে রেখেছিল। সে কিছু কবিতার মাধ্যমে স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসা করছিল। প্রতিটি বালায় মূল্যবান পাথর লাগানো ছিল। যার কারণে তার চেহারা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর দেখাচ্ছিল।

আমি তাকে এই কবিতা আবৃত্তি করতে শুনিঃ

مَلِيكَ فِي السَّمَاءِ بِهِ افْتِخَارِي عَزِيزُ الْقَدْرِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءُ

অর্থঃ “আসমানে যেই বাদশায় রয়েছেন তারই করুণায় আমার মর্যাদা ও সম্মান আমি পেয়েছি। তিনি মহাপরাক্রমশালী তার কাছে বিশ্বজগতের কিছুই গোপন নেই।”

আমি তার কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিলাম।

সে বললঃ আমি তোমার সালামের উত্তর ততক্ষণ পর্যন্ত দিব না যতক্ষণ না তুমি আমার হক্ক আদায় কর যা তোমার উপর ওয়াজিব।

আমি জিজ্ঞেস করলামঃ আচ্ছা তোমার কোন অধিকার আমার উপর আছে?

ছেলেটি উত্তর দিলঃ আমি ইব্রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)-এর সুনুতের উপর আমল করি। আমার প্রতি দিনের নিয়ম হল যে আমি খাবার ততক্ষণ পর্যন্ত খাইনা যতক্ষণ না আমি এক মাইল অথবা দু'মাইল কোন মেহমানের খোঁজে বের হই যে আমার সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করে।

আমি ছেলেটির কথা মেনে নিলাম। সে আমাকে আবেগভরে স্বাগত জানাল। যখন আমরা তার চুল নির্মিত তাবুতে পৌঁছলাম তখন সে উচু কণ্ঠে আওয়াজ দিল। আওয়াজ শুনে এক যুবতী মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসল।

ছেলেটি বললঃ আমাদের মেহমানের জন্য সবকিছুর আয়োজন কর। মেয়েটি উত্তর দিল একটু অপেক্ষা কর আমি একটু দয়াবান প্রভুর শুকরিয়া আদায়ের জন্যে দু'রাকাত নামায পড়ি, যিনি আমাদেরকে এই মেহমান দ্বারা ধন্য করেছেন। এরপর সে দু'রাকাত নামায আদায় করতে লাগল। ছেলেটি আমার হাত ধরে তাবুর ভিতরে বসাল এবং চাকু নিয়ে ছোট একটি ছাগল জবাই করল। তাবুতে বসা অবস্থায় আমার দৃষ্টি যুবতীর উপর পড়ল যে খুবই সুন্দরী, রূপসী সে বুঝতে পেরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললঃ আরে কি দেখছ?

তুমি কি সেই হাদীসটি জান না যা আমাদের নিকট মদীনা ওয়ালার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হতে পৌছেঃ

«إِنَّ زَنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ»

অর্থঃ “চোখের জ্বিনা (ব্যভিচার) হল পর নারীর দিকে দৃষ্টি দেয়া।”

এই হাদীস শুনিয়ে তোমাকে অপদস্থ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং আমার উদ্দেশ্য হল যে, তোমাকে আদব শিখানো যাতে করে দ্বিতীয়বার এমনটি না কর।

যখন শোয়ার সময় হল তখন আমি আর ছেলেটি তাবুর বাইরে শুয়ে গেলাম এবং মেয়েটি তাবুর ভিতরে রাত কাটাল আমি রাতে সুললিত ও মধুর কণ্ঠের কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পেয়েছি।

সকাল বেলায় আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলামঃ এই আওয়াজ কার ছিল?

ছেলেটি বললঃ সে আমার বোন, যে সারাটি রাত কোরআন তেলাওয়াত করছিল।

আমি বললামঃ হে ছেলে! তুমি তোমার বোনের চেয়ে বেশী এই আমল করার যোগ্য। কেননা তুমি পুরুষ আর সে হল নারী।

ছেলেটি আমার কথা শুনে মুচকি হেসে বললঃ দুঃখ হচ্ছে তোমার উপর
হে যুবক! তুমি কি জান না যে, সৎ আমলের তৌফিক একমাত্র আল্লাহ যাকে
দিয়ে থাকে সেই সফল, আর না হয় সে বিফল।

স্বামীর দানশীলতায় স্ত্রীর অসম্ভৃষ্টি

হাতেম তাস্ত বর্বর যুগে দানশীলতায় অত্যন্ত সুখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। দানশীলতায় সে যুগে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তার স্ত্রী মাবিয়া বিনতে আফযার তাকে প্রায়ই দান করতে এবং বেশী পরিমাণে আপ্যায়ন করাতে বাঁধা দিতেন। বলতেন যে, এত বেশী দানশীলতা ভাল নয়। তার এসব কথায় হাতেম তাস্ত মোটেও প্রভাবিত হতেন না।

মাবিয়ার এক চাচাত ভাই ছিল যার নাম ছিল মালেক। সে মাবিয়াকে পছন্দ করত। একদিন সে মাবিয়াকে বলল যে, তুমি কেনইবা হাতেমকে বুঝাও না। অথচ তুমি দেখছ যে, হাতেম কিরূপে সম্পদ মানুষের জন্য খরচ করে দেয়। তার কাছে যত দামী জিনিস হোক সে তা খরচ করা ছাড়া স্বস্তি পায় না। এখনতো তার কাছে সম্পদ রয়েছে; কিন্তু এভাবে অর্থ-সম্পদ নষ্ট করতে থাকলে একদিন কান্ডাল হয়ে যাবে। এরপর তোমার জীবনও ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর যদি হঠাৎ সে মৃত্যুবরণ করে তবে তুমি ভাব তোমার কি দুর্দশা হবে? তোমার শিশুরাও অসহায় হয়ে যাবে।

মাবিয়া মালেকের কথা বিশ্বাস করল এবং কথায় সমর্থন করে বলল যে, তুমি সত্যিই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী; কিন্তু আমি কি করতে পারি? মালেক তাকে কুমন্ত্রণা দিল। যদি হাতেম থেকে তালাক নিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাকে বিয়ে করে নিব। আমি হাতেম থেকে বেশী সম্পদশালী। আমার সাথে তোমার কোনরূপ কষ্ট হবে না। এটা আগের যুগ ছিল। সে যুগে মহিলাদের স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার পদ্ধতি এই ছিল যে, মহিলারা তাদের চুল দ্বারা বানানো তাবুতে বসে যেত। যদি তাদের ঘরের দরজা পূর্ব দিকে হত তাহলে সে তার তাবুর দরজা পশ্চিমের দিকে করে নিত আর পশ্চিমের দিকে হলে পূর্ব দিকে করে নিত। এটা তাদের একটা পদ্ধতি ছিল।

মাবিয়া তার চাচাত ভাইয়ের কথানুযায়ী এমনটিই করল। হাতেম বাড়ী আসলে বুঝতে পারেন যে, মাবিয়া তার সাথে থাকতে চায় না। তিনি তার

ছেলে আদীকে বললেন যে, দেখ তোমার মা কি করেছে? আদী বলল যে, আমিও দেখেছি; কিন্তু আমি কি করতে পারি?

হাতেম নিজের ছেলেকে নিয়ে কিছু দূরে এক উপত্যকায় বসবাস শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে ৫০টি লোকের এক দল নিয়মানুযায়ী হাতেমের বাড়ীর সামনে তাবু ফেললেন। মেহমানদের এই দল দেখে মাবিয়ার পায়ের নীচে আর মাটি নেই। তিনি নিজের দাসীকে ডেকে বললেন আমার চাচাত ভাই মালেককে মেহমান সম্পর্কে জানাও। তাকে বল যে, তাদের জন্য দুধ আর খাওয়া-দাওয়া সরঞ্জামাদি সব পাঠিয়ে দিতে। আপ্যায়নতো করাই লাগবে।

দাসী মালেকের কাছে এই সংবাদ জানালে সে তার মাথা পিটাতে শুরু করল, নিজের দাড়ি ছিড়তে লাগল এবং বলল যে, যাও মাবিয়াকে আমার সালাম জানাও আর বল যে, এসব কিছুর জন্যেই আমি তোমাকে হাতেমের কাছ থেকে তালুক নিতে পরামর্শ দিয়েছিলাম আর এখন তুমি আমাকেই এ সমস্যায় জড়াতে চাও। আমি এরূপ আপ্যায়ন পরিত্যাগ করেছি এখন পঞ্চাশ জন মেহমানের আপ্যায়ন আমার দ্বারা সম্ভব নয়। দাসী এসে মুয়াবিয়া সামনে মালেকের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল। মাবিয়ার কাছে এসব কথা ভাল লাগেনি। ঘরে সম্মানিত মেহমানগণ বসেছিলেন। তিনি তার দাসীকে বললেন যে, যাও হাতেমের খোঁজে তিনি এত দূরে নয় কাছেই একটি উপত্যকায় অবস্থান করছেন। তাকে বল যে, আপনার অতিথিবৃন্দ আপনার ঘরে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়ে বসে আছেন। তাদের খাবারের ব্যবস্থা করুন।

দাসীটি উপত্যকার দিকে দৌড়াতে লাগল। দূর থেকে হাতেম তাঁকে ডেকে অতিথিদের বিষয় জানাল।

তিনি বললেন যে, অতিথিদের সুস্বাগতম! তিনি দ্রুত উট আস্তানায় আসলেন এবং দু'টি উটের পিছনের গোড়ালি কেটে ফেললেন। (সে যুগে উটের যবাহ করার পদ্ধতি এমনটিই ছিল)

«هَذَا الَّذِي طَلَّقْتُكَ بِسَبَبِهِ تَرَكُ أَوْلَادَنَا وَلَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ»

মাবিয়া দেখে এ বলে খুব জোরে চিৎকার করল, তুমি এ কি করছ? আমি এজন্যেই তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াটাকে বেছে নিয়েছিলাম। তুমি আমাদের সন্তানদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় ছেড়ে যাবে।

হাতেম তাঈ উত্তর দিলেনঃ মাবিয়া তুমি নিপাত যাও। যেই সত্ত্বা এই অতিথিবৃন্দ, তোমার সন্তান-সম্ভ্রতি এবং সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন তিনিই সবার রিযিকদাতা। তুমি কে যে এসব ভাবছো? (আলামুন নেসা আল-আগানি আল-ইসবাহানী, দেওয়ান হাতেম তাঈ ইত্যাদি)

এক কুমারীর দূরদর্শিতা

এটা জাহেলী যুগের ঘটনা। মক্কায় বড় নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তির এক মেয়ে ছিল যার নাম হিন্দ বিনতে উতবা বিন রাবিয়া ছিল। সে সময়কালের এক অনন্যা সুন্দরী, মেধাবী ও রুচিশীল যুবতী ছিল তাকে বিয়ের জন্য একই সময়ে দু'ব্যক্তি সুহাইল বিন আমর এবং আবু সুফিয়ান বিন হারব প্রস্তাব দিলেন। তার বাবা উতবা কন্যার কাছে এসে বললঃ আমার স্নেহের কন্যা! মক্কার দুই উপযুক্ত যুবক তোমাকে বিয়ে করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। এখন তোমার ইচ্ছা যাকে পছন্দ কর। তার সাথে বিয়ে দিব।

হিন্দ বলল যে, আব্বাজান এই দু'জনেরই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাকে অবগত করেন যাতে করে সিদ্ধান্ত নিতে আমার জন্যে সহজ হয়।

উতবা সুহাইল বিন আমরের পরিচয় দিলঃ সুহাইল বিন আমর বংশের সর্বোত্তম এবং নির্বাচিত ব্যক্তি। জীবনের সব সম্পদ তার কাছে রয়েছে। আমার স্নেহের কন্যা যদি তুমি তার প্রস্তাব গ্রহণ কর তবে সে তোমারি হয়ে থাকবে। তোমার কথা মত চলাটাই সে তার নিজেকে ধন্য মনে করবে। তুমি যদি তার ভালবাসার পাত্রেী হয়ে যাও তবে অবশ্যই তার দৃষ্টিতে তুমি আকাশের তারকা হয়ে যাবে এবং তার পরিবারের ধন-সম্পদ তোমার হাতে ও ক্ষমতাও তোমার হবে। আর আবু সুফিয়ান সেও খুব স্বচ্ছল এবং উচু বংশের এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অভিজাত ঘরের ছেলে এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন। নিজের সম্পদ অযথা নষ্ট করে না।

হিন্দ তার বাবার কথা শুনে উত্তর দিলঃ আব্বাজান প্রথম যে ব্যক্তি সে তার স্ত্রীর জন্য প্রচুর অর্থ সম্পদ দ্বারা বিলাসিতায় ভরপুর সবকিছুই দিতে পারবে; কিন্তু যখন তার পরিবারের সবার দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর দুর্বল কাঁধে এসে পড়বে তখন সে ভুলের শিকার হবে। আর যখন পরিবারের অন্যান্যরা আমাদের পরস্পরের ভালোবাসায় সমস্যা সৃষ্টি করবে তখন সে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তার থেকে যদি আমার গর্ভে কুৎসিত কোন সন্তান জন্ম লাভ করে তবে আমি এক অবুঝ ও বোকা নারীদের মধ্য থেকে একজন হয়ে যাব। সুতরাং বাবা আমাকে এই ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিবেন না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবু সুফিয়ান সে একজন সৎ ব্যক্তি ও ভদ্রতার অধিকারী। কুমারী নারীর স্বামী হওয়ার জন্য সে উপযুক্ত। আমিও নিজের পবিত্রতা রক্ষা করে চলব। আর আমার পক্ষ থেকে এমন কোন কাজ হবে না যাতে তার কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমি এমন আত্মমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তির সাথে বিয়েতে রাযী আছি। আব্বাজান! আমার বিয়ে তার সাথেই দিয়ে দিন।

কন্যার এই দূরদর্শিতাপূর্ণ মন্তব্যের পর উতবা তার কন্যাকে আবু সুফিয়ানের সাথে দিয়ে দেয়। এই হিন্দ সেই নারী যে এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল। বদর যুদ্ধে তার পিতা উতবা আমীর হামযার হাতে নিহত হয়। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে সে উহুদ যুদ্ধে ওয়াহশীকে প্রস্তুত করে। নিজেও একদল নারীর নেতৃত্ব দিয়ে উহুদ যুদ্ধে অংশ নেয়। এরপর মক্কা বিজয় হলে সে ইসলাম গ্রহণ করে। গোপনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বায়আত গ্রহণ করে। যদিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামের নির্দেশাবলী বর্ণনা করেন এবং এটাও বলেন যে, ব্যভিচার করবে না, তখন সে অনিচ্ছায় বলে উঠে যে, স্বাধীন রমলী কি এমন নিকৃষ্ট কাজ করে?

এই নারীর গর্ভে এমন এক ব্যক্তিত্ব জন্ম লাভ করেছে যে আরবের বিখ্যাত ও অতি বুদ্ধিমান এবং সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাকে বিশ্ব আমীরে মুয়াবিয়া বলে জানে।

খলীফার জন্যে দু'আ না বদদু'আ

এক নারী হারুনুর রশীদের (১৭০ হিজরী থেকে ১৯৩ হিজরী) দরবারে হাজির হল। সে সময় হারুনুর রশীদের সাথীবৃন্দ তার সাথে বসা ছিলেন।

মহিলাটি বলতে লাগলঃ

«يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنَيْكَ وَفَرَّحَكَ بِمَا أَعْطَاكَ،
لَقَدْ حَكَمْتَ فَقَسَطْتَ»

এর বাহ্যিক অর্থ হলঃ “হে আমীরুল মু’মিনীন! আল্লাহ তায়ালা আপনার চক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা রাখুক। আর আপনাকে যা দান করেছেন তাতে আপনাকে খুশি রাখুন। আপনি নিঃসন্দেহে ন্যায় বিচার করেছেন।”

একথা শুনে হারুনুর রশীদ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে রমণী! তুমি কোন বংশের?

মহিলাটি উত্তর দিলঃ আল-বরমক বংশের যাদের পুরুষদের হত্যা করিয়েছেন এবং তাদের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নিয়েছেন।

হারুনুর রশীদ বলতে লাগলঃ যে পর্যন্ত নিহত লোকজনের বিষয় তা আল্লাহ তায়ালা লিখনীতে যা হওয়ার ছিল হয়ে গেছে; কিন্তু সম্পদ এখনো সব রয়ে গেছে তা তুমি সব নিয়ে নাও। তোমাদের সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া হবে। এরপর হারুনুর রশীদ উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ

«اتَذَرُونَ مَا قَالَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ؟»

“আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন এই মহিলাটি কি বলেছিল?”

সকলেই উত্তর দিলঃ আমাদের মতে সে তো আপনার ভালোর জন্যই প্রার্থনা করেছিল।

খলীফা হারুনুর রশীদ বললেনঃ এমনটি নয়; বরং এই মহিলাটি আমার জন্য বদদু'আ দিয়েছিল।

সে বলেছেঃ

«أَقَرَّ اللَّهُ عَيْنِكَ»

অর্থাৎ, “আল্লাহ তায়ালা আপনার চক্ষুদ্বয়কে স্থির করে দিক, আর স্থির তখনই হতে পারে যখন মৃত্যু হয়ে যায়।”

মহিলাটি যে বলেছেঃ

«وَفَرَحَكَ بِمَا أَعْطَاكَ»

সে এই কথাটি আল্লাহ তায়ালা বাণী থেকে চয়ন করেছেঃ

﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً﴾

অর্থঃ “আর যখন তারা (অতীতের লোকজন) তাদের প্রাপ্য সম্পদে আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকল হঠাৎ আমি তাদেরকে (শাস্তির জন্যে) গ্রেফতার করলাম।” (সূরা আনআমঃ ৪৪)

মহিলাটি বলেছেঃ «حَكَمْتَ فَقَسَطْتَ»

এটাও আল্লাহ তায়ালা বাণী থেকে নিয়েছেঃ

﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾

অর্থঃ “আর যারা অত্যাচারী তারা জাহান্নামের জ্বালানী হয়ে থাকবে।” (সূরা জ্বিনঃ ১৫)

উপস্থিতিবৃন্দ হারুণুর রশীদের মেধা আর তার আরবী ভাষায় এত গভীর পাণ্ডিত্যে খুশি হন। (মেয়েলোকের বুদ্ধিমত্তাঃ ১/৩৬৩)

বৃদ্ধার চেহারায় লাভণ্য ও মাধুর্যের গুপ্ত রহস্য

এক মহিলা বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে গিয়েছিল; কিন্তু তার চেহারায় লাভণ্য ও অত্যন্ত সৌন্দর্য বিরাজ করছিল। মনে হতো না যে এটা কোন বৃদ্ধার চেহারা; বরং দেখে মনে হত এটা কোন যুবতী নারীর চেহারা।

কেউ তাকে জিজ্ঞেস করলঃ আপনার বয়স অনেক হয়েছে। আপনি বৃদ্ধ বয়সে পা রেখেছেন; কিন্তু আপনার চেহারা বৃদ্ধ বয়সের ছাপ পড়েনি। আপনি কি ব্যবহার করেন? যার দ্বারা আপনার চেহারায় এত উজ্জলতা যে, যুবতীর চেহারার মত।

বৃদ্ধা উত্তর দিলেনঃ বোন! আমি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করি যা সম্পর্কে বেশীর ভাগ নারী অজ্ঞ। আমি এর ব্যবস্থাপত্র অনেক বড় চিকিৎসক থেকে নিয়েছি যা ব্যবহার করলে মানুষের চাহিদা পূর্ণ হয়ে যায়। অথচ মানুষের চাহিদা শেষ হয় না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, যা ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেনঃ

«لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَغِي ثَلَاثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ»

অর্থঃ “যদি আদম সন্তানকে (মানব জাতিকে) দু’টি উপত্যকা সোনা-চাদির দেয়া হয় তবুও সে তৃতীয় আরেকটি পেতে আশা করবে। আর বনী আদমের পেট কেবল মাটিই ভরতে পারে।”

(বুখারীঃ ৬৪৩৬, মুসলিমঃ ১০৪৯)

আমিও প্রত্যেক দিন সৌন্দর্য চর্চা করি; কিন্তু আমি যে সৌন্দর্য চর্চা করি তা হল এইঃ আমার দু’ঠোঁট আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে। আমার চোখের প্রসাধনী দৃষ্টি নিচে রাখা। আমার দু’টি হাতের প্রসাধনী হল মানুষের কল্যাণ করা। আমার পায়ের প্রসাধনী হল স্থিরতা ও অটল থাকা। আমার

অন্তরের স্থিরতা হল মহান প্রভুর ভালবাসা। আমার মস্তিষ্কের খোরাক হল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য। আমার মনের খোরাক হল প্রভুর ফরমাবরদারী। আমার চরম চাওয়া-পাওয়া ঈমান। এটাই আমার সৌন্দর্য চর্চা যার দ্বারা আমি আমার চেহায়ায় উজ্জলতা পেয়েছি।^১

স্বপ্নের মাধ্যমে খলীফার বিচার

আল্লামা ইবনে জাওয়াযী খলীফা মুতাযিদ বিল্লাহ এর খাস খাদেমের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, খলীফা মুতাযিদ বিল্লাহ একদিন দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর আমরা খলীফার পার্শ্বেই ছিলাম। হঠাৎ খলীফা ভীত হয়ে জেগে উঠলেন।

খলীফা আমাদের নির্দেশ দিলেনঃ তোমরা দ্রুত দাজলা নদীর দিকে যাও। সেখানে প্রথম জাহাজ যা খালি আসবে তা সেখানে নোঙ্গর করিয়ে জাহাজের নাবিককে আমার দরবারে হাজির কর।

আমরা খলীফার নির্দেশ পাওয়া মাত্র সময় ব্যয় না করে দ্রুত বের হয়ে গেলাম। সেখানে খালি জাহাজ দেখতে পেলাম। আমরা জাহাজের নাবিককে গ্রেফতার করে খলীফার দরবারে নিয়ে আসলাম। নাবিক খলীফার প্রতি দৃষ্টি দিতেই এমন ভীত-স্বল্পস্ত হল যে এখনই তার প্রাণ যেন বের হয়ে যাবে।

খলীফা গর্জে উঠে তাকে বললেনঃ হে অভিশপ্ত! সেই নারী সম্পর্কে সব কথা খুলে বল যাকে তুই হত্যা করে তার অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছিস, আর না হয় তোর গর্দান কেটে শিরোচ্ছেদ করব।

নাবিক কিছক্ষণ ইতঃস্তত করল; কিন্তু পরক্ষণেই প্রাণের ভয়ে বলতে লাগলঃ জ্বি আমীরুল মুমিনীন! আমি সকালে দাজলা নদীর একটি ঘাটে ছিলাম। সে সময় সুন্দরী একটি নারী সামনে পড়ল। আমি এমন সুন্দরী নারী কখনো দেখিনি। সে খুব সুন্দর পোশাক পরিহিতা ছিল। তার হাতে-পায়ে এবং গলায় অত্যন্ত দামী হিরার অলংকারাদি ছিল। আমার অন্তরে লোভ জন্মিল আর আমি তাকে ধোকা দিয়ে তার মুখে কাপড় ঠেলে দিয়ে তাকে পানিতে ডুবিয়ে দিলাম। এরপর তার সব কাপড়-চোপড় এবং অলংকারাদি তার শরীর থেকে খুলে নিলাম। আমি আশঙ্কা বোধ করলাম যে, যদি আমি এই জিনিসগুলো নিয়ে নিজ বাড়ীতে যাই তবে মহিলাটির নিহত হওয়ার সংবাদ প্রচার হলে এই জিনিসগুলো আমার গ্রেফতারীর কারণ হবে। এজন্য আমি ওয়াসেত (কুফা ও বসরার মাঝে এক শহর) দিকে পলায়ন

করতে চাইলাম; কিন্তু রাস্তায় আপনার সিপাহীরা আমাকে গ্রেফতার করে আপনার কাছে নিয়ে আসলেন।

খলীফা জিজ্ঞেস করলেনঃ সে মহিলার অলংকার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কোথায় রেখেছো?

নাবিক উত্তরে বললঃ আমি জাহাজের নীচের তলায় লুকিয়ে রেখেছি।

খলীফা সেই সমস্ত অলংকারাদি সিপাহীদের পাঠিয়ে আনালেন। অনেক অলংকার ছিল। তিনি সিপাহীদের নির্দেশ দিলেন যে মহিলাকে যে স্থানে ডুবিয়ে মারা হয়েছে এই হত্যাকারীকেও সেখানে ডুবিয়ে মারা হোক। সিপাহীরা নির্দেশ পালন করলেন এবং তাকে ডুবিয়ে মারলেন।

এরপর খলীফা ঘোষণা করে দিলেন যে, যারা এই নিহত মহিলাটির ওয়ারেস তারা এসে মহিলার অলংকারাদি নিয়ে যাক। এই ঘোষণা বাগদাদের বাজারে তিন দিন পর্যন্ত হল। তিন দিন পর মহিলার নিকটাত্মীয় খলীফার দরবারে উপস্থিত হলেন। খলীফা তাদেরকে সবকিছুই তাদের হাতে দিয়ে দিলেন এরপর খলীফার খাদেম জিজ্ঞেস করল হে আমীরুল মু'মিনীন! এখন প্রশ্ন হল যে, আপনি এই গোপন বিষয় জানলেন কিরূপে?

খলীফা বললেনঃ স্বপ্নে আমাকে এক ব্যক্তি আহ্বান করে বলছিলঃ হে আহমদ! এই সময়ে সর্বপ্রথম যে নাবিক জাহাজ নিয়ে আসবে তাকে গ্রেফতার কর এবং তাকে এই মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যেই মহিলাকে সে হত্যা করে তার সমস্ত সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। এরপর তাকে শাস্তি দাও। আমি এই স্বপ্নের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করেছি। আর এ স্বপ্ন যে বাস্তব সত্য ছিল তা তোমরাই দেখতে পেলেন।

এমনটিও হয়?

শাইখ আবুল ওয়াফা বিন আকীল বলেনঃ আমার এক বন্ধু আমাকে বর্ণনা দিয়েছে এক নারী সন্ধ্যাবেলায় এক অবিবাহিত কাপড় ব্যবসায়ী যুবকের দোকানের সামনে বসে গেল। যখন সে দোকান বন্ধ করে চলে আসবে তখন নারীটি তার দৃষ্টিতে পড়ল।

দোকানদারঃ আল্লাহর বান্দী! তুমি সন্ধ্যাবেলায় এখানে কি করছ? তোমার সমস্যা কি?

মহিলাঃ আমি কোন আশ্রয়ের খোঁজে আছি। আমার কোন বাসস্থান নেই।

দোকানদারঃ তুমি কি আমার সাথে আমার ঘরে যেতে পারবে, যেখানে তুমি আজকের রাত কাটিয়ে দিবে।

মহিলাঃ ঠিক আছে।

দোকানদার সেই মহিলাটিকে নিয়ে চলে গেলেন, কথাবার্তা হল এবং যুবক নিজেই প্রস্তাব দিলঃ আমি কি তোমায় বিয়ে করতে পারি?

মহিলাটি তার প্রস্তাবে রাযী হয়ে গেল। সান্ধীদের ডাকা হল। মসজিদের ইমাম আসলেন। তিনি বিয়ে পড়ালেন আর উভয়ের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের তিন দিন অতিবাহিত হলে চতুর্থ দিন দোকানদারের ঘরে এক ব্যক্তি কয়েকজন মহিলা নিয়ে হাজির হলেন।

দোকানদার জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনারা কারা? কোথা থেকে এসেছেন? কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?

আগত ব্যক্তির বললেনঃ আমরা সবাই এই মহিলার নিকটাত্মীয়। তার চাচাত ভাই-বোন। যখন আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের নিকটাত্মীয় মেয়েটিকে আপনি বিয়ে করেছেন তখন আমরা সকলেই খুব খুশি হয়েছি। আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য হল যে আমাদের বাড়ীতে এক বিয়ের অনুষ্ঠান যাতে আপনার স্ত্রীর উপস্থিতি থাকা জরুরী। এজন্য আমরা তাকে

অল্প কিছুদিনের জন্য আমাদের সাথে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনি যদি তাকে আমাদের সাথে যেতে দিন তবে আপনার মেহেরবাণী হবে।

দোকানদার তার কথা শুনে নিজের স্ত্রীর কাছে গেলেন এবং সে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানালেন।

স্ত্রী বললঃ তাদেরকে ফিরে যেতে বলুন। আমাকে তাদের সাথে কখনো পাঠাবেন না। তাদের সামনে একথা বলে কসম করে নিন যে যদি আমার স্ত্রী এক মাসের আগে ঘর থেকে বের হয় তবে সে তালাক। কেননা এ লোক আমাকে নিয়ে গেলে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠবে। যেহেতু আমি তাদের অনুমতি ছাড়া আপনার সাথে বিয়ে করেছি। না জানি তাদেরকে আমাদের ঠিকানা কারা জানিয়ে দিয়েছে। স্ত্রীর কথা শুনে দোকানদার বের হয়ে গেল এবং অতিথিদের সামনে স্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তালাকের কসম করে নিল। এরপর অতিথিবৃন্দ নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। যুবক দোকানদার নিয়মানুযায়ী নিজের দোকানে চলে গেল তবুও তার মাথায় তার স্ত্রীর কথাই ভাবনা আসছে। তার ব্যবসায় মন বসছিল না। অন্যদিকে তার স্ত্রী তার অনুপস্থিতিতে কিছু না নিয়ে নিজ বাড়ী চলে গেল।

যখন ব্যবসায়ী বাড়ী ফিরল সে দেখতে পেল যে তার স্ত্রী আর ঘরে নেই। যখন সে খুঁজতে লাগল তখন এক লোক তাকে বলল যে মহিলাটি তার উদ্দেশ্য লাভ করতে পেরেছে।

শাইখ আবুল ওয়াফা বলেনঃ হতে পারে এই মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হওয়ার জন্যই এরূপ অভিনয় করেছে যে তাকে তিন তালাক দিয়েছিল।

লোকজনের উচিত, এই প্রকার ধোকা থেকে যেন সচেতন থাকে এবং মানুষের ধোকা বাহানার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে।

হাজ্জাজ বিন আল্লাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কৌশল

আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন খায়বার যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন তখন হাজ্জাজ বিন আল্লাত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে আবেদন করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! মক্কায় আমার অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন আছে আমি সেখানে যেতে চাচ্ছি। আর আমি আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি যে, আপনি আমাকে আপনার বিষয়ে মক্কায় অবাস্তব কিছু বলার অনুমতি দিয়ে দিন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজ্জাজ বিন আল্লাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন যে, মক্কায় গিয়ে যা চাও বল তোমার জন্য অনুমতি দিলাম।

«قُلْ وَأَنْتَ فِي حِلٍّ»

(দারেমীঃ ২/৬১, আহমদঃ ৩/৪৫০)

হাজ্জাজ বিন আল্লাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে একরূপ অনুমতি এজন্য নিয়েছে যে, তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, তার ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়ে মুশরিকরা তার সম্পদ হনন করবে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুমতি পাওয়া মাত্র হাজ্জাজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন আর মক্কায় পৌঁছা মাত্র একথা প্রচার করে দিলেন যে, মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খেফতার হয়েছেন এবং তাদের অধিকাংশ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। এরপর নিজের স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেনঃ যা কিছু তোমার কাছে আছে দিরহাম, দীনার, অলংকারাদি, গয়না, সোনা-চাঁদি দ্রুত আমাকে সোপর্দ করে দাও আমি সময় অপচয় না করে খাইবারে পৌঁছে যাব এবং সেখান

থেকে মোহাম্মাদ এবং তাঁর সাহাবীদের থেকে লভ্য সম্পদ যা গণীমতের তা ক্রয় করে নিব যা ভবিষ্যতে আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগবে।

অন্যদিকে এ সংবাদ ধীরে ধীরে মক্কার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং কুরাইশের নেতারা এই আনন্দদায়ক সংবাদকে এক বিশাল সফলতার প্রতীক হিসেবে নিয়ে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রত্যেকেই আনন্দে মেতে উঠল।

অন্যদিকে মক্কায যারা মুসলমান ছিলেন তাদের অবস্থা ছিল বিপরীত। সবাই খুব পেরেশানীতে ছিলেন। তাদের কল্পনাও ছিল না যে, এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। আর এরূপ হওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না।

মুসলমানদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও ছিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি মক্কায ইসলাম কবুল করেন নিজের মঙ্গলের জন্য, ইসলাম মক্কাবাসীদের কাছে গোপন রেখেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ সংবাদে অত্যন্ত বেশী মর্মান্বিত হন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন যে, আব্বাস শুয়ে পড়েন এবং নিজের বুকের মাঝে নিজ ছোট কন্যাকে বসিয়ে নিয়েছেন এরপর দুঃশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণের জন্য এক দাসের মাধ্যমে হাজ্জাজ বিন আল্লাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ডেকে পাঠালেন।

হাজ্জাজ বিন আল্লাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাসকে একথা বলে পাঠালেন যে, তুমি গিয়ে আবুল ফযলকে সালাম বলবে এবং তাকে বল যে, নিজে একটি ঘর শূণ্য করতে যাতে আমি তার সাথে একাকীত্বে কথা বলতে পারি। আর এও বলে দিন যে, আমার কাছে তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে।

গোলাম ফিরে এসে দরজায় পৌঁছামাত্র বলতে লাগল হে আবুল ফযল! সুসংবাদ গ্রহণ করুন!

আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একথা শুনতেই আনন্দিত হয়ে গোলামকে আলিঙ্গন করে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমার প্রিয়! কি সেই সুসংবাদ!

গোলাম হাজ্জাজ বিন আল্লাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথাগুলো জানালে সুসংবাদের কথা শুনামাত্র আবুল ফযল আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিলেন।

ইতিমধ্যে হাজ্জাজ বিন আল্লাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং তিনি তাদের প্রকৃত ঘটনা খুলে বললেন যে, আমি এক প্রপাগান্ডা প্রচার করেছি। বাস্তব সত্য হল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খায়বার যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছেন। খায়বারবাসীদের সহায় সম্পদ মুসলমানদের আয়ত্বাধীনে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গণীমতের সম্পদ বণ্টন করে দিয়েছেন এবং নিজের জন্য গোত্রের নেতার কন্যা সুফিয়া বিনতে হাইকে নির্বাচিত করেছেন। সুফিয়াও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর হ্যাঁ আবুল ফযল! সত্য কথা হল আমি মক্কায় এসেছি এজন্য যে, এখানে আমার অর্থ-সম্পদ রয়েছে তা নিতে এসেছি। কেননা তারা যদি আমার ইসলাম কবুল করা সম্পর্কে জানতে পারে তবে তারা আমার অর্থ-সম্পদ আমাকে ফেরত দিবে না। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে এই অনুমতি নিয়ে এসেছি যে, আমি যা চাই তা বলতে পারব। সুতরাং আপনার কাছে আমার অনুরোধ আপনি এ সত্য তিন দিন পর্যন্ত গোপন রাখবেন। যখন আমি মক্কা থেকে চলে যাব তখন আপনি মক্কাবাসীকে জানিয়ে দিবেন।

অন্যদিকে হাজ্জাজের স্ত্রী স্বামীর কথা শুনামাত্র সমস্ত অর্থ একসাথে করে থলের মধ্যে ভরল এবং সবকিছু স্বামীর হাতে দিয়ে দিলেন। হাজ্জাজ বিন আল্লাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থলে নিলেন এবং মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনদিন পর আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাজ্জাজ বিন আল্লাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাড়ী পৌঁছেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তোমার স্বামীর কি অবস্থা? সে পূর্ণ ঘটনা আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জানালেন যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গ্রেফতার হয়েছেন এবং তার সাথীদের হত্যা করা হয়েছে এবং খায়বার-

বাসীরা তাদের সম্পদ হস্তগত করে নিয়েছে। আমার স্বামী গণীমতের জিনিস ক্রয় করতে গিয়েছেন যাতে সম্ভাব্য অনেক জিনিস পাওয়া যায়।

এরপর বললেনঃ হে আবুল ফযল! আল্লাহ তায়ালা আপনার দুঃশ্চিন্তা দূর করুন। আমরা জানি যে, আপনার জন্য এই সংবাদ খুবই কষ্টের। আমরা আপনার দুঃখে মর্মান্বিত।

আব্বাস তাকে বললেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে দুঃখ-কষ্ট, দুঃশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করবেন। তোমাকে এতটুকুই বলছি যে, আল্লাহ তায়ালা খায়বারকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে বিজিত করেছেন। তাদের সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে এবং নেতার মেয়েকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিয়ে করেছেন। এখন আমি তোমাকে এই বলছি যে, তোমার কাছে যদি তোমার স্বামী প্রিয় মনে হয় তবে তার কাছে চলে যাও।

হাজ্জাজ বিন আল্লাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী বললেনঃ আমি আপনাকে কসম করে বলছি আপনি কি সত্যিই বলছেন?

আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি সত্য ঘটনা বলছি।

এরপর আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কুরাইশের মজলিসে আসেন। কুরাইশরা দেখামাত্র তাকে বললঃ আবুল ফযল! মন খারাপ করে রাখবেন না। আপনার মঙ্গল হবে। আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাদের উত্তরে বললেনঃ আল্লাহর শুকরিয়া যে আমার মঙ্গল ও কল্যাণই নির্ধারণ করেছেন। আর আমি তোমাদেরকে এক সংবাদ দিতে এসেছি। আর তা হল যে, হাজ্জাজ আমাকে বলেছে যে, আল্লাহ তায়ালা খায়বারকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে বিজিত করেছেন। খায়বার-বাসীর ধন-সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছেন এবং সম্প্রদায়ের প্রধানের কন্যা এখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী হয়ে গেছে। মূলতঃ আমি তিন দিন পর্যন্ত এই সংবাদ

গোপন রেখেছি। কেননা হাজ্জাজ বিন আব্বাত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমার উপর শর্ত আরোপ করেছিল যে, আমি যেন তিন দিন অতীত না হলে এ গোপন তথ্য ফাঁস না করি। হাজ্জাজ শুধুমাত্র তার ধন-সম্পদ নেয়ার জন্যে মক্কায় এসেছিলেন।

আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা শুনে মক্কার কাফেরদের আনন্দ ম্লান হয়ে গেল। এর বিপরীতে মুসলমানদের চেহারা থেকে দুঃশ্চিন্তার কালো মেঘ সরে গেল। আর খুশিতে ও আনন্দে মন ভরে গেল ও চেহারা চমকাতে লাগল।^১

১. ইবনে জাওয়ীর আখবারুল আযকিয়াঃ পৃষ্ঠা ৬৩, উসদুল গাবাঃ ১০৮৩।

এক মহিলার ধূর্তামি

এক ব্যবসায়ী নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমরা কায়রোতে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী ব্যবসার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিলাম। সারাটি বাজারে ব্যবসা করে সন্ধ্যায় আমরা বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নামে নামকরণ করা হয়েছে সেই মসজিদটিতে আমরা সবাই একত্রিত হতাম। পরস্পর মত বিনিময় করতাম। একে অন্যকে পরস্পরের ব্যবসার সম্পর্কে জানাত।

একদিন নিয়মানুযায়ী আমরা মসজিদে বসে কথা বলছিলাম এমন সময় কাছেই একটি খুটির সাথে বসা এক মহিলা নজরে পড়ল। বাগদাদের এক ব্যবসায়ী সেই মহিলাটির কাছে গেল এবং বললঃ তুমি এখানে বসে কি করছ? কোন সমস্যা থাকলে বল আমরা তোমার সহযোগিতা করব।

সে বলতে লাগলঃ মূলতঃ বিষয়টি হল আমার স্বামী দশ বছর থেকে অনুপস্থিত। এখন পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি সে কোথায়, এখন আমার জীবন একাকিত্বে কাটছে। আমার চলার মত কিছুই নেই। এজন্য আমি কাজী সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম যে, তিনি আমার জন্য উপযুক্ত পাত্র ঠিক করে আমার বিয়ে দিয়ে দিবেন যাতে আমার জীবনের সংকটপূর্ণ মুহূর্ত কাটিয়ে উঠতে পারি; কিন্তু কাজী সাহেব আমার বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি? আমি এমন এক ব্যক্তির খোঁজে বের হয়েছি যে, কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে নিজেও সাক্ষী দিবে এবং নিজের সাথীদেরকে দিয়েও সাক্ষ্য দেয়াবে যে, আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে অথবা আমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে যাতে আমি বিয়ে করতে পারি। অথবা কমপক্ষে সে কাজীর কাছে গিয়ে এই কথা বলবে যে, এটা আমার স্ত্রী এবং আমি একে তালাক দিচ্ছি যাতে ইদত (সময় সীমা যা শরীয়ত নির্ধারিত) সমাপ্ত হলে আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারি।

ব্যবসায়ী এটা শুনে মহিলাকে বললেনঃ তুমি আমাকে এক দীনার দাও এর পরিবর্তে আমি কাজীর সামনে স্বীকার করব যে, তুমি আমার স্ত্রী।

এরপর আমি তোমাকে কাজীর সামনে তালাকও দিয়ে দিব। মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে কয়েক সিঁকা বের করে দিল যা এক দীনারের কম ছিল। আর বলতে লাগলঃ আমার কাছে এই সিঁকাগুলো ছাড়া কিছুই নেই। ব্যবসায়ী এই কয়টি পয়সা নিয়ে নিল এবং পরদিন কাজীর সামনে হাজির হল।

আমরা সারাটি দিন সেই ব্যবসায়ীর অপেক্ষায় ছিলাম; কিন্তু সে সেদিন আর আসল না। এর পরের দিন যখন সে আসল তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ কাল তুমি কোথায় চলে গিয়েছিলে? আমরা তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। আমাদের বল কি ঘটনা ঘটেছিল।

সে বললঃ ওসব কথা রাখো। আমার আসা না আসায় তোমাদের কী আসে যায়? আমার সাথে যা হয়েছে তা আমি বলা পছন্দ করি না।

আমরা তাকে খুব চাপ দিলাম এবং বললাম না তা হতে পারে না তোমাকে প্রকৃত ঘটনা বলতেই হবে। এরপর সে বলতে লাগলঃ আমি সেই মহিলার সাথে কাজীর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। মহিলাটি কাজীর সামনে দাবী করল যে, এই লোকটিই আমার স্বামী যে দশ বছর থেকে গায়েব। এখন আমি এই স্বামী থেকে তালাক চাই। সুতরাং কাজী সাহেব আমাদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে দিন। কাজী সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তা সত্যায়ন করি।

সুতরাং কাজী মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তুমি কি নিজের স্বামীর উপর তোমার যে অধিকারসমূহ রয়েছে তা থেকে তুমি তাকে মুক্তি দিয়েছ?

সে বললঃ না, না, আল্লাহর কসম আমার দেনমোহরের অর্থ তার কাছে পাওনা এবং দশ বছরের খরচও তার উপর ধার্য। আমি দশ বছর থেকে তার অপেক্ষায় রয়েছি তাই আমি নিজের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারি না। মহিলার বর্ণনা শুন্যর পর কাজী সাহেব আমার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বলতে লাগলঃ শুন মিয়া! নিজ স্ত্রীর প্রাপ্য দিয়ে তাকে মুক্ত করে দাও। অথবা যদি চাও নিজে স্ত্রী হিসেবে রাখতে তাও করতে পার।

আমি কাজীর ফয়সালা এবং এই ধোকাবাজ মহিলার কাণ্ড দেখে থমে গেলাম। এখন অবস্থা এমন রূপ ধারণ করল যে, আমি ধোকা থেকে বাঁচার কোন কৌশলও অবলম্বন করতে পারছিলাম না আর না আমি সত্য ঘটনা বর্ণনা দিয়ে মুক্ত হতে পারছিলাম। আমি ভাবতেই ছিলাম, হঠাৎ বিচারক আমাকে পুলিশের সোপর্দ করে দিলেন যে, তারা আমার কাছ থেকে মহিলার অধিকার আদায় করে দিবে।

পুলিশ অফিসার আমাকে বললেনঃ এই মহিলাকে বিশ দীনার দিয়ে দিলে তুমি রক্ষা পেতে পার। আমার সামনে কোন সমাধান ছিল না। আমি চুপচাপ বিশ দীনার বের করলাম এবং মহিলাকে দিয়ে দিলাম এভাবে আমি আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং আদালত প্রাপ্তনে আমি সকলের সামনে অপমান, অপদস্থও হয়েছি।

অন্যদিকে আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, হাসতে হাসতে আমাদের অবস্থা খারাপই হয়ে যাচ্ছিল। এরপর কিছুদিন পরেই আমাদের বাগদাদী স্বামী নিজ বাড়ীতে ফিরে গেলেন। এরপর তার সাথে আর আমাদের সাক্ষাত ঘটেনি। (কিতাবুল আকযিয়াঃ ২৬০)

মহীয়সী রমণী উম্মে সুলাইম (ﷺ)

উম্মে সুলাইম বিনতে মালহান এমন এক মুসলিম রমণী যার জীবন আদর্শে মুসলিম জাতির নারীদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

জাহেলী যুগে তিনি মালিক বিন নাজরের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তার গর্ভে এমন এক সন্তান জন্ম নেয় যে বড় হয়ে মুসলিম বিশ্বে সুখ্যাতি অর্জন করেন। যাকে আমরা আনাস বিন মালিক বলে জানি।

আনসারীদের মধ্যে যারা প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে উম্মে সুলাইম একজন যখন তিনি ইসলাম কবুল করেন তার স্বামী তার উপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হল। সে সময় তিনি কোন এক সফরে ছিলেন সফর থেকে এসে ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠেনঃ

«أَصَبَوْتُ؟»

“তুমি কি ধর্মত্যাগী হয়ে গেছ?”

উত্তরে তিনি বললেনঃ

«مَا صَبَوْتُ وَلَكِنِّي آمَنْتُ»

“আমি মুরতাদ হইনি; বরং আমি অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করে মু’মিনা হয়েছি।”

উম্মে সুলাইম তার শিশু আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে খুব আনন্দের সাথে স্নেহ ভরে লালন-পালন করতেন এবং কালেমার (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) তালকীন করতেন। ছোট শিশু তা উচ্চারণ করত।

স্বামী তার স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলতঃ

«لَا تُفْسِدِي عَلَيَّ ابْنِي»

“আমার সন্তানকে তুমি নষ্ট করছ।”

উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উত্তরে বলতঃ আমি আমার সন্তানকে নষ্ট করছি না; বরং তার জীবনকে সুন্দর করছি। কিছুদিন পর তার

স্বামী মালিক বিন নাযর শাম দেশের উদ্দেশ্যে কোন কাজে বের হন। সেখানে কোন শত্রু তাকে হত্যা করে দেয়। এ সংবাদ উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) শুনে বলেনঃ কোন সমস্যা নেই আমি আমার প্রিয় সন্তানকে বুকের দুধ ততদিন পর্যন্ত দিয়ে যাব যতদিন সে নিজেই দুধ পান না ছাড়বে। বড় না হওয়া পর্যন্ত আমি দ্বিতীয় কোন বিয়ে করব না। এজন্য আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতেনঃ

«جَزَى اللَّهُ أُمِّي عَنِّي خَيْرًا، لَقَدْ أَحْسَنْتَ وَلَا يَتِي»

“আল্লাহ তায়ালা আমার মাকে উত্তম প্রতিদান দিন নিশ্চয় তিনি আমাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করেছেন।”

যখন তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেল তখন আবু তালহা, যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি, উম্মে সুলাইমকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুসনাদে আহমাদে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু তালহা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি বললেনঃ

«يَا أَبَا طَلْحَةَ! أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ نَبَتْ مِنَ الْأَرْضِ؟»

“হে আবু তালহা! তুমি কি দেখ না যে, তোমাদের উপাস্য মাটির থেকে জন্মানো উদ্ভিদ?”

আবু তালহা উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ।

উম্মে সুলাইম বললেনঃ

«أَفَلَا تَسْتَحْيِي تَعْبُدُ شَجَرَةً! إِنْ أَسْلَمْتَ فَإِنِّي لَا أُرِيدُ مِنْكَ صَدَاقًا غَيْرَهُ»

“তোমার লজ্জা হয় না কোন বৃক্ষের সামনে মাথা নত করতে! যদি তুমি ইসলাম কবুল কর তবে তাই হবে আমার জন্য দেন-মোহর।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি বলেছেনঃ

«أَمَّا إِنِّي إِلَيْكَ لَرَاغِبَةٌ وَمَا مِثْلُكَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ
وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ فَإِنْ تَسْلِمَ فَذَاكَ مَهْرِي لَا أَسْأَلُ غَيْرَهُ،
فَأَسْلَمَ وَتَزَوَّجَهَا أَبُو طَلْحَةَ»

“তোমার প্রতি আমার আকর্ষণ আছে। তোমার মত ব্যক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা যায় না; কিন্তু তুমি মুশরিক আর আমি মুসলিম। যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তবে এটাই আমার দেন-মোহর। এছাড়া আমি তোমার কাছে কিছুই চাইব না। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাদের বিয়ে হয়।”

অন্য এক বর্ণনায় তিনি উত্তরে বলেছেনঃ

«أَمَّا تَسْتَحْيِي تَسْجُدُ لِحَشْبَةِ تَنْبُتٍ مِنَ الْأَرْضِ وَإِنَّمَا نَجَرَهَا
حَبَشِيٌّ بَنِي فَلَانٍ؟»

“তোমার লজ্জা হয় না যে, কাঠের তৈরি মূর্তির সামনে মাথা নত কর, যে গাছ যমীন থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং অমুক গোত্রের হাবশী এটাকে তৈরি করেছে।”

তাবকাতে ইবনে সাদে বর্ণিত, আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিবাহের প্রস্তাবে তিনি বলেছেনঃ

«إِنِّي قَدْ آمَنْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ وَشَهِدْتُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ
تَابَعْتَنِي تَزَوَّجْتُكَ»

“আমি এই মহা পুরুষের (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করেছি এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। যদি তুমি আমার অনুসরণ করে ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে বিয়ে করব।”

প্রত্যুত্তরে আবু তালহা বললেনঃ ঠিক আছে আমাকে একটু ভাবতে দাও। এরপর তিনি ব্যস্ত করেন যে—

«فَأَنَا عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ»

“আমি সেই ধর্ম গ্রহণ করেছি যার উপর তুমি আছ।”

উম্মে সুলাইম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খুব ভালবাসতেন। একবার তিনি তার সন্তান আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে পেশ করে বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এই আনাস, আমার প্রিয় বৎস, আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকবে। আমি তাকে আপনার সেবার জন্যে উৎসর্গ করছি। আপনি তার জন্য দু‘আ করে দিন।

সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্যে দু‘আ করলেনঃ

«اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أُعْطِيَتْهُ»

“হে আল্লাহ! তাকে অধিক সম্পদ এবং অনেক সন্তান দান কর। আর যা তাকে দান করেছ তাতে বরকত দাও।” (সুনানে তিরমিযীঃ ৩৮২৯ ইমাম তিরমিযী বলেন হাদীসটি বিশুদ্ধ।)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ দু‘আ আল্লাহ তায়ালা কবূল করলেন এবং আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে একশতের অধিক সন্তান দিয়েছেন। আর এমন একটি বাগানের মালিক বানিয়েছেন যেখানে বছরে দু‘বার ফল জন্মাতো। সেখানে এক সুগন্ধময় এক বৃক্ষও ছিল যা মিসক-আম্বরের চেয়েও অধিক সুগন্ধ ছিল।

যখন উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়ে আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে হয়ে গেল। আর স্বামী-স্ত্রীর প্রতি মুহূর্ত আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যে কাটতে লাগল এবং তাকওয়া ও পরহেযগারীতে তাদের ঘর আলোকিত হয়ে গেল।

উম্মে সুলাইমের সেই ঘটনা প্রত্যেক মার জন্যই শিক্ষণীয় যখন তার সন্তান ইন্তেকাল করে এবং তিনি ধৈর্যধারণ করেন ও তিনি তার জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে তার স্বামীকে এই দুঃখজনক বিষয়ে দুঃখিত হতে দেননি; কিন্তু আজকের নারী সমাজ তাদের সন্তানের মৃত্যুতে হায়-হতাশ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

প্রিয় পাঠক! আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিশুদের প্রতি স্নেহ মমতার বিষয় সম্পর্কে একটি ঘটনা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে, এক আনসারী শিশু যার নাম আবু উমাইর ছিল, ছোট একটি পালিত পাখি নুগাইরকে নিয়ে খেলা করত। হঠাৎ একদিন পাখিটি মারা যায়। আবু উমাইর খুব চিন্তিত হল। আল্লাহর রাসূল তার কাছে আসলেন। স্নেহ মমতায় তার কান ধরলেন এবং বললেনঃ

«يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعِيرُ»

“হে আবু উমাইর! নুগাইরের কি হয়েছে?”

উম্মে সুলাইমের শিশুর মৃত্যুর ঘটনা সহীহ মুসলিমে আছে। আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, আবু তালহা বাড়ীর বাইরে ছিলেন। তার এক ছেলে যা উম্মে সুলাইমের ঔরসে ছিল তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যু হল। উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বাড়ীর অন্যান্যকে বললেন যে, যখন আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাড়ী ফিরেন তখন সন্তানের মৃত্যু সংবাদ দিও না।

যখন আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাড়ি আসলেন তখন জিজ্ঞেস করলেনঃ ছেলেটি কেমন আছে?

উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ সে আগের থেকে অনেক আরামে রয়েছে। আবু তালহা স্থির হয়ে গেলেন। অল্পক্ষণ পর উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাতের খাবার পরিবেশন করলেন এবং আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খাবার খেয়ে শেষ করলেন। আর উম্মে সুলাইম

(রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেজে গুজে তার স্বামীর হক আদায় করলেন। যখন তিনি দেখলেন যে, আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) শান্তিপূর্ণ ও শান্ত অবস্থায় আছেন তখন স্বামীকে এভাবে বললেনঃ

«أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَّتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوا
عَارِيَّتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهَا؟»

“আপনি বলুন, যদি কোন লোক কোন বাড়ীওয়ালাকে প্রয়োজনীয় কোন জিনিস ধার হিসেবে দেয় এরপর সেই জিনিস ফেরত চায় তবে কি বাড়ীওয়ালার নিষেধ করার অধিকার আছে?”

আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ কখনো নয়।

উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেনঃ তাহলে আপনি আপনার সম্ভানের ব্যাপারে তাই মনে করুন।

একথা শুনে আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কেঁপে উঠলেন এবং বললেনঃ তুমি আমাকে আমার অপবিত্র হওয়ার পূর্বে এ খবর কেন দাওনি? এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ঘটনার বর্ণনা দেন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দেনঃ তোমরা কি গত রাত মিলন করেছ?

তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু‘আ করলেনঃ

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فِي لَيْلَتِهِمَا»

“হে আল্লাহ! তাদের গত রাতের মিলনে বরকত দাও।”

সুতরাং এই প্রার্থনার বদৌলতে আব্দুল্লাহ বিন তালহা জন্ম লাভ করে।”

(বুখারীঃ ৫৪৭০, মুসলিমঃ ২১৪৪)

সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ লিখেন যে উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন কোন আত্মীয়তা ছিল যার জন্য তিনি পর্দা করতেন না। সম্ভবত নানা পক্ষের আত্মীয়া ছিলেন। তিনি খালা ছিলেন অথবা দুধ খালা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো কখনো উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে আসতেন।

উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজ ঘরে খাদ্য পানীয় প্রস্তুত করে রাখতেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে উপহার দিতেন আর যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাক্ষাতে যেতেন এবং শুয়ে যেতেন তখন তার শরীর থেকে বের হওয়া ঘাম বোতলে ভরে নিতেন এবং এটাকে সুগন্ধির সাথে ব্যবহার করতেন। (মুসনাদে আহমাদঃ ৩/২৮৭)

উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন এবং পিপাসার্ত মুজাহিদদের এবং আহতদের পানি পান করাতেন। মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। এই দিনগুলোতে তিনি গর্ভধারীনী ছিলেন এবং গর্ভে আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। হুনাইনের দিন তিনি তার কোমরে একটি খঞ্জর বুলন্ত রেখেছিলেন। আবু তালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বললে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ

«مَا هَذَا الْخَنْجَرُ؟»

“এই খঞ্জর দিয়ে কি করবে?”

উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উত্তর দিলেনঃ

«اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ»

“আমি খঞ্জর এজন্যে রেখেছি যে, কোন মুশরিক আমার কাছে আসলে এর দ্বারা পেট ফেড়ে দিব।”

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুচকি হাসলেন। (মুসলিমঃ ১৮০৯, মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১৮৬)

উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর দ্বীনের প্রতি গভীর সম্পর্কের ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন।

সহীহ মুসলিমে আনাস বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার এরশাদ করেনঃ

«دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْفَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟. قَالُوا:
هَذِهِ الْغُمَيْصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ»

“আমি জান্নাত ভ্রমণে ছিলাম সে সময় পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই।”

আমি বললামঃ সে কে?

তারা (ফেরেশতারা) বললেনঃ এ হল গোমাইছা বিনতে মালহান আনাস বিন মালিকের মাতা।^১

১. বুখারীঃ ৩৬৭৯, মুসলিমঃ ২৪৫৬

সে তো নারীর জন্য মৃত্যু!

তিনি এক সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। আরবের অধিবাসী। তার স্ত্রী সন্তান তার কাছেই থাকত। সীমিত আয়ের মধ্যেই জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট ছিলেন। সম্ভাব্য ভবিষ্যতের অধিক ব্যয়ের অনুমতি তাকে বাধ্য করেছে ট্যাক্সি চালাতে। এবার তিনি ট্যাক্সি চালাতে লাগলেন।

নিয়মানুযায়ী একদিন ট্যাক্সি নিয়ে বের হলেন। যাত্রীর অপেক্ষায় ছিলেন। মাগরিবের সময় ঘনিয়ে আসছে এমন সময় এক বোরকা পরিহিতা রমণী তাকে ইঙ্গিত করল। ট্যাক্সি থামালেন।

মহিলা বললঃ আমাকে এক্ষুণি হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নিয়ে চলুন। আমি প্রসব বেদনায় আছি।

মহিলাটি বললঃ আপনি একটু অপেক্ষা করুন। নার্সরা তাকে লেবার ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। অন্যদিকে হাসপাতালের এক কর্মী ড্রাইভারের কাছ থেকে তার ঠিকানা এবং ফোন নম্বর নিয়ে নেয়। রাতে তার কাছে ফোন আসল যে, তোমার ছেলে সন্তান জন্ম হয়েছে। তুমি এক্ষুণি হাসপাতালে চলে এসো। সে উত্তর দিল যে, তোমাদের ভুল ধারণা। আমার একটিই স্ত্রী, যিনি বাড়ীতে রয়েছেন।

হাসপাতালের কর্মী বলল, আপনি একবার আসুন। আপনার আসা অত্যন্ত জরুরী। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসপাতালে চলে গেলেন এবং সেখানে ঝগড়া শুরু করলেন যে, তোমরা আমার উপর এক মিথ্যা অপবাদ দিয়েছ। আল্লাহর শ্রুতিয়া যে আমার স্ত্রী এই বিষয় জানতে পারেনি নতুবা বাড়িতে কিয়ামত করে দিত।

সেখানে কর্তব্যরত চাকুরে বললঃ এতে আমাদের কোন দোষ নেই। যেই মহিলাটি আপনি নিয়ে আসলেন তাকে জিজ্ঞেস করা হল যে, তোমার স্বামী কে? উত্তরে বলে সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

লোকটি একথা শুনে বলতে লাগলেন যে, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এটা আমার উপর এক মিথ্যা অপবাদ। কথা কাটা-কাটি করছিলেন এমন সময় হঠাৎ স্মরণ করলেন D.N.A. টেস্টের কথা। তিনি তাদের বললেন যে, যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস না কর তবে আমার রক্তের D.N.A. টেস্ট করে নাও। তোমরা জানতে পারবে যে শিশুটি আমার না অন্য কারো। চিকিৎসকদের জন্য এই বিষয়টির তদন্ত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল।

সুতরাং তারা তার রক্ত পরীক্ষার জন্য নিয়ে নিল। আর তিনি প্রভুর দরবারে এ অপবাদ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করছিলেন। অল্পক্ষণ পর ডাক্তার এর ফলাফল নিয়ে আসলেন এবং বললেন যুবক! আমরা তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। অযথা তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি। তোমার রক্ত পরীক্ষায় এ সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, এ বাচ্চা তোমার নয় এবং এও জানা গেছে যে, তোমার বাবা হওয়ার যোগ্যতা নেই তুমি পুরাপুরি বন্ধ্যা।

এবার একথা শুনে হতবাক হয়ে বললেনঃ তোমাদের এ কথাতো আগের থেকেও জঘন্য। আমি অনেক বছর থেকে বিবাহিত। আমার সন্তানও রয়েছে। আর তুমি আমাকে বলছ আমার থেকে সন্তান জন্মাই নিতে পারে না। অবশ্যই তোমাদের রিপোর্ট ভুল। ডাক্তার গভীর মনোযোগ সহকারে রিপোর্টটি দেখলেন এবং বললেন যে, যুবক! আমাদের তথ্য সঠিক।

তবে আমি আবার পরীক্ষা করে নিচ্ছি। দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা হল। এবার ডাক্তাররা নিশ্চিত হয়ে জানালেন যে, যে ব্যক্তির এই রক্ত সে কখনো বাপ হতে পারবে না; কিন্তু আমার ছয়টি সন্তান আর ডাক্তারদের এই কথা, আমি বাবা হতে পারব না! তিনি পাগলের মত ভাবছিলেন। এরপর তিনি অনেক গভীর ভাবে ভাবলেন এবং বাড়ীর পরিবেশ সম্পর্কে ভাবলেন এরপর আবিষ্কার করলেন যে, তার স্ত্রী অবশ্যই দোষী; কিন্তু এমন ডাকাতি কে করেছে?

উত্তরে আরও এক সত্য উদ্ঘাটন হতে লাগল। তার পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছিল। তার আপন ভাই তার বয়সে ছোট। যাকে তিনি

সন্তানের মতই স্থান দিয়েছেন। তার বাড়ীতে প্রথম থেকেই বসবাস করে আসছিল। সে এই সুযোগে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। অনেক বছর থেকে অবৈধ সম্পর্ক চলছিল।

এরপর খুব চাপ দেয়ার পর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করে নেয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾

অর্থঃ “তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত।” (সূরা ইব্রাহীমঃ ২৪)

এই অপরাধের প্রকৃত অপরাধী এরা দু'জন ছিল; কিন্তু এর স্বামীও এই অপরাধে একই পরিমাণে অপরাধী যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশের কোন তোয়াক্কা করেনি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

«إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوُ؟ قَالَ: «الْحَمَوُ: الْمَوْتُ»

সাবধান! “তোমরা একাকিত্বে নির্জনে নারীর সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত থাক।”

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের ব্যাপারে আপনার কি নির্দেশ?

তিনি বললেনঃ দেবর নারীর জন্য মৃত্যু ।

হাদীসে “الحمو” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ স্বামীর ভাই এবং তার নিকটাত্মীয়কে বুঝায় ।^১

যে সত্যের উপর থাকবে তার কণ্ঠ উঁচু হবে

কুহতাবা বিন হামীদ একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একদিন তিনি খলীফা মামুনুর রাশীদের দরবারে হাজির ছিলেন। সেদিনটি মযলুম, অত্যাচারিত মানুষের অভিযোগের জন্য নির্ধারিত ছিল। লোকজন তাদের আবেদন পেশ করত। খলীফার কাছে বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণর উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ শোনার পর সেখানেই ফয়সালা বাস্তবায়িত করা হত।

আসরের নামাযের সময় ঘনিয়ে আসল। খলীফা সারাদিন অত্যধিক ব্যস্ত ছিলেন। তিনি উঠতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন এমন সময় এক নারী দরবারে উপস্থিত হল।

তার পোষাকের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল অনেক দূর থেকে এসেছে। সেই দিনে এই মহিলাটি সর্বশেষ আগত নারী ছিল। সে ভেতরে প্রবেশ করতে সময় উচ্চ কণ্ঠে বললঃ “আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ্।”

হে আমীরুল মুমিনীন! খলীফা মামুন তার কণ্ঠ শুনে ইয়াহইয়া বিন আকছামের দিকে তাকালেন। ইয়াহিয়া তার উত্তর ওয়ালাইকিস সালাম (তোমার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক) বললেন।

হে আল্লাহর দাসী! বলঃ তুমি কি প্রয়োজনে এসেছ?

মহিলাটি কাব্যের মাধ্যমে তার প্রয়োজন ও অভিযোগ ব্যক্ত করেন। খলীফা মামুন তার কাব্য শুনলেন এবং তিনিও কাব্যের মাধ্যমে উত্তর দিলেন যে, এখন আমরা আসরের নামায পড়ব। শনিবারে এসো। আমরা তোমার বিষয় শুনব এবং সেদিন অন্যথায় রবিবার তোমার সমস্যার সমাধান করে দিব।

শনিবারে সেই মহিলাটি দ্বিতীয়বার আসল। শনিবারে মহিলাটি আসলে খলীফা চিনতে পারলেন যে, এটা সেই মহিলা। সে সালাম করল। খলীফা সালামের উত্তর দেয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার বিবাদী কোথায়।

মহিলা বলতে লাগলঃ আমীরুল মু'মিনীন! আমার বিবাদী আপনার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।

একথা বলে তার সন্তান আব্বাসের দিকে ইঙ্গিত করল। খলীফা আহমদ বিন খালেদকে বললেন যে, বিবাদীর হাত ধরে তাকে মহিলার সাথে দাঁড় করিয়ে দিতে। নির্দেশ পালন করা হল।

এবার আদালতের সামনে মা-সন্তান উভয়ে পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। পরস্পর একে অপরের প্রতি দৃষ্টি দেয়া মাত্রই মা তার সন্তানকে ঘৃষি দিতে শুরু করল। তার কণ্ঠ উচ্চতর হতে লাগল।

মূলতঃ বিষয় হল সন্তান তার মায়ের সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল। সে ফেরত চাচ্ছিল আর সন্তান তা ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করছিল। দরবারে যখন হট্টগোল শুরু হল তখন আহমদ বিন আবু খালেদ মহিলাকে বললেন যে, আল্লাহর বান্দী! তোমার আওয়াজ নিচু কর। তুমি কোন সাধারণ মজলিসে নও; বরং খলীফার দরবারে আছ যার কিছু শিষ্টাচারিতা রয়েছে।

খলীফা মামুন আহমদ বিন আবু খালেদকে বললেনঃ

«دَعَّهَا يَا أَحْمَدُ، فَإِنَّ الْحَقَّ أَنْطَقَهَا وَأَخْرَسَهُ»

“আহমদ! তাকে কিছু বলো না। তাকে বলতে দাও। সত্য তাকে আওয়াজ উচু করতে বাধ্য করেছে। আর এই সত্যই তার সন্তানকে বোবা বানিয়ে দিয়েছে।”

খলীফা মামলা শুনার পর ফয়সালা দিলেনঃ “আব্বাস! নিজের মার সম্পত্তি ফিরিয়ে দাও।” এরপর এই মহিলা যে শহরের অধিবাসী সে শহরের অধিবাসীর গভর্ণরের কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন। আর তাতে লিখা হল যে, এই মহিলার সাথে যেন সৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়, তার সহযোগিতা করা হয় এবং তার সম্পত্তি যেন ফিরিয়ে দেয়া হয়। খলীফা নিজের পক্ষ থেকে মহিলার জন্য জীবিকার ব্যবস্থাও করলেন।

মরুকন্যার বিলাস বহুল প্রাসাদ পছন্দ নয়

মাইসুন বিনতে বাহদাল বিন আনীফ হারেসা বিন জনাব কালবী বংশের চোখের পুতুলী ছিল, সে এক বেদুঈন ছিল। এজন্য সে মরুভূমির পরিবেশে বড় হয় এবং যৌবনে পা রাখে। কাব্যে তার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। অতি সুন্দরীও ছিল। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধা, বক্তব্যে বিশেষ দক্ষতা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তার খ্যাতি ছড়িয়ে ছিল। বিশ্ব বিখ্যাত মুফাসসির ও ঐতিহাসিক ইমাম হাফেজ ইবনে কাসীর (রাহেমাহুল্লাহ) নিজের প্রসিদ্ধ কিতাব ‘আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া’ এর মধ্যে তার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেনঃ

«وَكَاَنَتْ حَازِمَةً عَظِيمَةً الشَّانِ جَمَالًا وَرِيَّاسَةً وَعَقْلًا وَدِينًا»

“মাইসুন বিনতে বাহদাল খুবই বুদ্ধিমতি, মুসলমান সুসম্মানের অধিকারিণী, রূপে ও গুণে অতি সুন্দরী, নেতৃত্বের গুণাবলী এবং ধার্মিক ইত্যাদি গুণের সমষ্টির অধিকারিণী ছিলেন।”

যখন আমীরে মুয়াবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার বিষয়ে জানতে পারলেন তখন তিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং সন্ধ্যায় তাকে বিয়ে করেন। যেহেতু আমীরে মুয়াবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাইসুনকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন এজন্যে তিনি মাইসুনের সাজ-সরঞ্জামাদির বিলাসপূর্ণ ভবনের বিশেষ খেয়াল রাখেন। তাকে খুশি রাখার জন্য সমস্ত প্রকার উপকরণাদির ব্যবস্থা করেন। এমনকি তিনি তার জন্যে দামেস্কে সবুজ শ্যামল স্থানে যা গোতায়ে দামেস্ক নামে প্রসিদ্ধ বিলাসপূর্ণ এক ভবন তৈরী করে দেন। এই সুন্দর ভবনকে নানা প্রকারের বস্ত্র দ্বারা সাজিয়েছেন। এছাড়া অনেক চাকরেরও বন্দোবস্ত করেন। আর এই সব মাইসুনের প্রতি অগাধ ভালবাসায় করেছেন। তার ইচ্ছা ছিল যে, তার স্ত্রী যেন সন্তুষ্ট থাকে। তিনি মনে করতেন যে, মাইসুন যখন এই ভবন দেখবে তখন তার আনন্দের কোন

সীমা থাকবে না; কিন্তু যখন সে ভবনে আসল তখন তার এর প্রতি কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হল না। আর কয়দিন পরই তার নিজের বাসস্থান এবং গ্রামীণ জীবনের স্মৃতি তাকে কষ্ট দিতে লাগল। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, নিকটাত্মীয় স্মরণ আসল। এরপর সে কিছু কবিতা আবৃত্তি করলঃ

১- لَيْتَ خَفَقَ الْأَرْوَاحَ فِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَصْرِ مُنِيفٍ

- ১। সেই জীর্ণ-শীর্ণ ঝুপড়ির ভেতরে যেখানে (কাজের জন্যে) মানুষ সচল থাকে সেই জীর্ণ কুটির আমার কাছে উচ্চাভিলাষী মহল থেকে বেশী পছন্দনীয় যেখানে মানুষ অচল হয়ে পড়ে থাকে।

২- وَلَيْسَ عَبَاءَةً وَتَقَرُّ عَيْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ

- ২। মোটা ঢিলা-ঢালা চাদর ও এতে আমার চক্ষু শীতল করাই আমার কাছে দামী ও পাতলা পোশাক থেকে বেশী পছন্দনীয়।

৩- وَأَكُلُ كَسِيرَةً فِي كِسْرِ بَيْتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَكْلِ الرَّغِيفِ

- ৩। জীর্ণ কুটিরে এক টুকরো রুটি খেয়ে দিন কাটানো আমার কাছে শাহী মহলের চাপাতি আর পরাটা থেকে বেশী পছন্দনীয়।

৪- وَأَصْوَاتُ الرِّيحِ بِكُلِّ فَجٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَقْرِ الدُّفُوفِ

- ৪। প্রশস্ত রাস্তায় বাতাসের যেই ধ্বনি আমার কাছে দুফ বাজনার ধ্বনি থেকে বেশী প্রিয়।

৫- حُسُونُهُ عِشَّتِي فِي الْبَدْوِ أَشْهَى إِلَيَّ نَفْسِي مِنَ الْعَيْشِ الطَّرِيفِ

- ৫। মরু-প্রান্তরে আমার ফকিরী জীবন আমার কাছে স্বচ্ছল ও বিলাসপূর্ণ জীবন থেকে বেশী প্রিয়।

৬- فَمَا أَبْغِي سِوَى وَطَنِي بَدِيلًا وَمَا أَبْهَاهُ مِنْ وَطَنِ شَرِيفٍ

৬। আমি আমার মাতৃভূমির পরিবর্তে অন্য কোথাও যেতে চাই না। আহ! কতই না প্রিয় আমার জন্মভূমি।

আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শাহী মহলে প্রবেশ করলে এক দাসী মাইসুনের কবিতাগুলো শোনায়। আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাইসুনের ভবনের প্রতি নিরাসক্তির বিষয়টি বুঝতে পেরে তাকে তিন তালাক দিয়ে নাজদে তার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেন। সে সময় তিনি গর্ভবর্তী ছিলেন। নিজের বাড়ীতে এক শিশু জন্ম দেন, যার নাম ইয়াযিদ রেখেছে। তাকে সে দু'বছর বুকের দুধ পান করিয়েছে। এরপর লজ্জা না করে ইয়াযিদকে আমীরে মুয়াবিয়ার দরবারে পাঠিয়ে দেয়। সে এই গ্রামে অত্যন্ত আনন্দেই ছিল। অল্প সময়ে রাষ্ট্রপ্রধানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। মূলতঃ সে মরুকন্যা ছিল। মরুভূমিতেই তার প্রশান্তি।^১

তদবীরে তকদীর পরিবর্তন হয় না

মহিলাটিকে তার স্বামী তালাক দিয়ে দিয়েছিল। এখন সে স্বামী ছাড়া জীবনের বাকী সময় একাকিতেই কাটাচ্ছিল। সে জীবনের সকল ধরণের সমস্যার সমাধানের আশ্রয় চেষ্টা করছিল। তার এক সন্তান ছিল। সেই সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি। অনেকবার বিয়ের প্রস্তাব পেলেও তার সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে তার কলিজার টুকরার জন্যে এক দয়ালু মা হওয়ার সাথে সাথে এক মেহেরবান বাবার দায়িত্বও পালন করছিল। প্রত্যেহ তার সন্তানের স্কুল থেকে ফেরার অপেক্ষায় থাকত।

ইয়াতীমের লালন-পালন অত্যন্ত সুন্দররূপে হচ্ছিল। তার সন্তানের লেখা-পড়ায় যথেষ্ট খেয়াল রেখেছে এবং এতে সফলতাও এসেছে। সুতরাং তার ছেলে স্কুলে সব থেকে ভাল ছাত্র হিসেবে গণ্য হয়ে গেল।

যখন সে কলেজ পাশ করল তখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল। মা ছেলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। সে তার সন্তানকে চোখের আড়াল হতে দিবে না। অন্য দিকে ছেলেটি উচ্চশিক্ষার প্রতি গভীর আশা করে রেখেছিল। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবতীয় কাগজ-পত্র ভর্তির জন্য পাঠাল। এরপর সেদিন আসল যেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ভর্তির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ভিসা আর টিকেটও হয়ে গেল। এবার সে তার মাকে শ্রদ্ধার সাথে জানাল যে, সে তার আশা পূর্ণ করতে চায়। আর সে আগামীকাল বাগদাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। মার জন্য এই সংবাদ খুব কষ্টকর ছিল। আমার সন্তান আমার থেকে দূরে চলে যাবে তা অসম্ভব। এরপর সে এক সিদ্ধান্ত নিল এবং চুপ হয়ে রইল। রাতে যখন তার প্রিয় সন্তান শুয়ে গেল তখন সে পাসপোর্ট এবং টিকেট লুকিয়ে রাখল। পরদিন সকালে ছেলেটি উঠে তার আসবাব-পত্র প্রস্তুত করল। পোষাক পরিধান করল। বিমান বন্দরে যেতে প্রস্তুত হল; কিন্তু যখন আলমারী থেকে নিজের পাসপোর্ট এবং টিকেট আনতে গেল আর তা সেখানে পেল না। সে তার মাকে জিজ্ঞেস

করলঃ মা! পাসপোর্ট আর টিকেট কি আপনার কাছে? সে মাথা ঝাকিয়ে উত্তর দিল হ্যাঁ।

ছেলেটি বললঃ শেষ পর্যন্ত আপনি এমনটি কেন করলেন?

‘কেননা আমি তোমার দূরত্ব বরদাশত করতে পারব না’ মা উত্তর দিল।

ছেলে বললঃ কিম্ব তাতে আমার ভবিষ্যতের কল্যাণ রয়েছে। এখন মা-সন্তান তর্ক-বিতর্ক চলছিল। মা শেষে সিদ্ধান্ত শোনাল যে, যা খুশি তা কর; কিম্ব পাসপোর্ট পাবে না। ছেলে মার সাথে ঝগড়া করে রাগ হয়ে নিজ কামরায় চলে গেল এবং অল্প সময় পর সে ঘুমের ভাবে ছিল।

এদিকে মা রান্না ঘরে চলে গেল। সে ভাবল যে ছেলেটি অসম্ভব তাই তার পছন্দের খাবার তৈরী করি। রান্না করতে লাগল। এরই মাঝে রেডিও অন করল। কিছুক্ষণ পর খবর পড়া শুরু হল, বলা হচ্ছে যে, অত্যন্ত দুঃখের সাথে এই সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করা বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। বিমানের সকল যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

মা খুশি ও দুঃখ উভয় অবস্থার মধ্যে ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ আদায় করল যে, তার ছেলে বেঁচে গেল। যদি সে জিদ না করত তবে তার সন্তানও মৃতদের একজন হত। এরপর কি হত? এর থেকে বেশী ভাবনাও তার জন্য অসম্ভব ছিল। সে দ্রুত তার ছেলের রুমের দিকে গেল যেন সে তাকে এই সংবাদ দেয়। সে দরজা খুলল; কিম্ব একি তার পায়ের নীচের মাটি সরে যাচ্ছে তার প্রিয় সন্তান তার সকল আশার কেন্দ্রবিন্দু তার সন্তানের মৃত্যু হয়ে গেল। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَرْخَوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

অর্থঃ “মহান প্রভু নিজের পবিত্র কিতাবে সত্যই বলেছেনঃ যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় চলে আসে তখন সে এক মুহূর্তেও আগে-পিছে হতে পারে না।” (ইউনুসঃ ৪৯)

মায়ের দু'আ

সম্ভ্রান্ত এক রমণীর বিয়ে ইসমাইল নামের এক ব্যক্তির সাথে হয়। ইসমাইল এক বুয়ুর্গ পরহেযগার এবং অনেক বড় আলেম ছিলেন। তিনি ইমাম মালিক (রাহেমাহুল্লাহ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই পবিত্র বিয়ের ফলাফল স্বামী-স্ত্রীর জন্য এক নামী-দামী শিশুর হল; যার নাম তাঁরা মুহাম্মাদ রেখেছেন। বিয়ে হল মাত্র কয়েক বছর অতীত হয়েছিল এরই মধ্যে ইসমাইল তার স্ত্রী ও শিশুসহ রেখে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আর রেখে যান তাদের জন্যে যথেষ্ট ধন-সম্পদ।

মাতা অত্যন্ত যত্ন সহকারে নিজ সন্তানকে লালন-পালন করেন। তার শিশুর ভবিষ্যতের কল্যাণ ও অগ্রগতি এবং তার আশার পূর্ণতায় বাঁধা সৃষ্টি হল। শৈশবেই শিশুটি তার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলল। এখন অন্ধ হওয়ার কারণে এই শিশুটি শিক্ষা গ্রহণের জন্য উলামাদের দরসে অংশ গ্রহণের সামর্থ ছিল না। আর না অন্য কোন শহরে যেতে পারতেন। মা খুবই দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত এই শিশুটির কি হবে? আলেমে দ্বীন কিভাবে হতে পারবে?

এই আশা পূরণে একটি মাত্র উপায় অবশিষ্ট ছিল আর তা হল প্রার্থনা। সুতরাং তিনি আল্লাহর নিকটে চোখের পানি ফেলে ফেলে প্রার্থনা করতে লাগলেন। বহুদিন থেকে তার সন্তানের দৃষ্টির জন্য আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করতে থাকেন। এক রাতে তিনি এক আশ্চর্য ধরনের স্বপ্ন দেখতে পান। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহকে দেখেন, তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন:

«يَا هَذِهِ قَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَى ابْنِكَ بَصَرَهُ بِكَثْرَةِ دُعَائِكَ»

হে নারী! তোমার অত্যধিক প্রার্থনায় আল্লাহ তায়ালা তোমার সন্তানের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন। যখন মুহাম্মাদের মা ঘুম থেকে জাগলেন তখন দেখলেন যে বাস্তবেই তার সন্তানের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। তার মুখ থেকে অনিচ্ছায় এই কথা বের হয়ে আসে:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ﴾

অর্থঃ “কে তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং ওর মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা এবং এতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? বরং তাদের অনেকেই জানে না।” (সূরা নামলঃ ৬২)

হে আমার প্রভু! অতি সমস্যায় জড়িত ব্যক্তির প্রার্থনা তুমি ছাড়া কে শুনতে পারে? আর কে আছে যে বান্দার সমস্যা দূর করতে পারে।

এই মহিয়সী রমনী যে অবিরত প্রার্থনা করছিলেন তিনি ছিলেন ইমামুল মুহাদ্দিসীন মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী (রাহেমাহুল্লাহ)-এর শ্রদ্ধেয় মা। যিনি তার সন্তানের দৃষ্টি ফিরে এলে তার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য এত বেশী শ্রম দেন যে আল্লাহ তায়ালা তার ছেলের প্রতি সর্ব প্রকারের ইলমের দরজা খুলে দেন এবং পরবর্তীতে এই শিশুটিই এক অনেক বড় হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। আর আল্লাহর কিতাবের পর দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিসুদ্ব কিতাব প্রণয়ন করেন যা সহীহ বুখারী নামে প্রসিদ্ধ। আর সেই শিশুটিকেই মুসলিম বিশ্বে ইমাম বুখারী বলে জানে। যার পূর্ণ নাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী। (রাহিমাহুল্লাহ)

শরীয়তের বিধান প্রয়োগ

মক্কায ফাতেমা নামক এক মহিলা ছিল। সে কুরাইশ বংশের এক উপশাখার সাথে সম্পর্ক রাখত। এই মহিলা লোকজনের কাছ থেকে বিভিন্ন জিনিষ ধার নিত এবং পরে তা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করত। এমন কি মানুষের জিনিষপত্র চুরিও করত। একবার সে চুরি করল তার অভিযোগ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদালতে পৌঁছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার হাত কাটার নির্দেশ দেন। মাখযুমী মহিলার হাত কাটার ফয়সালা শুনে কুরাইশগণ হতাশায় পড়ে। কেননা সে এক উঁচু বংশের মহিলা ছিল। কুরাইশ নেতৃবর্গের সিদ্ধান্ত হল যে, এই মহিলার পক্ষে সুপারিশ করার জন্যে কোন এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যাক। অবশেষে তারা স্থির করল যে, এই বিষয়ে উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ছাড়া কেউ সুপারিশের অধিকার রাখে না। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে প্রিয়।

সুতরাং উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে সুপারিশের জন্য আবদার করা হল। উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেই মহিলার বিষয়ে সুপারিশ করলেন; কিন্তু তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাগ ও দুঃখে চেহারার রং পাল্টে গেল। তিনি এরশাদ করলেনঃ

«أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»

“আল্লাহর নির্ধারিত বিধানে তুমি সুপারিশ করছ?”

উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) ভুলের জন্য লজ্জিত ও পেরেশান হলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য ক্ষমার করে দিন।

যখন সন্ধ্যা হল তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাষণের জন্যে দাঁড়িয়ে যান এবং আল্লাহ তায়ালার হামদ ও সানার পর এরশাদ করেনঃ

«أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَابْتَغَى اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا»

“তোমাদের আগে যারা অতীত হয়েছে তাদের ধ্বংশের এটাই কারণ যে যখন তাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি চুরির অপরাধে অপরাধ সাব্যস্ত হত তবে তাকে মুক্ত করে দিত। আর যদি কোন দুর্বল শ্রেণীর লোক চুরির অপরাধ করত তবে তার প্রতিও শাস্তির বিধান প্রয়োগ করত। আর সেই সত্যের শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত তবুও আমি তার হাত কেটে ফেলতাম।”

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে সেই মহিলার হাত কেটে দেয়া হল।

আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, এরপর সে তার স্বভাব পরিবর্তন করল। নিষ্ঠার সাথে তাওবা করল এবং তার বিয়ে হয়ে গেল। এরপর সে আমার কাছে কখনো কখনো আসত। আর আমি তার কি প্রয়োজন তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতাম।^১

আমি কাকে সন্তুষ্ট করব?

স্কুল ছুটি হলে এক মাসুম বালিকা অত্যন্ত চিন্তিত ও বিপন্ন ছিল। তার চেহারা দুঃশ্চিন্তার ছাপ পড়েছিল। মা তার চেহারা দেখামাত্র বুঝতে পারল যে, অবশ্যই স্কুলে এমন কিছু ঘটেছে যার জন্যে আমার কলিজার টুকরা সন্তানের এ অবস্থা। জননী তাকে জিজ্ঞেস করা ঠিক মনে করছেন না; কিন্তু তার হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না। তার ইচ্ছা ছিল যে, তার কাছে জিজ্ঞেস করবে যে, সে পেরেশান কেন?

দুপুরের খাবার শেষে কন্যা নিজেই এই নিরবতা ভঙ্গ করল এবং নিজের জননীর প্রশ্নবোধক দৃষ্টির উত্তরে বলতে লাগলঃ

আম্মা এই যে, আমি লম্বা ফ্রক পড়েছি এর জন্যে আমার শিক্ষিকা আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি বলেন যে, তুমিও অন্যান্য বালিকাদের মত ছোট ফ্রক পড়ে আসবে অন্যথায় স্কুল থেকে বের করে দেব।

জননীঃ আমার প্রিয় কন্যা! কিন্তু এই পরিপূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা যায় যে পোষাকে তাতো আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয়।

কন্যাঃ আম্মাজান! আপনার কথা সঠিক; কিন্তু টিচার এই পোষাক পছন্দ করেন না।

জননীঃ এটা ঠিক যে, তোমার টিচার তোমার এই পোষাক পছন্দ করেন না। আর সে তোমাকে শরীর ঢাকে না এমন পোষাক পরতে শুধু পরামর্শই দিচ্ছে না বরং তোমাকে বাধ্য করছে; কিন্তু তোমাকে ভাবতে হবে যে, আনুগত্য এবং ফরমাবরদারী কার করতে হবে, নিজের সৃষ্টিকর্তা প্রভুকে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে সৌন্দর্য দান করেছেন এবং তোমার উপর বিভিন্ন উপাদান দিয়ে তোমার জীবনকে ধন্য করেছেন।

কন্যাঃ আম্মাজান! আমি ইনশাআল্লাহ দয়ালু প্রভুকে সন্তুষ্ট করব।

জননীঃ আমার স্নেহের কন্যা! আমি তোমার কাছে এটাই আশা করেছিলাম। আমি তোমার লালন-পালন এমনভাবেই করেছিলাম।

পরদিন বালিকাটি সেই লম্বা ফ্রক পরে স্কুলে গেলে শিক্ষিকা আগের চেয়ে বেশী রাগান্বিত হন এবং বলেনঃ

আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম যে, ভবিষ্যতে এই ধরনের পোষাক পরে আসবে না। তুমি আমার কথা অমান্য করেছ।

তুমি আমার সাথে চ্যালেঞ্জে লিপ্ত হয়েছ, তুমি দেখে নিবে আমি তোমার সাথে কি ব্যবহার করি। শিক্ষিকা খুব রাগে গর্জিতেই থাকল।

ক্লাশের অন্যান্য বালিকা একেবারে নীরব, নিস্তব্ধ। শিক্ষিকার কথা শ্রবণ করছিল এবং তারা তাদের বান্ধবীর প্রতি খুব রাগান্বিত যে, সে কেন টিচারের কথা মানল না। তারা তার প্রতি দৃষ্টির পর দৃষ্টির বর্শা নিক্ষেপ করছিল।

মাসুম শিশুটির উপর যখন চাপ বেশী পড়ল সে তা বরদাশত না করে অনিচ্ছায় কাঁদতে লাগল। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে তার শিক্ষিকাকে উদ্দেশ্য করে বললঃ ম্যাডাম! আমার বুঝে আসছে না যে, আমি কাকে সম্ভ্রষ্ট করব আর কাকে অসম্ভ্রষ্ট করব।

শিক্ষিকাঃ আমাকে ছাড়া আর কে আছে যাকে তুমি সম্ভ্রষ্ট করতে চাও?

ছাত্রীঃ একজন আছে না? (নিষ্পাপের মত উত্তর দিল)

শিক্ষিকাঃ বল সে কে, শীঘ্রই বল।

ছাত্রীঃ আমি বললাম না যে, সে এক যাকে আমি খুশি করতে চাই।

টিচার এবার খুব বেশী রাগে ফেটে যাচ্ছিল, চিৎকার করে বললঃ বল সে কে?

শিশুটি তার হাত ও মুখ আসমানের দিকে উত্তোলন করল এবং বললঃ আমার প্রভু আসমানে যাকে আমি খুশি করতে চাই। আমার প্রভু আল্লাহ, আমার আল্লাহ।

ক্লাসরুমে নিরবতা ছেয়ে গেল। এক নিষ্পাপ শিশু তার প্রভুর উপর এত দৃঢ় ঈমান! টিচারের মাথা ঘুরছিল। ভ্রষ্টতার শিকড় উপড়ে যাচ্ছিল। এক মাসুম শিশু তার জন্য সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছিল।

সেই দরজা বন্ধ করার শক্তি আমার নেই

ইতিহাস গ্রন্থে একটি ঘটনার বর্ণনা আছে যে, এক ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে ফুসলিয়ে তার সাথে অবৈধ কাজ করতে চাইল এবং গৃহের সকল দরজা বন্ধ করতে বলল যাতে কেউ দেখতে না পারে।

মহিলাটি বললঃ আমি তো গৃহের সকল দরজা বন্ধ করে দিয়েছি; কিন্তু একটি দরজা তা বাকী রয়ে গেছে।

লোকটি বললঃ সেটিও বন্ধ করে দাও।

মহিলাটি উত্তর দিলঃ আল্লাহর শপথ! আমি তা বন্ধ করার সামর্থ রাখি না।

সে বললঃ আমাকে বল সেটা আমিই বন্ধ করে দিই।

মহিলাটি আকাশপানে তাকিয়ে বললঃ

«أَغْلَقُ بَابَ السَّمَاءِ»

“আকাশের দরজা বন্ধ করে দাও।”

সেই ব্যক্তিটি বললঃ আল্লাহর শপথ! আমি আকাশের দরজাতো বন্ধ করতে পারি না। সে ভীত হল। আল্লাহর ভয় তার মনে আসল তার শরীরে কাঁপন সৃষ্টি হল এবং সে গুণাহর ইচ্ছা ত্যাগ করে তাওবা করে নিল।

যার উপর ফেরেশতাগণ ছায়া করছিল

উহুদ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে আনসারী সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আকাশ পানে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করলেনঃ

«اللَّهُمَّ خُذْ مِنْ دَمِي هَذَا الْيَوْمَ حَتَّى تَرْضَى»

“হে আল্লাহ! আজকের এই দিনে আমার রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত কবুল কর এবং আমার প্রতি রাযী থাক।”

সুতরাং বড়ই বীরত্বের সাথে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং শহীদ হয়ে যান।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজ পিতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, উহুদের দিনে আমার পিতাকে চাদরে ঢেকে আনা হল। তার নাক, কান, ঠোঁট ভয়ঙ্কর রূপে বিচ্ছেদ করা হয়। আমি আমার বাবার চেহারা থেকে কাপড় সরাতে চাইলাম কিন্তু আমার সম্প্রদায়ের লোকজন কাপড় সরাতে নিষেধ করেন। এরপরও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাপড় উঠিয়ে দেন অথবা উঠানোর নির্দেশ দেন। এরই মাঝে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক মহিলার কান্নার অথবা চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পান তখন জিজ্ঞেস করেনঃ এ কোন মহিলা? আমরের কন্যা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«وَلِمَ تَبْكِي؟ فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنَحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ»

“তুমি কেন কাঁদছ? আব্দুল্লাহর লাশ উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতাগণ নিজেদের পাখা দ্বারা ছায়ায় আবৃত করে রেখেছে।”

অন্য এক বর্ণনায় জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেনঃ আমি আমার পিতার চেহারার কাপড় সরাতে সরাতে কাঁদতে লাগলাম আর লোকজন আমাকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিচ্ছিল। অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করছিলেন না। এরই মধ্যে আমার ফুফু ফাতেমা বিনতে আমরের কান্নার আওয়াজ আসল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ، فَمَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَظِلُّهُ بِأَجْنَحَتِهَا
حَتَّى رَفَعَتْ مُوَهُ»

তোমরা কাঁদ আর নাইবা কাঁদ ফেরেশতাগণ তাকে উঠানো পর্যন্ত নিজের পাখার ছায়া দ্বারা আবৃত করে রেখেছে। (বুখারীঃ ১২৪৪, মুসলিমঃ ২৫৫৪)

বুখারীর ব্যাখ্যাকারগণ বর্ণনা করেন, ফেরেশতাদের আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে ছায়া দ্বারা আবৃত করা এজন্য ছিল যে, তার রুহ নিয়ে যাওয়ার জন্য রহমতের ফেরেশতাগণ পরস্পর প্রতিযোগিতা করছিল। আর ফেরেশতাদের এই সম্মেলন শহীদ মরহুমের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সুসংবাদ ছিল যে, তার জন্যে আল্লাহ তায়ালা সুউচ্চ মর্যাদা প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর দুপুরের তীব্র রোদের তাপ থেকে রক্ষার জন্যে তার উপর ছায়া করা হয়।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলে এরশাদ করেনঃ জাবের খুশি থাক আল্লাহ তায়ালা তোমার বাবার শাহাদাতের পর জীবিত করলেন এবং তার সাথে সরাসরি কথা বলেন, অথচ আল্লাহ তায়ালা যখনই কারো সাথে কথা বলেন পর্দার আড়ালে থেকে কথা বলেন। (তিরমিযীঃ ৩০১০)

পর্বত অপেক্ষা অধিক দৃঢ়তা

আজ থেকে ১৪শত বছর পূর্বে নবুওয়াতের আলো মদীনা মুনাওয়ারার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন ভ্রষ্টতা ও অন্ধকারের গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিল; কিন্তু দেখতে দেখতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের আলো মদীনাবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল। আর মদীনাবাসীদের ঈমান এত শক্তিশালী হয়ে গেল যে, পাহাড় টলতে পারে কিন্তু তাদের ঈমান নিজ স্থান থেকে টলার কোন আশঙ্কা ছিল না, আর না তাদের পরহেযগারীর মধ্যে কোন নড়বড়ে ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) সাথে মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে বড় বড় সম্মানিত সাহাবা, আনসারের নেতৃবর্গ উপস্থিত আছেন। ইসলামের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। এরই মাঝে হিজাব পরিহিতা এক মহিলা মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাকে দেখামাত্র নীরব হয়ে যান, সাহাবাগণও নীরব।

মহিলাটি ধীর গতিতে অগ্রসর হয়ে লাজুক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললঃ

হে আল্লাহর রাসূল! আমার দ্বারা জিন্মা (ব্যভিচার) হয়ে গেছে। আপনি আমাকে পবিত্র করে দিন।

আল্লাহভীরু মহিলাটির অপরাধের স্বীকারোক্তি শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি প্রকারের পদক্ষেপ নিয়েছেন? তিনি কি বলেছেন যে, উপস্থিত সকলেই সাক্ষী থাক? তিনি কি কোন প্রকারের খুশি প্রকাশ করেছেন যে, মহিলা নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে? না তিনি এর একটিও করেন নি; বরং একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চেহারা মোবারক এমন লাল বর্ণ হয়ে গেল যে,

মনে হয় চেহারা থেকে রক্ত ঝরবে। এরপর তিনি নিজের চেহারা ডান দিকে ফিরিয়ে নিলেন এবং চুপ থাকলেন যেন তিনি কোন কথা শুনেন নি।

এই মহিলার ঈমানী শক্তির প্রতি লক্ষ্য করুন। তার ঈমানী শক্তির বদৌলতে সে তার অপরাধের এত কঠিন শাস্তি পেতে ইসলামী আদালতে নিজে নিজেই হাজির হয়েছে। সে কি এমনটি ভাবছিল যে, কিছু উপদেশ নির্দেশের দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে? অথবা চাবুকের কিছু আঘাতে বিষয়টি সমাপ্ত হয়ে যাবে? না এমনটি কখনো নয়। সে ভাল করেই জানতো যে, পবিত্রতা অর্জনের জন্য তার শরীরে পাথরের বৃষ্টি বর্ষানো হবে। তার শরীর ঝাঝরা হয়ে যাবে। শরীর থেকে রক্তের ফোয়ারা বের হবে। কঠিন ব্যাথায় তার সমস্ত শরীরকে মৃত্যুতে ঠেলে দিবে। তার শরীরের গোশত ফেটে ফেটে পড়তে থাকবে। হাড় ভাঙতে থাকবে। অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে। এসব জেনেও নিজের পবিত্রতার জন্যে এই শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে ঈমানী চেতনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েছে।

মূলতঃ আমাদের পূর্বের বুয়ুর্গ মুমিনগণ নাফসে আম্মারার (কুকর্মের নির্দেশক নাফস) প্ররোচনায় অপরাধ, পাপ করে ফেললেও ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান ছিলেন। তাদের ঈমান বর্তমানের আবেদ ও বুয়ুর্গ থেকে মহৎ ছিলেন।

যাক মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যাই, তাহল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই মহিলাটির সাথে কি প্রকারের ব্যবহার দেখিয়েছেন?

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই চেষ্টাই করেছেন যে, মহিলাটি নিজের কথা থেকে ফিরে আসে। কেননা তিনি শুধুমাত্র একবারের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত মনে করেন নি। তার একবারের স্বীকার এক সাক্ষীর সমতুল্য ছিল অথচ জিনার শাস্তি প্রয়োগের জন্য চার সাক্ষীর প্রয়োজন। এমনকি যদি তিন ব্যক্তি সাক্ষী দেয় আর চতুর্থ

ব্যক্তি অস্বীকার করে অথবা তার স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নেয় তবে জিনার শাস্তি প্রয়োগ হবে না; কিন্তু জিনার ফলে যদি মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় তবে শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটাই যথেষ্ট। ইসলামী শরীয়ত দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো, কারো পেছনে লাগা, কান লাগিয়ে কারো কথা গোপনে শোনা এবং মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি খুঁজতে নিষেধ করেছেন।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

«يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ: لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ»

“হে ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা তাদের মুখে ঈমানের কথা বলে অথচ তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি! মুসলমানদের গীবত করো না। আর তাদের দোষ-ত্রুটি খুঁজতে পেছনে পড়ো না। কেননা যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটির পেছনে পড়বে আল্লাহ তায়ালাও তার দোষ-ত্রুটির পেছনে লাগবেন। আর আল্লাহ তায়ালা যার দোষ-ত্রুটির পিছু নিবেন সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা অপদস্থ করবেন, যদিও সে চার দেয়ালের ভিতরে বন্দী থাকে।”

(আবু দাউদঃ ৪৮৮০, তিরমিযীঃ ২০৩২)

আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে উপদেশ দিয়ে এরশাদ করেনঃ

«إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدَتْهُمْ» أَوْ «كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ»

“যদি তুমি মানুষের দোষ-ত্রুটির পেছনে ছুটতে থাক তবে তুমি তাদেরকে আরও খারাপ করে দিবে। অথবা খারাপের নিকটবর্তী করে দিবে। কেননা যখন তাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পেয়ে যাবে তখন তারা প্রকাশ্যে খারাপ কাজ করবে।” (আবু দাউদঃ ৪৮৮৮)

সেই মহিলা যার সম্পর্ক গামিদিয়া গোত্রের সাথে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার অপরাধের কারণে নতুন এক জীবন পৃথিবীতে আগমন করবে। আমি গর্ভবতী।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي طِفْلَكَ ثُمَّ ارْجِعِي»

অর্থঃ “যাও যখন তোমার সন্তান ভূমিষ্ট হবে তখন এসো।”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কত দয়ালু। তিনি জানেন যে, এই মাতৃগর্ভে শিশুটির কোন অপরাধ নেই। এজন্য মহিলাটিকে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। সেই মহিলাটি চলে গেল। যখন শিশু ভূমিষ্ট হল মহিলাটি পুণরায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির হলেন।

উপরে উল্লেখিত ঘটনায় কতগুলো বিষয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণঃ

১। পেটের বাচ্চার প্রাণ বাঁচানোঃ জিনাকারিনী মহিলার গর্ভের শিশুকে মার সাথে হত্যা করা যাবে না। কেননা এখানে শিশুটির কোন অপরাধ নেই। এটা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ। আর তিনি মানবাধিকারের বিষয়ে অবগত এবং তা রক্ষাকারী।

২। মহিলাটির ধৈর্যের পরিপূর্ণতাঃ সে নিজের অবস্থান থেকে সরে যায়নি। সে এতদিন ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে বিনিময় ও সওয়াবের আকাঙ্ক্ষায় স্বীয় কথায় অটল থাকে। চিন্তা ও লজ্জা তার অন্তর ও কলিজাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। অনুতাপের গরম অশ্রু গাল বেয়ে ঝরছিল এবং তার হৃদয় আফসোসের আগুনে দাহ হচ্ছিল। তার কেবল একটিই আশা যে, কিরূপে গুণাহ থেকে মুক্তি পাবে এবং জান্নাতের অধিকারী হবে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ إِلَّاهُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

অর্থঃ “আর যখন তাদের দ্বারা কোন অশ্লীল কাজ হয়ে যায় অথবা কোন পাপ করে বসে তারা তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপ মোচনের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর বাস্তবে আল্লাহ ছাড়া কে আছেন যে পাপ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা অপরাধ কর্মে স্থির থাকে না।”

(সূরা আলে ইমরানঃ ১৩৫)

মু'মিনগণ বলেনঃ

فَاغْفِرِ اللَّهُمَّ رَبِّي ذُنْبَنَا ثُمَّ زِدْنَا مِنْ عَطَايَاكَ الْجِسَامِ

অর্থঃ “হে পরোয়ার দিগার! আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও এবং তোমার নেয়ামত দ্বারা আমাদেরকে অধিক পুরস্কৃত কর।”

لَا تُعَاقِبْنَا فَقَدْ عَاقَبْنَا فَلَقَّ أَسْهَرَنَا جُنَحَ الظَّلَامِ

অর্থঃ “আমাদেরকে আর শাস্তি দিওনা, কেননা আমাদের পাপের অস্তিরতা ও জ্ঞাপনই আমাদের রাতের ঘুম হারাম করে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ে রেখেছে।”

সেই মহিলাটি নয় মাস পর্যন্ত বোঝা বহন করে চলেছে। ভূমিষ্ট করার পর সে যখন চলার শক্তি পেল তখনই তার বাচ্চাকে একটি কাপড়ে ঢেকে বিশ্ব বিচারপতির দরবারে উপস্থিত হল। আর যে স্বীকারোক্তি সে প্রথমে দিয়েছিল তাতে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করেনি; বরং তাতেই সে অটল রয়েছে। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে আনার

জন্য কোন লোক পাঠান নি আর না কোন সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করলেন; বরং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে এমনিভাবেই মুক্ত করে রেখেছিলেন। সে নিজেই নবজাতককে নিয়ে দরবারে নবুওয়াতে হাজির হল এবং বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে জিনার গুনাহ থেকে পবিত্র করে দিন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই মহিলার বাচ্চার দিকে তাকালেন। তার অন্তর এই মাসুম বাচ্চাকে দেখে দুঃখে কষ্টে কঁপে উঠল। কেননা তিনি ছিলেন বিশ্বজগতের প্রতি দয়া ও রহমতের দূত। তিনি কাফেরদের জন্যও রহমত স্বরূপ ছিলেন যে, তিনি আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদের কাছে আগমন করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

অর্থঃ “আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্যে রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।”
(সূরা আশ্বিয়াঃ ১০৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এই বিষয়টিই চিন্তিত করে তোলে যে এই মহিলার প্রতি পাথর নিক্ষেপের শাস্তি প্রয়োগ হলে এই মাসুম শিশুটিকে কে বুকের দুধ দিবে? যখন এই মহিলাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়া হবে তখন এই নিষ্পাপ শিশুটির লালন-পালনের দায়িত্ব কে নিবে? সুতরাং তিনি এরশাদ করলেনঃ

«اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطَمِيهِ»

অর্থঃ “তুমি এখন ফিরে যাও এবং শিশুটিকে দুধ পান করাও। আর যখন শিশুটির দুধ পান করানো শেষ হয়ে যায় তখন আমার কাছে এসো।”

সেই মহিলাটি নিজের সন্তানকে নিজের কোলে নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল এবং দুধ পান করাতে লাগল। এরই মাঝে তার ঈমান দিন দিন বৃদ্ধিই

পেতে লাগল। তার হৃদয়ে অনড় পাহাড়ের ন্যায় ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে দীদারে ইলাহীর আকাঙ্ক্ষায় বিভোর এবং দিনে দিনে সে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকটতম হতে চলল। সে তো সেই জান্নাতের অন্বেষণে অনুসরণ ও বন্দেগীর এক মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিল যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আর যার দরজা খালেস তওবাকারীদের জন্য সদা উন্মুক্ত থাকে।

যখন শিশুটি বুকের দুধ ছেড়ে দিল আর মহিলা শিশুটিকে অল্প সময়ে রুটি খাওয়া শিখিয়ে দিল। এরপর তার হাতে এক টুকরা রুটি দিয়ে তাকে নিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাজির হয়ে গেল এবং বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশুটিকে হাতে নিলেন। এমন মনে হচ্ছিল যে, তিনি যেন তার শিশুটিকে নিয়ে তার অন্তরকে টেনে বের করে নিয়ে আসছেন; কিন্তু কিছুই করার ছিল না। আল্লাহর নির্দেশ ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদালত ছিল। ইসলামী হুকুমতের এটাই বিধান যে, সকল মানুষ এক। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«مَنْ يَكْفُلْ هَذَا وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ»

অর্থঃ “যে এই শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব নিবে, সে আমার সাথে জান্নাতে অবস্থান করবে দু’টি অঙ্গুলীর ন্যায়।

এক আনসারী সাহাবী শিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে নিল। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে এই মহিলার বুক বরাবর এক গর্ত করা হল এবং মহিলাকে তাতে দাঁড় করিয়ে মাটি ঢালা হল। এরপর লোকজন চারিদিক থেকে তার উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষাল। খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও একটি পাথর তার মাথায় নিক্ষেপ করলেন যার দ্বারা রক্তের ছিটে তার চেহারায়ে এসে পড়ল। খালেদ মহিলাকে গালমন্দ করল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কথা শুনে বললেনঃ

«مَهْلًا يَا خَالِدُ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ»

“চুপ থাক হে খালেদ! শপথ সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! এই মহিলা এমন তাওবা করেছে যে, যদি অবৈধ কর ধার্যকারীও এমন তাওবা করে তবুও তার ক্ষমা হয়ে যাবে।” (মুসলিমঃ ১৬৯৫)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে সেই মহিলা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর উপর কাপড় ভাল করে বেঁধে দেয়া হল। এরপর তার নির্দেশে পাথর নিক্ষেপ করা হল। এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার জানাযার নামায পড়েন। উমর বিন খাতাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ

«تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ! وَقَدْ زَنْتُ؟»

“হে আল্লাহর নবী! আপনি তার জন্য জানাযার নামায পড়তে যাচ্ছেন অথচ সে জিনা করেছিল?”

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেনঃ

«لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟»

“সে এত নিষ্ঠার তাওবা করেছে যে, যদি ৭০ জন মদীনাবাসীর মধ্যে তার তাওবা ভাগ করে দেয়া হয় তবে তাদের সকলের গুণাহ মাফ হয়ে যাবে। তুমি কি এই মহিলার তাওবা থেকে অধিক তাওবাকারীকে দেখেছ, যে নিজের প্রাণ খুশি খুশি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছে ?

(মুসলিমঃ ১৬৯৬)

এই ঘটনা হাদীসের কিতাবে এবং সীরাতের কিতাবে বিশুদ্ধ বর্ণনাকারীর মাধ্যমে উল্লেখিত হয়েছে।

ইসলামী আদর্শে পাবন্দ এক নারী

একবার আমি অফিসের কাজে জেদ্রায় যাচ্ছিলাম। রাস্তায় এক ভয়ানক দুর্ঘটনা দেখে ঘাবড়ে গেলাম। মনে হল এই মাত্রই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি আমার গাড়ী থামিয়ে গাড়ীর ভেতর দৃষ্টি দিলাম। সাথে সাথে আমার হাত-পা কাঁপতে শুরু করল। আমার চক্ষুদ্বয় পানিতে ভেসে গেল।

এটা এক আশ্চর্যজনক দৃশ্য ছিল। দুঃখ ও বেদনার দৃশ্য। গাড়ীর চালক স্টিয়ারিংয়ের উপরেই মৃত পড়ে ছিল। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে উঠে আছে। চেহারার উপর তার মুচকি হাসির চিহ্ন ছিল। তার দাড়ি ছিল ঘন এবং চেহারা এমন নূর চমকাচ্ছিল যেমন সূর্য নিজের আলো বিকিরণ করে থাকে অথবা চমকায়।

অদ্ভুত এক দৃশ্য। তার নিষ্পাপ শিশু তার পিঠে ঝুলে ছিল সে তার ছোট ছোট হাত দ্বারা বাবার গর্দান ধরে রেখেছে। আর সেও তার প্রাণ হারিয়েছে।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” আমি কখনো এমন মৃত্যু দেখিনি। পবিত্র মৃত্যু। শান্তিপূর্ণ মৃত্যু। তার শাহাদাতের অঙ্গুলী খাড়া অবস্থায় ছিল। তার শাহাদাতের অঙ্গুলী দ্বারা বুঝা যাচ্ছিল যে, আল্লাহর একত্বের কথা স্বীকার করে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। মুচকি হেসে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা এটাই প্রমাণ করছিল যে মৃত্যু খুবই স্বস্তি ও আরামদায়ক হয়েছে।

আমি এই উত্তমভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দৃশ্য দেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলাম এবং ভাবলাম

«كَيْفَ سَيَكُونُ رَجُلِي؟»

“আমার মৃত্যু কোন অবস্থায় হবে?”

এই প্রশ্ন আমার মস্তিষ্কে আঘাত করছিল এবং মৃত্যুকে অবহেলার পর্দা খুলে যাচ্ছিল ভীতি ও আশঙ্কার দরুণ আমার নয়ন জলে ভাসছিল এবং আমার নিঃশ্বাসের আওয়াজ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেখানে যদি আমাকে কেউ দেখত তবে ভাবত যে আমি মৃত ব্যক্তির কোন নিকটাত্মীয়।

আমি এত জোরে কাঁদছিলাম যেমন কোন মা তার মৃত শিশুর জন্য কাঁদে। আমার এই অনুভূতিও হচ্ছিল না যে, আমার পার্শ্বে কেউ আছে।

এমনি সময় আমার কানে এক মহিলার আওয়াজ আসল, যে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও দৃঢ়তার সাথে কথা বলছিল। তার আওয়াজে অনুভূতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। সে বলছিলঃ ভাই সাহেব! আপনি মৃতের উপর অশ্রু বরাবেন না। তিনি এক পরহেয়গার ব্যক্তি ছিলেন। আমাদেরকে গাড়ীর ভেতর থেকে বের করতে চেষ্টা করুন। আল্লাহ যেন আপনাকে উত্তম প্রতিদান দেন। আমি আওয়াজের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখি গাড়ীর পেছনের আসনে এক মহিলা দু'টি ছোট ছোট শিশু বুকে জড়িয়ে বসে আছে যাদের শরীরে আঘাত লাগে নি। তারা সবাই নিরাপদে ছিল।

মহিলাটি পরিপূর্ণ পর্দায় আবৃত ছিল এবং প্রাণ কেড়ে নেয়া দুর্ঘটনা সত্ত্বেও স্থিরতার সাথে ছিল। কোনরূপ কান্না কাটি করছিল না। আর না চিৎকার, আর না সে কোনরূপ হা-হতাশ করছিল। আমরা গাড়ীর ভেতর থেকে তাদের বের করলাম।

যে কেউ আমাকে আর সেই মহিলাটিকে দেখত তবে বুঝত যে, মহিলার কোন সমস্যা হয়নি; বরং আমি মুসিবতে পড়েছি।

মহিলাটি হিজাব ঠিক ঠাক করে এবং সমস্ত শরীর ভালরূপে ঢেকে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হৃদয়ে দৃঢ়তার সাথে বলতে লাগলঃ যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে তবে আমার স্বামী ও শিশুটিকে নিকটবর্তী কোন হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করুন। গোসল ও কাফনের দ্রুত ব্যবস্থা করুন। আর আমাকে ও দু'টি শিশুসহ আমাদের বাড়ী পৌঁছে দিন।

কিছুলোক দ্রুত মহিলার স্বামী এবং শিশুটিকে নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছে দিল এবং প্রয়োজনীয় কার্যাদি শেষ করার পর নিকটবর্তী কবরস্থানে নিয়ে গেল। অন্যান্য উপস্থিত লোকজন সেই মহিলাটিকে বলল যে, সে আমাদের কারো গাড়ীতে উঠে যাতে তাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয়; কিন্তু মহিলা অত্যন্ত লজ্জিত ও দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করে বললঃ

«لَا وَاللَّهِ! لَا أَرْكَبُ إِلَّا فِي سَيَّارَةٍ فِيهَا نِسَاءٌ»

“আল্লাহর কসম! আমি কেবল সেই গাড়ীতে যেতে পারি যে গাড়ীতে কতক মহিলাও থাকবে।”

এরপর মহিলাটি নিজের দু’টি বাচ্চাকে নিয়ে একদিক হয়ে গেল। আমরা তার ইচ্ছা কিভাবে পূর্ণ করতে পারি? অনেক সময় পার হয়ে গেল আমরা পেরেশানীর সাথে জনমানবহীন স্থানে দু’ঘণ্টা অনবরত অপেক্ষা করতে থাকলাম। ইতিমধ্যে আমাদের পার্শ্বে এক গাড়ী এসে থামল যার ভেতরে এক পুরুষ এবং তার সমস্ত পরিবার ছিল। তাকে আমরা দুর্ঘটনার কথা জানালাম এবং তার কাছে আবদার করলামঃ মেহেরবানী করে এই মহিলাকে তার সন্তানসহ বাড়ী পৌঁছে দেয়ার। সেই ব্যক্তি রাযী হল এবং তাদের নিয়ে বাড়ীর দিকে যাত্রা করল। এরপর আমি আমার গাড়ীতে ফিরে আসলাম এবং আমি আমার ঠিকানার জন্য যাত্রা করলাম। আমি এই মহিলার আদর্শপূর্ণ দৃঢ়তার প্রতি আশ্চর্য হচ্ছিলাম। শেষ মুহূর্তে তার স্বামীর ইসলামের উপর অবিচলতা আর ঈমানী শাহাদাত এবং এই মুমূর্ষ অবস্থায় তার স্ত্রীর পূর্ণ পর্দা অবস্থায় ঈমানী প্রেরণায় উজ্জ্বলিত হয়ে দৃঢ়তার সাথে কথা বলা ও ইসলামী আদর্শ মত পুরাপুরি আমল করা এরই নাম ঈমান!

এর বাস্তবতা আল্লাহ তায়ালা বাণী থেকে বুঝা যায়ঃ

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾

অর্থঃ “মু’মিন বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা দৃঢ় কথার সাথে দৃঢ়তা দেন দুনিয়ার জীবনেও এবং আখেরাতেও। আর যালেমদের আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন। আর আল্লাহ যা চান তা করেন।” (সূরা ইবরাহীমঃ ২৭)

উপস্থিত জবাব

আহমদ বিন আবু তাহির খুবই কুৎসিত লোক ছিল। তার কাছে এক দাসী ছিল যে খুবই সুন্দরী ছিল। একদিন সে তার দাসীর কাছে আসল আর তাকে দেখে মুচকি হাসল; কিন্তু দাসী তাকে দেখে বিরক্ত হল।

দাসীর বিরক্তভাব দেখে আহমদ বিন আবু তাহির বললেনঃ আমি তোমার সৌন্দর্য দেখে হাসছি আর তুমি কিনা বিরক্ত বোধ করছ?

দাসী তৎক্ষণাত উত্তর দিলঃ

«نَظَرْتُ إِلَى مَا سَرَّكَ فَضَحِكْتَ وَنَظَرْتُ إِلَى مَا سَاءَنِي
فَعَبَسْتُ»

“আপনাকে যা আনন্দ দেয় তা দেখে আপনি হাসছেন আর আমার যা খারাপ লাগে তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বিরক্ত হয়েছি।”¹

1. আরবী সাপ্তাহিকঃ ১৭৯/৪৪৪, মেয়েলোকের বুদ্ধিমত্তাঃ ১১৯।

মোবারক কবরস্থান

শাইবানী বর্ণনা করেনঃ একবার আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এক বেদুঈন মহিলার তাঁবুতে অবতরণ করলেন। মহিলার কাছে এক মুরগী ছিল যার লালন-পালন খুব যত্ন দিয়ে করছিলেন। সে মুরগি জবাই করল এবং রান্না করে আব্দুল্লাহ বিন জাফরের (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) খেদমতে পরিবেশন করলেন এবং বললেনঃ আবু জাফর! এই মুরগীটি খুব যত্ন দিয়ে লালন-পালন করেছিলাম। ভাল ভাল খাদ্য খাওয়াতাম। রাতে এর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতাম। আমি একে নিজের সন্তানের মতই মনে করতাম। আমি মানত করেছিলাম যে, আমার প্রিয় মুরগিটি কোন মোবারক কবরস্থানে দাফন করব। আমি আপনার পেটের থেকে অধিক মোবারক কবরস্থান আর পাইনি।

এজন্য আমি আমার প্রিয় মুরগিটি জবাই করে রান্না করে আপনার জন্য পরিবেশন করলাম এবং তা আপনার পেটে দাফন করতে চাই। একথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হাসলেন এবং তাকে পাঁচশত দিরহাম দেয়ার নির্দেশ দিলেন।^১

১. আল-আবুদুদুল ফরিদঃ ৪/৫৯, মেয়েলোকের বুদ্ধিমত্তাঃ ৫৭।

যুলুমের বৃক্ষে মেওয়া ফলে না

সে এক বৃদ্ধ মহিলা যার সাতটি সন্তান ছিল। স্বামী কিছুদিন আগে তাকে রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। মহিলা ও তার সন্তানগণ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। এজন্য বড় ছেলেকে মা এবং ভাইদের লালন-পালনের দায়িত্ব পালনে নিজের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করতে হল।

সুতরাং সে তার পিতার দোকানে কাজ করতে লাগল; কিন্তু তিন বছর পর সরকার তাকে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীর ট্রেনিংয়ের জন্য ডাকল। যার জন্য তাদের সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেল। বাড়ীতে এ নিয়ে আলোচনা হতে লাগল যে, সে প্রশিক্ষণে চলে গেলে সংসার কে চালাবে?

পরামর্শ নেয়া হল বিভিন্ন জনের কাছ থেকে। বলা হল যে, যদি সরকারের ভাণ্ডারে ৪০০ দীনার জমা করে দেয়। তবে এই বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ থেকে মুক্তি পাবে। এখন কথা হল এত বিশাল পরিমাণ অর্থ কোথায় থেকে জোগাড় করবে। পরস্পর পরামর্শে সিদ্ধান্ত হল যে, বাড়ী বন্ধক (রেহান) রেখে ৪০০ দীনার ব্যবস্থা করা হোক।

সুতরাং সরকারের কাছে আবেদন জমা দেয়া হল যে, আমরা অর্থ জমা দেব। আর সেখান থেকে আবেদন মঞ্জুর করা হল যে, অমুক তারিখ পর্যন্ত অর্থ জমা দিতে হবে অন্যথায় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে। এবার তাই করা হল এবং অর্থের যোগান দিতে প্রচুর সময় ব্যয় হল। অর্থ জমা দেয়ার জন্য নিকটতম শহর যা ২৪০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত যাওয়ার ব্যাপার ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই নির্দিষ্ট দিনটি চলে আসল আর অর্থ বৃদ্ধ মার কাছে জমা হল। অর্থ জমা দেয়ার আর মাত্র একদিন বাকী ছিল। আসরের সময় হল। সে একাই বাস টার্মিনালে গেল এবং জানতে পারল যে শেষ বাস চলে গেছে। যদি যথেষ্ট পরিমাণ মুসাফির চলে আসে তবে অন্য বাস যাত্রা করবে। আর না হলে পরদিন যাবে। বৃদ্ধ মহিলার পেরেশানী বৃদ্ধি পেল যে, আমাকে অবশ্যই রাতে পৌঁছতে হবে আর আগামীকাল হল অর্থ জমা দেয়ার শেষ দিন।

সে অনেক সময় মুসাফিরের অপেক্ষায় থাকল; কিন্তু সে দিন আর কোন মুসাফির আসল না। টার্মিনালের লোকজন তাকে পরামর্শ দিল যে, সে যেন ট্যাক্সি দিয়ে চলে যায়। সমস্যার এটি একমাত্র সমাধান।

সুতরাং এক ট্যাক্সি নিয়ে রওয়ানা হল। যখন গাড়ী শহর থেকে অনেক দূর চলে আসল তখন ড্রাইভার বৃদ্ধার সাথে কথা বলতে শুরু করল এবং জিজ্ঞেস করল যে, তার এত কি প্রয়োজন ছিল যে, এত বেশী খরচ করে ট্যাক্সি ভাড়া করে সেই শহর অভিমুখে যাত্রা করেছে? বৃদ্ধ মহিলা সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। যখন ড্রাইভার শুনল যে তার কাছে ৪০০ দীনার আছে তখন তার নিয়ত খারাপ হয়ে গেল। এটা এক বৃদ্ধ মহিলা। কেউ জানতে পারবে না। আমি রাস্তায় তাকে শেষ করে দিব। পাহাড়ের মাঝখানে ট্যাক্সি চলছিল। হঠাৎ এক ঝটকায় গাড়ি থেমে গেল বৃদ্ধ মা চোখ খুলল, কি হয়েছে? গাড়ী হয়ত খারাপ হয়ে গেছে।

ঠিক আছে আমি দেখছি, ড্রাইভার নীচে নামল। রাত ঘনিয়ে আসছিল। রাস্তা একেবারে জনশূন্য ছিল। আম্মা বাইরে বের হও। গাড়ীতে ঠেলা দিতে হবে। ঠিক আছে আল্লাহ মঙ্গল করুন। রাত হয়ে যাচ্ছে, এই গাড়ী কি করে খারাপ হয়ে গেল। ভীত হলেন। যখন তিনি বের হলেন তাকে ড্রাইভার জোরে আঘাত করল এবং দীনার ছিনিয়ে নিল।

বৃদ্ধা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রাস্তা থেকে কিছু দূরে সম্ভবত জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। রক্ত অনবরত বইছে, এরপর হুশ হারিয়ে ফেলেছে। অন্যদিকে ট্যাক্সি ড্রাইভার ভাবল আমাকে এই স্থান দ্রুত ত্যাগ করতে হবে। কোথাও কোন গাড়ী চলে না আসে। আমি ধরা না পড়ি।

তার গন্তব্য স্থান শহর ছিল। যেখানে সেই বৃদ্ধ মহিলা যাওয়ার উদ্দেশ্যে তার গাড়ীতে যাত্রা করেছিল। যখন সে বাস স্টপেজে পৌঁছল সাথে সাথে সে গাড়ী ভর্তি মুসাফির আরোহী পেয়ে গেল। এবার সে রাস্তায় ফিরে আসছিল। তখন গভীর অন্ধকারের রাত্রি। হত্যাকারী যতই শক্তিশালী

নার্ভের মালিক হোক তার ভেতরের অনুভূতি তাকে দুর্বল করে দেয়। তার রূহ তাকে ধিক্কার দিচ্ছিল। এটা তুমি কি করলে?

যখন সে সেই স্থানে পৌঁছল যেখানে বৃদ্ধাকে হত্যা করেছিল এবং অর্থ ছিনিয়ে নিয়েছিল, তখন তাকে এক অদৃশ্য শক্তি বাধ্য করল যে, সে গাড়ী থামিয়ে মহিলাকে দেখে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে মহিলাটি কি এখনও জীবিত না কি মৃত? এরপর সে হঠাৎ গাড়ী ব্রেক করল। ট্যাক্সির মুসাফির সবাই ঘুমে নিমজ্জিত ছিল। আর ভিতরে অন্ধকার ছিল। সে গাড়ীর লাইট মহিলার উপর ফেলল এবং দেখতে পেল যে, এখনো নড়ছে। মুসাফিররা মনে করল যে, ড্রাইভার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে গাড়ী থেকে নেমেছে। যখন কাছে পৌঁছল তখন মহিলাটি ক্ষীণ কঠোর আওয়াজ করছিল। সে বলল অভিশপ্ত নারী তুমি এখনো জীবিত। সে এদিক সেদিক তাকাল একটি বড় পাথর নজরে পড়ল। এখনই দেখছি তুমি আর কতক্ষণ জীবিত থাকতে পার।

বৃদ্ধা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে দয়ার আবদার করল; কিন্তু অভিশপ্ত লোকটিকে শয়তান পরিপূর্ণ গ্রাস করে রেখেছিল। সে পেছনে সরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধাকে পরিপূর্ণ মৃত্যুর নিশ্চিত করতে পাথর উপরে উঠিয়ে সমস্ত শক্তিতে আঘাত করতে প্রস্তুত হল। মুহূর্তের ব্যাপার ছিল। এখনো তার হাতে পাথর ছিল সে জোড় গলায় চিৎকার করল। সমস্ত উপত্যকা তার আওয়াজে ভেসে গেল। ট্যাক্সির মুসাফিরও ভয়ে বাইরে বের হল। গাড়ীর আলোতে তারা আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখতে পেল। ড্রাইভার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁপছিল। এক ভয়ঙ্কর অজগর সাপ তাকে দংশন করে দ্রুত পাহাড়ের উপর চড়ে যাচ্ছিল।

মূলতঃ যখন সে পাথর উঠিয়ে ছিল তখনই সেখানে সাপটি ছিল। এরপর দেখতে দেখতে ড্রাইভারের মৃত্যু হল।

মুসাফিরগণ দ্রুত বৃদ্ধা মহিলার কাছে গেল। সে তখনো জীবিত ছিল। তাকে পানি পান করাল এবং তাকে উঠিয়ে গাড়ীতে নিল। এক মুসাফির

ড্রাইভিং করল আর নিকটতম হাসপাতালে তাকে ভর্তি করল। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করল।

দ্বিতীয় দিন যখন মহিলার জ্ঞান ফিরল তখন পুলিশ তার কাছ থেকে প্রকৃত ঘটনা জানতে চাইল। এরপর বৃদ্ধ মহিলা সব কিছু বিস্তারিত পুলিশকে জানালে পুলিশ অপরাধীর পোশাক থেকে লুটে নেয়া দীনার উদ্ধার করল। বৃদ্ধ নিজের সন্তানকে সংকটপূর্ণ অবস্থাতেই বলল যে, এই সম্পদ নিয়ে দেৱী না করে সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ে জমা করে নিজেকে মুক্ত কর। এরপর তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল এবং দ্বিতীয়বার আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল; কিন্তু তার মৃত্যু হয়নি এবং একদিন সে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।

পাঠকবৃন্দ! এ ঘটনা বর্ণনাকারী কোন সাধারণ লোক নন যে একটি ঘটনা শুনে যাচাই না করে লিখে দিয়েছেন। বরং মাহমুদ শীত খাতাব যিনি নিজে গিয়ে বৃদ্ধার কাছে প্রকৃত ঘটনা জানেন। তিনি সেই বৃদ্ধার নতুন বাড়ী গিয়েছেন যে বাড়ী সে তার বিপদজনক ঘটনার পর তৈরী করেছিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেনঃ হে রমণী! যখন তুমি উপত্যকায় লুটে পড়েছিলে তখন তুমি কি প্রার্থনা করেছিলে?

সে উত্তর দিল আমি এই প্রার্থনা করছিলামঃ

«يَا جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ أَعْلَمُ بِحَالِي فَهَيِّئْ لِي
بِقُدْرَتِكَ الْقَادِرَةِ أَسْبَابَ دَفْعِ الْبَدَلِ النَّقْدِيِّ عَنْ وَلَدِي،
لِيَعُودَ إِلَى أَهْلِهِ وَيُعِيلَهُمْ... يَا رَبَّ»

“হে আসমান-যমীনের পরাক্রমশালী! তুমি আমার অবস্থা সম্পর্কে সবই জান। সুতরাং তুমি তোমার পূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা আমার সন্তানের পক্ষ থেকে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করে দাও যাতে সে নিজের ঘরের সংসারের খরচাদি বহন করতে পারে। হে পরোয়ারদিগার তুমিই একমাত্র আমার কথা শুনতে পার।”

লক্ষ্য করুন! মার মমতা এবং তার আত্মোৎসর্গের মহত্ত্ব। তিনি তার রক্তে রঞ্জিত শারীরিক অবস্থার প্রতি মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি একথাও ভাবছেন না যে, এখন অল্পসময়ের মধ্যে তার প্রাণ প্রদীপ নিভে যেতে পারে এবং তিনি এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন; বরং তিনি যে বিষয় নিয়ে চিন্তিত তা কেবল তার সন্তানগণ কিভাবে লালিত-পালিত হবে? তাদের জীবিকা উপার্জন কে করবে?

তার প্রার্থনার পর বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অজানা এক সমাধানের ফয়সালা এসে যায়ঃ

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا﴾

অর্থঃ “কে আছে যে দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দেয় এবং তা গ্রহণ করে এবং বিপদমুক্ত করে এবং তোমাদেরকে এই পৃথিবীর খলীফা নির্ধারণ করে? আল্লাহ তায়ালার সাথে কি আরো কোন উপাস্য রয়েছে? তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।” (সূরা নামলঃ ৬২)
(মাহমুদ শীতের আদালাতুস সামা)

চাঁদনী রাতে

খলীফা হারুন রশীদ একবার রাণীর সাথে চাঁদনি রাতে বসা ছিলেন।
রাণীর অপরূপ সৌন্দর্য দেখে অনিচ্ছায় মুখ থেকে বেরিয়ে আসলঃ

«إِنْ لَمْ تَكُونِي أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ»

“তুমি যদি চাঁদ থেকে বেশী সুন্দরী না হয়ে থাক তবে তুমি তালাক।”

তাঁর মুখ থেকে একথা তো বেরিয়ে গেল; কিন্তু এখন তিনি আফসোস
করছিলেন যে আমি একি বলে দিলাম। এরপর তিনি সে যুগের বড় বড়
উলামাদের কাছে এ সম্পর্কে সমাধান চাইলেন।

সকলেই বললেনঃ তালাক হয়ে গেছে; কিন্তু সে সময়ের বিখ্যাত
আলেম ইয়াহইয়া বিন আকছাম সকলের বিরোধিতা করে সমাধান দিলেন
যে, তালাক হয়নি।

জিজ্ঞেস করা হলঃ কিসের উপর ভিত্তি করে আপনি মাশায়েখদের
ফতোয়ার বিরোধিতা করেছেন?

ইয়াহিয়া বিন আকছাম বললেনঃ ফতোয়া ইলম ও প্রমাণের ভিত্তিতে
দেয়া হয়। আর এই বিষয়ে প্রমাণের ভিত্তিতেই ফতোয়া দিয়েছি।

আল্লাহ তায়ালার বাণীঃ

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾

অর্থঃ “নিশ্চয় আমি মানবজাতিকে সর্বোত্তম আকৃতিতে, গঠন-গড়ন
দিয়ে সৃষ্টি করেছি।” (সূরা ত্বীনঃ ৪)

বিধবার জন্যে জলে স্থলে ব্যবসা

ঐতিহাসিকগণ তাদের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, এক মহিলা আল্লাহর নবী দাউদ (আলাইহিস সালাম)-এর দরবারে হাজির হন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ হে আল্লাহর নবী! আপনার পালনকর্তা প্রভু কি ন্যায় বিচারক না কি যালিম?

দাউদ (আলাইহিস সালাম) বললেনঃ হে নারী! তুমি ধ্বংস হও। তুমি কি বলছ। আল্লাহ তায়ালার সবকিছুই ইনসাফ তিনি বিন্দু পরিমাণও যুলুম ও অন্যায় বিচার করেন না। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি এমনটি কেন বলছ? কি তোমার রহস্য?

সে তার ঘটনা বর্ণনা শুরু করলঃ হে আল্লাহর নবী! আমি এক বিধবা নারী। আমার তিনটি বাচ্চা আছে যাদের প্রতিপালন আমি সূতা বুনে বুনে করে থাকি। আমি সারা দিন আর কখনো ও সারা রাত জেগে সূতা বুনি। গতকাল আমি আমার বুনা সূতা একটি লাল কাপড়ে বেঁধে বিক্রির জন্যে বাজারে যেতে চাচ্ছিলাম যেন এর আয় দিয়ে বাচ্চাদের খাবারের ব্যবস্থা করি; কিন্তু হঠাৎ এক বড় পাখি তা গোশত মনে করে নিয়ে উড়ে গেল। এখন আমার কাছে কিছুই নেই যে, নিজের সন্তানদের খাবার দিতে পারি।

মহিলা তার ঘটনা বর্ণনা দিচ্ছিল ইতিমধ্যেই নবী (আলাইহিস সালাম)-এর দরজায় আওয়াজ হল। আল্লাহর নবী আগতদেরকে আসার অনুমতি প্রদান করলেন। অনুমতি পাওয়া মাত্র দশজন ব্যবসায়ী একের পর এক প্রবেশ করল, যাদের প্রত্যেকের হাতে একশত করে দীনার ছিল।

ব্যবসায়ীরা বললঃ আল্লাহর নবী! আমরা সকলেই এক নৌকাতে ছিলাম। হঠাৎ সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড় উঠল, যে কারণে আমাদের নৌকার একপাশে ছিদ্র হয়ে যায় এবং পানি ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে থাকে। আমাদের সামনে মৃত দেখছিলাম। আমরা মানত করলাম যে, যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করেন তবে প্রত্যেকেই একশ' দীনার করে দান করবে। জাহাজে পানি দ্রুত প্রবেশ করছিল। আমাদের কাছে এমন কিছুই ছিল না যার দ্বারা সেই ছিদ্রকে বন্ধ করি।

একদিকে আমরা মানত করলাম অন্যদিকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন। এক অনেক বড় পাখি ডাকতে ডাকতে নৌকাতে আসল। এর পাঞ্জায় এক লাল কাপড়ের পুটলি ছিল। দেখতে দেখতে সে তা জাহাজে ফেলে দিল। আমরা তা হাতে নিলাম তাতে বুনা সূতা ছিল। আমরা তা দিয়ে জাহাজের ছিদ্র বন্ধ করলাম। আর তাতে প্রবেশ করা পানি হাত দিয়ে বাইরে ফেললাম। অল্প সময় পর সমুদ্রের ঝড় থেমে গেল। আর এভাবে আমরা মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে আসলাম। এখন আমাদের দান আপনার হাতে দিচ্ছি, আপনি যাকে চান তাকে দান করুন।

এই ঘটনা শুনে দাউদ (আলাইহিস্ সালাম) বিধবা মহিলার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ

«رَبُّ يَتَجَرُّ لَكَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَتَجْعَلِيْنَهُ ظَالِمًا؟»

“পালনকর্তা প্রভু তোমার জন্য জলে স্থলে বাণিজ্য করছেন আর তুমি তাকে অন্যায় বিচারক বলছ?”

এরপর আল্লাহর নবী (আলাইহিস্ সালাম) সে সব দীনার এই মহিলার হাতে সোপর্দ করলেন এবং বললেনঃ যাও এই অর্থ দিয়ে তোমার সন্তানদের জন্যে ব্যয় কর। (মাজালিসুন নেসা)

জননীর প্রতি শ্রদ্ধা

ইসলাম মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়। আসুন আমরা দেখি যে, ইসলামের কতিপয় খ্যাতনামা উম্মতের শিরোমণিদের ও বিখ্যাত পণ্ডিতদের ব্যবহার মার সাথে কেমন ছিল:

ইমাম মোহাম্মদ বিন সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ) নিজের মাতার সাথে উত্তম ব্যবহারের প্রতি এত বেশী খেয়াল রাখতেন যে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন:

«وَاللّٰهُ! مَا ارْتَفَعْتُ سَطْحَ بَيْتٍ وَوَالِدَتِي فِي الْبَيْتِ لِيَّلًا اُرْتَفَعَ عَلَيْهَا»

অর্থঃ “আল্লাহর কসম! নিজের শ্রদ্ধেয় মা ঘরে থাকা অবস্থায় আমি কখনো ছাদে উঠিনি যাতে আমি তার থেকে উঁচু হয়ে যায়।”

ইমাম ইবনে সীরীনের নিয়ম ছিল যে, তার মার খাবার নিজেই পরিবেশন করতেন। যতক্ষণ না তার মা খাবার খাওয়া শুরু করতেন ততক্ষণ তিনি আরম্ভ করতেন না। এমনকি মার সাথে এক প্লেটে খাবার খেতেন না।

যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, এর কারণ কি?

উত্তরে তিনি বললেন:

«أَخْشَى أَنْ تَقَعَ عَيْنُهَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخُذَهُ فَأَكُونُ عَاقِبًا»

অর্থঃ “আমি ভয় পাই যে, আমার মার দৃষ্টি এমন জিনিসের প্রতি পড়ে যা আমি খেয়ে নিই এবং নাফরমান হয়ে যায়।”

ইমাম ইবনে সীরীনের নীতি ছিল যে, যখনই নিজের মার সাথে বসতেন নিজের দৃষ্টি উপরে রাখতেন না; বরং নিজের দৃষ্টি নীচে রাখতেন। কেউ এই দৃশ্য দেখলে তাকে ক্রয় করা দাস মনে করত।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলও এমনই ছিলেন। তিনি নিজেকে মায়ের সেবক মনে করতেন। তিনি তার মায়ের কাপড় নিজের হাতেই ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। তার জন্যে খাবার রান্না করে পরিবেশন করতেন এবং তার মায়ের সমস্ত প্রয়োজনাঙ্গী পূরণ করতেন।

কেননা তিনি তার গ্রন্থ মুসনাদে আহমাদে এই হাদীস বর্ণনা করেন যে, একবার মুয়াবিয়া বিন জাহেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে হাজির হন এবং বলেনঃ

«يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَدْتُ الْغَزَا، وَجِئْتُكَ أَسْتَشِيرُكَ»

অর্থঃ “হে আল্লাহর রাসূল! আমি জেহাদে যেতে চাই এবং আমি আপনার পরামর্শ নেয়ার জন্যে উপস্থিত হয়েছি।”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করলেনঃ

«هَلْ لَكَ أُمٌّ؟»

“তোমার মা কি (জীবিত) আছেন?”

মুয়াবীয়া বিন জাহেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ জ্বী হ্যা!

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«الزَّمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا»

“নিজের মায়ের সেবা কর কেননা জান্নাত তার দু’পায়ের নীচে।”

নারীদের বিষয়ে একটি হাদীস

একবার আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এই হাদীসটি বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ

«لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا»

“যদি তোমাদের নারীরা মসজিদে নামায আদায়ের জন্য অনুমতি চায় তবে তাদেরকে মসজিদে যেতে বাঁধা দিও না।”

এটা শুনে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ছেলে বিলাল দৃঢ়তার সাথে বললঃ

«وَاللَّهِ! لَنَمْنَعُهَا»

“আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে বাঁধা দিব।”

বিলালের কথা শুনে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে গালমন্দ করলেন। অথচ তিনি সাধারণত এমন কথা বলতেন না। অতঃপর তিনি বললেনঃ

«أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُ: وَاللَّهِ! لَنَمْنَعُهَا»

“আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস শুনাচ্ছি আর তুমি আমাকে বলছ যে, আল্লাহর কসম! আমরা মহিলাদের মসজিদে আসতে অবশ্যই বাঁধা দিব।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নিজের ছেলের বুকে এক ঘুষি মারলেন এবং বললেনঃ

«أَحَدْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُ أَنْتَ: نَمْنَعُهَا»

“আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস শুনাচ্ছি আর তুমি বলছ যে, তাদেরকে অবশ্যই মসজিদে আসতে বাঁধা দিবে।”^১

এ ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সালাফে সালেহীনের কাছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের কত গুরুত্ব ছিল।

১. মুসলিমঃ ৪৪২।

মুসলিম মুজাহিদদের প্রথম সমুদ্র অভিযান

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মে হারাম বিনতে মালহান (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বাড়ী প্রায়ই যেতেন। আর তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খাবার খাওয়াতেন (উলামাদের সম্মিলিত অভিমত হল যে, উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাহরাম- (এমন নিকটাত্মীয় যার সাথে আজীবন বিয়ে বৈধ নয়) ছিলেন। আর উম্মে হারাম ছিলেন উবাদা বিন সামিতের সহধর্মিণী)।

একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কাছে আসলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খাবার খাওয়ালেন এবং বসে তার মাথায় চিরুনী দিয়ে চুল আঁচরে দিচ্ছিলেন কিছুক্ষণের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুমিয়ে গেলেন। আবার অল্পক্ষণ পর হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন।

উম্মে হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন বস্তু আপনাকে হাসাল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُرَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَرْكُبُونَ
تَبَجَ الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ»

“আমার উম্মতের কতক লোক আমাকে দেখানো হল যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য গভীর সমুদ্রে জাহাজে এমনভাবে আরোহিত আছে যেমন শাহী আসনে বাদশাহ বসে থাকে।”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুশি হলেন যে, শীঘ্রই তার অনুসারীগণ আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদ হয়ে সমুদ্র পাড়ি দিবে এবং বিশ্বের প্রতি প্রান্তে কালেমা “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”র পতাকা উত্তোলন করবে।

সুতরাং উম্মে হারাম জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহ তায়ালায় কাছে প্রার্থনা করুন যে, তিনি যেন আমাকে সেই মুজাহিদদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার হাসতে হাসতে জেগে উঠলেন।

উম্মে হারাম জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন বিষয় আপনাকে হাসাল? তিনি উত্তরে বললেনঃ আমার উম্মতের কতক লোক জেহাদের জন্য যাচ্ছিল। তাদের এই অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হল যেমন প্রথম বর্ণনা দিয়েছি।

উম্মে হারাম আবদার করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালায় কাছে প্রার্থনা করুন যে, আমাকে তাতে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ»

“প্রথম সমুদ্র অভিযানে তোমার অংশগ্রহণের ফয়সালা হয়ে গেছে।”

সুতরাং উম্মে হারাম বিনতে মালহান (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজের স্বামী উবাদা বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাথে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর শাসনামলে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাথে সমুদ্র অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। আর যখন সমুদ্র থেকে বের হয়ে সওয়ারীতে চলছিলেন তখন পড়ে গিয়ে শহীদ হয়ে যান।^১ (বুখারীঃ ২৭৮৮, মুসলিমঃ ১৯১২)

১. এটা রোম রাজ্যের খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে প্রথম সমুদ্র অভিযান ছিল। বিচারপতি ইয়াজ্জ বলেন যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের মতে এই যুদ্ধ উসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খেলাফত আমলে (২৫-৩৫ হিজরী) হয়েছিল। আর সে যুদ্ধে উম্মে হারাম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজের স্বামীর সাথে অংশ নিয়েছিলেন।

বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচ-গানের পরিণাম

বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমি খুবই ভালবাসতাম। আমি এক ধার্মিক মহিলা ছিলাম এবং আমার স্বামীও খুবই পরহেযগার ছিল। সে আমাকে বিয়ের লাগামহীন আনন্দ উল্লাসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে নিষেধ করত এবং পরপুরুষের সাথে মিশতেও নিষেধ করত আর আমাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিষয় থেকে দূরে থাকতে বলত।

কিন্তু আমি একদিন কোন ভাবে এক অনুষ্ঠানে চলে গেলাম। অনুষ্ঠানে মেয়েরা, মহিলারা সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিহিতা ছিল। তারা নাচ-গান করছিল। হৃদয়-কাড়া অঙ্গ-ভঙ্গিতে ব্যস্ত ছিল। আমিও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি নি। বোরকা খুলে নাচ-গানে অংশ নিলাম। আমি যেহেতু সুন্দরী-রূপসী ছিলাম এজন্য আমি চেয়েছিলাম সেখানের মহিলারা যাতে আমার প্রশংসা করে আর বাস্তবে তাই হল এবং তারা বলতে লাগল যে, আমি নববধূ থেকেও বেশী সুন্দরী। তাদের প্রশংসায় আমার ভেতরে সৌন্দর্যের অহংকার জন্ম নিল।

আজ আমি আমার স্বামীর কথা মানতে প্রস্তুত ছিলাম না। আমার স্বামী আমাকে এই হাদীসও শোনাতঃ

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا مِنْ سِتْرٍ»

“যে মহিলা নিজের স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও নিজের পোশাক খুলবে সে তার এবং তার প্রভুর মাঝে যে পর্দা তা নষ্ট করল।” (আহমদঃ ৬/৪১, আবু দাউদঃ ৩৭৫০, মুসতাদরেকে হাকিম, দারেমী ইত্যাদি।)

একদিন আমার স্বামী আরব উপসাগরীয় কোন দেশে ভ্রমণে গেল। সেখানে কোন এক অফিসে দুই যুবকের মাঝে এই বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হল যে, এই অঞ্চলের দেশগুলোতে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী মেয়ে কে?

এক যুবক তৎক্ষণাৎ এক ভিডিও ক্যাসেট উপস্থিত করল যা সে আমার দেশের কোন ব্যক্তি থেকে গোপনে অধিক দাম দিয়ে ক্রয় করেছিল। সেই ক্যাসেটে সেই অনুষ্ঠানের ভিডিও ছিল যাতে আমি অংশ নিয়েছিলাম। যখন যুবক ভিডিও ক্যাসেট চালু করল তখন আমার স্বামীর পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। যাতে আমি নাচ-গান করছিলাম। আমার চুল এলোমেলো ছিল। আর আমার অর্ধবুক শূন্য ছিল। অফিসের লোকজন আমার সৌন্দর্য দেখা পাগল পারা হয়ে ইস-ইস করছিল এবং বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে থাকে।

আর আমার স্বামীর ভিতর-ভিতর জ্বলে ছারখার হচ্ছিল, তার আভ্যন্তরীণ রাগ আরো ভয়ানক হচ্ছিল সে তৎক্ষণাৎ সফরের অন্য কাজ স্থগিত রেখে নিজ দেশে ফিরে এলো। বাড়ী এসে আমার সাথে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হল। এর ফল তাই হল যা যে কোন নারীর জন্য খুবই দুঃখজনক ও কষ্টকর।

এখন আমি তালাকপ্রাপ্ত। আমার জীবন কঠিন সংকটাপন্ন অবস্থায় অতিবাহিত হচ্ছে। আমাকে পতিত হতে হয়েছে চির লাঞ্ছনা ও অপমানের জিন্দেগীতে। আর এখন আমি একা জীবনের কঠিন সময় অতিক্রম করছি। আমার মুহূর্তের ভুল সারা জীবনের আনন্দ ছিনিয়ে নিয়েছে।

পরামর্শ

এক ব্যক্তি হাসান বিন আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর কাছে এসে বললেনঃ আমার এক কন্যা যৌবনে পা রেখেছে। আমাকে পরামর্শ দিন যে, তার বিয়ে কেমন ব্যক্তির সাথে দিব?

তিনি উত্তর দিলেনঃ তার বিয়ে এমন ব্যক্তির সাথে দাও যে আল্লাহকে ভয় করে এবং পরহেযগার হয়। যদি তাকে ভালবাসে তবে তার মূল্যায়ন করবেই; কিন্তু যদি সে তাকে ভাল না বাসে এবং তাকে ভাল না জানে তবুও তার উপর অত্যাচার করবে না, কষ্ট দিবে না, তার উপর কোন অন্যায় করবে না। এরপর তাকে বলা হল যে, অমুক অমুক ব্যক্তি আমার কন্যার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে।

হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেনঃ

«أَهْوَى مُوسِرٌ مِنْ عَقْلٍ وَدِينٍ؟»

“সে কি জ্ঞান-বুদ্ধিতে ও ধীনে সঠিক পথে আছে।”

লোকটি বললঃ হ্যাঁ!

তিনি বললেনঃ তবে তার সাথে তোমার কন্যার বিয়ে দিয়ে দাও।

পরামর্শ মূলতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী অনুযায়ী ছিল যাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

«إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

“যখন কোন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে যার ধীন ও চরিত্র তোমাদের সন্তোষজনক থাকে তবে তার প্রস্তাব গ্রহণ করে বিয়ে দিয়ে দাও। অযথা বিলম্ব সমাজে বিশৃঙ্খলা ও বিপদ ডেকে আনবে।”

উদারতায় জয়

মুসলিম বিন সাবিহ কুফী বলেন যে, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছিঃ মুগীরা বিন শোবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এবং অন্য এক আরবীয় যুবক একই সময়ে এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। মুগীরা বিন শোবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর অপেক্ষায় সেই যুবক বেশী আকর্ষণীয় ও সুন্দর ছিল। মেয়েটি উভয়ের প্রস্তাবের উত্তরে এই কথা বলে পাঠাল; আমি তোমাদের সাথে কথা না বলে ও না দেখে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জানাতে পারব না। যদি বাস্তবেই তোমরা আমার সাথে বিয়ের জন্য প্রস্তুত থাক তবে তোমরা উভয়ে অমুক সময়ে আমার কাছে আস যাতে আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

মেয়ের প্রস্তাব পৌঁছামাত্র উভয়েই তার কাছে হাজির হল। মেয়েটি তাদেরকে পর্দার আড়ালে বসাল, যেখানে থেকে তাদেরকে দেখা যাবে না; বরং তাদের কথা শোনা যাবে।

এদিকে মুগীরা বিন শোবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর দৃষ্টি যখন আরব যুবকের প্রতি পড়ল তখন তিনি যুবকের সৌন্দর্য, রূপ, পরিপূর্ণ যৌবন, মিষ্টি কথার অধিকারী দেখে নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করে আশা ছেড়ে দিলেন। কেননা তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, মেয়েটি এই যুবককেই পছন্দ করবে। মুগীরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসব কথা ভাবছিল।

হঠাৎ তিনি যুবককে জিজ্ঞেস করলেনঃ ভাই! তুমি সুন্দর ও রূপের অধিকারী এবং তোমাকে মিষ্টি কথা বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। তোমার কি এছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য আছে? সে বললঃ হ্যাঁ! এই সেই ।

মুগীরা বিন শোবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ আচ্ছা বলতো তোমার হিসাব কিতাব কেমন?

সে উত্তর দিলঃ আমার হিসাব কিতাবের ব্যাপার বলার অপেক্ষা রাখে না। এক পয়সাও এদিক সেদিক হয় না। কেননা আমি বিন্দু বিন্দু হিসাব করে চলি।

এরপর মুগীরা বিন শোবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজের ব্যাপারে বলতে আরম্ভ করলঃ কিন্তু আমার হিসাব তোমার থেকে ভিন্ন ধরণের । আমি হাজার হাজার অর্থের থলে ঘরের এক কোণায় রেখে দেই । আমার বাড়ীর সদস্যরা তা থেকে ব্যয় করে এবং আমি এ সম্পর্কে কিছু জানতেও চেষ্টা করি না যে, কত পরিমাণ খরচ হল আর কি পরিমাণ রয়ে গেল ।

আমি অর্থ শেষ হওয়ার বিষয়টি তখনই জানতে পারি যখন এর অধিক আবার প্রয়োজন পড়ে ।

তাদের উভয়ের কথোপকথন মেয়েটি খুব গুরুত্ব ও মনোযোগ দিয়ে শুনছিল । যখন মুগীরা বিন শোবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা শুনল তখন বললঃ আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি আমার বিয়ের বেশী উপযুক্ত এবং আমার কাছে বেশী প্রিয় যে হিসাবে আমাকে ফাসিয়ে আমার জবাবদিহি করবে না । আর এই যুবক আমার পছন্দ নয়, যে আমার পাই পাই হিসাব নিবে ।

এরপর সেই মেয়েটি মুগীরা বিন শোবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বিয়ে করে নিল ।

এক বীর শহীদের জননী

আবু কুদামা শাম দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সময়কালের বীর মুজাহিদ এবং মুসলিম সেনাপতি ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে অগণিত গুণে গুণান্বিত করেছিলেন। অন্তর তার জেহাদের জন্যে উদগ্রীব থাকত। অগণিত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং সকল যুদ্ধে গাজী হয়ে ফিরেছেন। একদিন মসজিদে নববীতে অবস্থান করছিলেন।

এক ব্যক্তি বললঃ আবু কাদামা! আপনি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় এসব যুদ্ধে এমনও কিছু ঘটনা আছে যা আপনাকে খুবই প্রভাবিত করেছে। আমাদের এমন ঘটনা শোনান যাতে আমাদের ঈমান সজীব হয়ে উঠে এবং জেহাদের আকাঙ্ক্ষাও আমাদের ভেতরে সৃষ্টি হয়।

আবু কুদামা বলতে লাগলেনঃ তাহলে শোন আমি তোমাদের এমন ঘটনা শোনাব যাতে আমি খুবই অবাক হয়েছি এবং প্রভাবিত হয়েছিঃ ক্রুসেড যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। যখনই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হত আমাদের যুবক ইসলামের গৌরব ফিরিয়ে আনতে মাথায় কাফন বেঁধে যুদ্ধের মাঠে নেমে পড়তো। আমরা জানতে পারলাম যে মুসলিম অধ্যুষিত সীমানায় শত্রুপক্ষ জমায়েত হচ্ছে। আমি সাথীদের নিয়ে রিককার^১ উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

রিককা শাম দেশের ফুরাত নদীর তীরে এক বড় শহর। আমি সেখান থেকে উট ক্রয় করলাম এবং তার উপর যুদ্ধাস্ত্র রাখলাম। সন্ধ্যায় মসজিদে গেলাম এবং লোকজনকে জেহাদের জন্যে উদ্বুদ্ধ করলাম। কতক যুবক আমাদের সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। সেনাবাহিনীর জন্যে লোকজন প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে বড় স্তূপ গড়ে তুলল। রাতে আমি একটি কামরা

১. রিককা শহর শামের ফুরাত নদীর বাহিরায়ে আসাদ থেকে ৬০ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত।

ভাড়া করে নিলাম। রাতের কিছু অংশ অতীত হলে কেউ দরজায় আওয়াজ করল। আমি আশ্চর্য হলাম যে এত রাত হয়ে গেল আমার সাথে কে সাক্ষাতের জন্য আসল?

আমি সেই শহরে অচেনা মানুষ। তবে এ কে হতে পারে? এই ভাবছিলাম ততক্ষণে দ্বিতীয়বার আওয়াজ আসল। যখন আমি দরজা খুললাম দেখতে পেলাম হিজাবে আবৃত লাজুক এক রমণী।

আমি বললামঃ আল্লাহর বান্দী! তুমি এখানে কি নিতে এসেছ?

বলতে লাগলঃ আপনি কি আবু কুদামা?

আমি বললামঃ হ্যাঁ! আমিই আবু কুদামা।

বলতে লাগলঃ আজ আপনিই মসজিদে মুজাহিদদের জন্যে আসবাবপত্র একত্রিত করেছেন?

আমি হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলাম। তখন সে এক ছোট পুটলি আমার কাছে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। আমি তার কান্নায় আশ্চর্য হলাম আমি বাতি জ্বালালাম এবং পুটলি খুললাম আর তাতে এক চিঠি ও চুলের শাকানো একটি রশি ছিল, আমি চিঠিটি পড়লাম। চিঠির বিষয়বস্তু এমন ছিলঃ

আবু কুদামা! আজ আপনি লোকজনকে জেহাদের আহ্বান করেছেন এবং তাতে অর্থ-সম্পদ দিয়ে অংশগ্রহণেরও আহ্বান জানিয়েছেন। আমি এক নারী, গৃহিণী আমি জেহাদে যেতে পারব না, আর না আমার কাছে অর্থ-সম্পদ আছে যে, মুজাহিদদের জন্য দিতে পারি। সুতরাং আমার কাছে যে নন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ বস্তু ছিল তা আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। এটা আমার ন দ্বারা তৈরী রশি। আপনি এই রশি দিয়ে ঘোড়াকে বাঁধবেন। হতে পারে ভু তাতেই আমার প্রতি খুশি হয়ে আমাকে ক্ষমা করে আমার জন্য জান্নাত বেন।

আবু কুদামা বলতে লাগলঃ আমি এই মহিলার প্রতি আশ্চর্য হলাম জেহাদের রাস্তায় তার অংশগ্রহণ। নিজের মাগফিরাতের ও জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা, সুবহানাল্লাহ! যাই হোক এই কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয় যে কোন মহিলা তার চুল কেটে এর রশি বানাবে; কিন্তু জেহাদের প্রতি তার ভালবাসা এবং জান্নাতের আশা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এমনটি করতে। আমি এই রশিটি আমার সাজ-সরঞ্জামের সাথে রেখে শুয়ে গেলাম।

পরদিন সকালে প্রোগ্রাম অনুযায়ী মুজাহিদদের কাফেলা সীমান্ত উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণের জন্য যাত্রা করল। যখন আমরা মুসলিম বিন আব্দুল মালিকের দূর্গের কাছে পৌঁছলাম তখন পেছন থেকে এক অশ্বারোহী খুব দ্রুত আমাদের দিকে আসতে দেখা গেল।

সে ডাকছিলঃ আবু কুদামা একটু থামুন! আমি সাথীদের বললামঃ তোমরা যাও! আমি এই ব্যক্তির কথা শুনে আসছি। আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। সে আমার কাছে এসে থামল। চেহারা চাদর দিয়ে আবৃত ছিল। এসেই বললঃ আল্লাহর মেহেরবানী যে আপনার সাথে আমার সাক্ষাত হয়ে গেল এবং আমি আমার মায়ের ওয়াদা পূর্ণ করতে পেরেছি।

আমি বললামঃ কি সেই ওয়াদা আর আমার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি? বলতে লাগলঃ আমি জেহাদে অংশগ্রহণের জন্যে এসেছি। দেবী হয়ে গেল। আমি বললামঃ তোমার চেহারা থেকে কাপড় সরানো। যদি তোমার বয়স জেহাদে অংশগ্রহণের উপযুক্ত তবে তুমি আমাদের সাথে যাবে, আর না হয় তোমাকে ফিরিয়ে দিব। সে যখন চেহারা থেকে কাপড় সরালো তখন আমি দেখতে পেলাম আমার সামনে ১৬/১৭ বছরের সুন্দর এক যুবক দাঁড়ানো। আমি তাকে বললামঃ তোমার পিতা কি জীবিত আছেন?

বললঃ না, তাকে খ্রিস্টান যোদ্ধারা শহীদ করে দিয়েছে। আমি আল্লাহর সেই শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছি।

আমি বললামঃ তোমার মাতা জীবিত আছেন?

বললঃ হ্যাঁ তিনি জীবিত আছেন।

আমি বললামঃ তবে তুমি তার সেবা-যত্ন কর এবং তার কাছেই ফিরে যাও। তার পায়ের নীচে জান্নাত। সে আমার কথায় খুব অবাক হল এবং বলতে লাগলঃ আপনি আমার জননীকে জানেন না?

বললামঃ না। বললঃ অল্প সময়ে ভুলে গেলেন। আমার মা সেই মহিলা আপনাকে রাতে চুলের রশির পুটলি দিয়ে দিয়েছে।

আমার রাতের কথা মনে পড়ল। আচ্ছা তবে সে তোমার মা ছিলেন? হ্যাঁ তিনিই আমার মাতা এবং তিনি আমাকে কাকেরদের সাথে জেহাদের জন্যে পাঠিয়েছেন এবং কসম দিয়েছেন যে আমি জেহাদে শরীক না হয়ে ফিরে না যেতে।

আবু কুদামা! যখন আমি এখানে আসছিলাম তখন আমার মাতা কিছু উপদেশ দিয়েছেন।

বলতে লাগলঃ হে আমার বৎস! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন। যখন তোমার কাকেরদের সাথে যুদ্ধ চলবে তুমি তখন সাহস হারাবে না। তুমি যেন পাহাড়ের মত অটল থাক। যুদ্ধে পলায়ন করবে না। যুদ্ধের সময় আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। নিজের প্রভুর কাছে রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করবে। জান্নাতে নিজের পিতার এবং মামার সঙ্গ প্রার্থনা করবে। আমার প্রিয় সন্তান! যদি তুমি শাহাদাত লাভ কর তবে প্রভুর কাছে আমার মাগফিরাতের সুপারিশ করবে।

এরপর আমার মা আমাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেনঃ হে আল্লাহ! সে আমার প্রিয় সন্তান। আমার কলিজার টুকরা। আমি একে তোমার জন্যে উৎসর্গ করছি। হে আল্লাহ! তাকে তার পিতা ও মামার সাথে স্থান দিও।

আবু কুদামা বললেনঃ আমি যুবকের কথা শুনে বড়ই অবাক হলাম। যুবকটি আবেগের সাথে বললঃ আবু কুদামা আপনাকে আল্লাহর কসম! আমাকে জেহাদে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমি প্রভুর জন্যে শাহাদাতবরণ করতে চাই। ইনশাআল্লাহ আমি শহীদ হব। আমি শহীদের

পুত্র, শহীদের ভাগ্নে। আমার বয়সের বিবেচনা করবেন না। আমি কোরআনের হাফেজ। ধনুকের ও তরবারীর যুদ্ধে আমি পারদর্শী। অশ্বারোহণ আমার খেলা। আমাকে আপনার সাথে নিয়ে চলুন।

সুতরাং আমার কাছে যুবককে সাথে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আবু কুদামা সামনে আরো বর্ণনা করেনঃ সফরকালে যুবক যা বলেছিল আমি তাকে তেমনই পেলাম। সে আমাদের মুজাহিদদের খেদমতে সবার আগে থাকত। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। আমরা সকলেই খুবই ক্লান্ত হয়ে গেলাম। আমরা এক স্থানে অবতরণ করলাম এবং খাবার রান্নার আয়োজন করতে লাগলাম।

সেই মুহূর্তে যুবকটি আমার কাছে আসল এবং আমাকে কসম দিয়ে বললঃ চাচাজান! আপনাকে আল্লাহর কসম! আমাকে মুজাহিদদের খাবার রান্নার সৌভাগ্য লাভ করার সুযোগ দিন। আমি তাদের সেবক আমি তাদের খাবার রান্না করব। আমি অস্বীকার করলাম; কিন্তু সে খুব জোর করছিল।

আমি তাকে বললামঃ ঠিক আছে তাঁবু থেকে একটু দূরে আগুন জ্বালাও সে তেমনটিই করল। অনেক সময় পার হল সে খাবার নিয়ে আসল না।

সাথীরা বললঃ আবু কুদামা! ছেলেটির খবর নিন অনেক সময় হয়ে গেল। আমি বললামঃ আমি এম্ফুণি তার কাছে যাচ্ছি এবং দেখছি খাবারের কত দেবী। যখন তার কাছে গেলাম তখন দেখতে পেলাম যে, চুলায় রান্না হচ্ছে এবং অল্প দূরে যুবকটি এক পাথরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে। তাকে দেখে আমার খুব দয়া হল। তাকে জাগানো ঠিক মনে করলাম না এবং নিজে খাবার রান্নায় ব্যস্ত হলাম। কখনো কখনো ছেলেটির চেহারার দিকে তাকাতাম। সারাটি দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে। হঠাৎ তার চেহারায় হাসি দেখতে পেলাম। আমি মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম। তার মুচকি হাসি বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং পরে জোরে হেসে তার চোখ খুলল। যখনই তার দৃষ্টি আমার প্রতি পড়ল সে লজ্জিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

সে বললঃ আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমি খাবারে দেৱী করে ফেলেছি। মূলতঃ ক্লান্তি আসাতে সম্ভবত আমি গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত ছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি স্নেহের দৃষ্টিতে দেখলাম এবং তাকে বললামঃ অসুবিধা নেই। তুমি আমার সন্তানের মত। এসো দু'জনে মিলে খাবার প্রস্তুত করি। সে বলল না, আমি আপনার খাদ্যে আমি সব করছি। এবার আমি তাকে কসম দিলাম যে, স্বপ্নের কথা এবং হাসার ঘটনা না বললে আমি তোমাকে কাজে হাত লাগাতে দিব না। বললঃ স্বপ্নের বিষয়টি প্রভু ও আমার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখুন।

আমি আবার তাকে কসম দিলাম যে, শুন তুমি কি দেখেছ। সে বলতে লাগলঃ চাচাজান আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি জান্নাতে আছি। কি অপরূপ তার সৌন্দর্য! আমি চলতে লাগলাম রাস্তায় আমি সুন্দর ভবন দেখতে পেলাম, সোনা-রূপা দিয়ে তৈরী এই মহল। তাতে অতি সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা বসা ছিল। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে আমার দিকে ইঙ্গিত করে বললঃ সে মরজিয়ার স্বামী। আমি জানতাম না মারজিয়া কে?

সুতরাং আমি তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তুমি কি মারজিয়া? বললঃ না, আমি তার সেবিকাদের একজন। তুমি যদি মারজিয়াকে দেখতে চাও তবে এই ভবনে প্রবেশ কর তবে তাকে পাবে। আমি সেই ভবনে প্রবেশ করলাম। মহলের কুঠুরী অকল্পনীয় সুন্দর ছিল। উপরে একটি সব থেকে বেশী সুন্দর রুম, সেখানে এক অত্যন্ত অপরূপ সুন্দরী বসা। আমি তার কাছে গেলে সে আমাকে বলতে লাগলঃ হে আল্লাহর ওলী এবং তার প্রেমিক! আমাকে আল্লাহ তোমার জন্যে এবং তোমাকে আমার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আমার সাথে তোমার সাক্ষাত অবশ্যই হবে; কিন্তু এই সাক্ষাতের আর অল্প সময় বাকী আছে। আমার সাথে তোমার সাক্ষাত আগামীকাল জোহরের পর হবে।

আমি তার কথা শুনলাম এবং আমার চেহারা মুচকি চলে আসল। এরপর আমি সাক্ষাতের আশায় জোরে হাসছিলাম। আবু কুদামা বলেন, আমি তাকে বললামঃ তুমি খুব ভাল স্বপ্ন দেখেছ।

আবু কুদামা আরো বর্ণনা করেনঃ আমরা রাতের খাবার খেলাম এবং পরদিনের সফরের প্রস্তুতির জন্য বিশ্রাম করতে তাঁবু স্থাপন করলাম। ফজর নামাযের পর আমরা সকলেই একত্রে মিলিত হলাম। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়লে আমরা শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হলাম। কাতারবন্দী করা হল। কমাণ্ডার নির্ধারিত করা হল। সূরা আনফালের আয়াত তেলাওয়াত করা হল এবং জেহাদের ফজীলত বর্ণনা করা হল। মুজাহিদদের মাঝে আবেগ সৃষ্টি হল। তারা শাহাদাতের জন্য অস্থির হয়ে গেল। সাথীরা প্রত্যেকে নিজের আত্মীয়ের কাছাকাছি অবস্থান নিল যাতে পরস্পর একজন আরেকজনকে সহায়তা করে; কিন্তু যুবকটির কোন আত্মীয় সেখানে ছিল না, যে তার ব্যাপারে ভাবত। আমি তাকে নিয়ে ভাবছিলাম যে, তাকে আমার সাথে রাখি।

হঠাৎ আমি তাকে দেখতে পাই সে একেবারে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। আমি কাতার অতিক্রম করে তার কাছে গেলাম এবং বললামঃ হে আমার প্রিয় বৎসঃ তুমি কি আগে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছো?

সে বললঃ না, এটি আমার প্রথম জেহাদ। আমি বললামঃ বৎস! যুদ্ধ কোন খেলা নয়। বড় বড় বীর পুরুষ টিকে থাকতে পারে না। তুমি বরং যুদ্ধের পেছনের অংশে চলে যাও। যদি আল্লাহ আমাদের বিজয়ী করেন তবে তুমিও তার অংশীদার হবে। আর যদি আল্লাহ না করেন এর বিপরীত হয় তবে কমপক্ষে তোমার প্রাণ রক্ষা পাবে।

সে আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললঃ চাচাজান! আপনি এমন কথা বলছেন। আমি বললামঃ হ্যাঁ আমি তাই বলছি।

সে বললঃ চাচাজান! আপনি কি চান যে আমি জাহান্নামী হয়ে যাই?

আমি বললামঃ আল্লাহর পানাহ (আউজুবিল্লাহ)। বৎস! আমি কি করে তা চাইব? জেহাদে তো আমরা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এসেছি। আমরা তো আল্লাহর কাছে জান্নাতের আশা করি। অতঃপর সে বলতে লাগলঃ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ
الْأَدْبَارَ ۝ وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤَمِّدِ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْ مُتَحَرِّزًا
إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمُ وِبَشَسِ
الْمَصِيرِ﴾

অর্থঃ “হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কাফেরদের সাথে পরস্পর সামনা সামনি হয়ে যাও তখন তোমরা পিঠ ফিরিয়ে পলায়ন করো না। আর যে ব্যক্তি তাদের সামনে সেই মুহূর্তে পিঠ ফিরাবে; কিন্তু হ্যাঁ যদি যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন হয় অথবা নিজের দলের কাছে আশ্রয়ের জন্য আসে তা ভিন্ন ব্যাপার এছাড়া যে এমনটি করবে সে আল্লাহর অভিশপ্ত হবে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম হবে। আর তা খুবই জঘন্য স্থান।” (সূরা আনফাল: ১৫-১৬)

আপনি কি চান যে, আমি যুদ্ধে পলায়নকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই?

আবু কুদামা বলেনঃ আমি তার চিন্তা-ভাবনার প্রতি অবাক হলাম। এই আয়াতের মর্মার্থ এবং জেহাদের প্রতি এত ভালবাসা। আমার চোখে অশ্রু চলে আসল। এরই মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। তরবারী চলতে লাগল। প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। মু’মিনদের আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করলেন এবং মুসলিম সৈন্যবাহিনী বিজয় লাভ করল। শত্রুপক্ষ পলায়ন করতে বাধ্য হল।

আল্লাহ তায়ালা খ্রিস্টান যোদ্ধাদের পরাস্ত করলেন। যখন যুদ্ধ প্রান্তর শূন্য হয়ে গেল তখন আমরা জোহরের নামায আদায় করলাম। এরপর প্রত্যেকেই তাদের আত্মীয় স্বজনের খোঁজে বের হল; কিন্তু সেই যুবক যার না কোন আত্মীয়স্বজন ছিল, আর না তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করার কেউ ছিল।

আমার অন্তরে তারই খেয়াল ছিল যে, সে কোথায় আছে। কোথাও আহত হয়ে পড়ে আছে নাতো? শহীদ হয়ে যায়নি তো? শত্রুরা তাকে বন্দী করে নিয়ে যায় নি তো? আমি তার খোঁজে ছিলাম।

হঠাৎ আওয়াজ শোনা গেলঃ লোকজন আপনারা আমার চাচা আবু কুদামাকে খুঁজে বের করুন। আমি আওয়াজ শুনে কাছে গেলাম। আমি যুবককে খুবই আহত অবস্থায় পেলাম। তার বুকের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আমার বৎস! আমার দিকে তাকাও। আমি তোমার চাচা আবু কুদামা, এই যে আমি। সে চোখ খুলে বললঃ আল্লাহ তোমার মেহেরবাণী। আবু কুদামা আমার কাছে এসে গেছেন। চাচা! আমার অসীয়াত শুনে নিন। আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম। তার সুন্দর চেহারা দেখলাম, আমার চোখে অশ্রু বইছে। আমি আমার পোশাক দিয়ে তার চেহারা পরিস্কার করলাম। তার মায়ের কথা মনে পড়ল। যখন তার সন্তানের কথা জানতে পারবে তখন তার কি অবস্থা হবে। গত বছর তার স্বামী শহীদ হয়েছেন। এরপর তার ভাই এখন তার সন্তান। আল্লাহ আকবার তার মনের কি অবস্থা হবে।

যুবক চোখ খুলে বললঃ আপনি আপনার চাদর দিয়ে আমার চেহারা পরিস্কার করবেন না বরং আমার চাদর দিয়ে রক্ত পরিস্কার করুন। চাচাজান! আমি আপনাকে আল্লাহর জন্যে বলছি যে, যখন আমি শহীদ হয়ে যাই আমাকে এই যুদ্ধের মাঠে দাফন করবেন। আর রিককায় আমার মায়ের কাছে অবশ্যই যাবেন। তাকে সুসংবাদ দিবেন যে, তার প্রভু তার উপহার কবুল করেছেন। তার সন্তান প্রভুর নিকট শহীদ হয়ে পৌঁছে গেছে। আমার মাকে বলবেন যে, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ আমি জান্নাতে আমার বাবা ও মামার সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে তার সালাম পেশ করব। চাচাজান আমার মা আমার শহীদ হওয়া বিশ্বাস করবেন না। তাই আমার রক্তাক্ত কাপড় আপনার সাথে নিয়ে যান এবং তা দেখাবেন এবং তাকে বলবেন যে, এখন তোমার সন্তানের সাথে সাক্ষাত জান্নাতে হবে ইনশাআল্লাহ।

চাচাজান! আমার বাড়ীতে নয় বছরের ছোট বোন আছে যে আমাকে খুব ভালবাসে। যখনই বাড়ী ফিরতাম আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত। আর যখন বাড়ী থেকে বের হতাম খুব মন খারাপ করত। গত বছর পিতার শাহাদাতের পর খুবই চিন্তিত এবং পেরেশান। যখন আমি জেহাদের জন্য

যাত্রা করছিলাম সে তা জানতে পেরে আমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাকে আসতে দিচ্ছিল না এবং বলছিল ভাইয়া! তাড়াতাড়ি চলে এসো দেৱী করবে না, আমি পাগল হয়ে যাব।

চাচাজান! আমার বোনকে সান্ত্বনা দিবেন। তার মাথায় হাত বুলিয়ে সাহস দিবেন। তার কণ্ঠ ক্ষীণ হতে যাচ্ছিল। সে কথা বলছিল, এরপর ঠোঁট ধীরে ধীরে কাঁপছিল। তার কথা ভাল বুঝে আসছিল না। মূলতঃ তার শেষ সময় ঘনি়ে আসছিল।

হঠাৎ সে উচ্চ কণ্ঠে বললঃ চাচাজান আল্লাহর কসম! আমার প্রভু সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। কা'বার রবের কসম! যে স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম তা সত্য ছিল। আল্লাহর কসম! এখন আমি মারজিয়াকে দেখছি তার সুগন্ধি আসছে। এরপর দেখতে দেখতে আমার হাতে সে প্রাণ হারায়।

আবু কুদামা বলতেছিলঃ আমি তার রক্তাক্ত পোশাক গাটি বানালাম। শহীদদের দাফন দিয়ে তার মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য রিককায় আসলাম। রিককায় না তো তার মায়ের ঠিকানা আমার কাছে ছিল আর না যুবকের নাম জিজ্ঞেস করতে পারলাম। আমি এ বিষয়ে ভাবছিলাম এমন সময় এক বাড়ীর সামনে এক বালিকাকে দেখতে পেলাম যে বিভিন্ন মুসাফিরদের জিজ্ঞেস করছিল যে, আপনি কোথা হতে আসছেন? যদি কেউ বলত জেহাদ থেকে তবে সে তার ভাই সম্পর্কে জানতে চাইত। বলত সব লোক আসছে সে কেন আসছে না?

কোথায় চলে গেল? লোকজন বলত আমরা জানি না, বলে চলে যেত। এরপর তার দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। জিজ্ঞেস করলঃ চাচা আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি বললাম জেহাদ থেকে।

সে বললঃ তবে তো আপনি আমার ভাইয়া সম্পর্কে অবশ্যই জানেন। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ তোমার মা কোথায়? বললঃ ঘরে। আমি বললাম যে, তাকে বাইরে আসতে বল। অল্প সময়ের মধ্যে তার মা চাদরে আবৃত

হয়ে বের হল। যখন সে আমার আওয়াজ শুনল, জিজ্ঞেস করলঃ আপনি কি আবু কুদামা?

আমি বললামঃ হ্যাঁ, আমি আবু কুদামা।

সে বলতে লাগলঃ তাহলে বলুন, আপনি কি আমার জন্যে কোন সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন নাকি দুঃসংবাদ?

আমি বললামঃ আম্মাজান! আপনার কাছে সুসংবাদের অর্থ কি?

বললঃ যদি আপনি আমাকে এই খবর দেন যে, ছেলে যুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হয়েছে তবে এটাই আমার জন্যে সুসংবাদ। আমি এক শহীদের মা হব। আর যদি আমাকে বলেন যে, আমার ছেলে গাজী হয়ে গণীমতের সম্পদ নিয়ে ফিরেছে তবে তা আমার জন্যে সুসংবাদ হবে না। এজন্যে যে তাতে আমার প্রভু আমার উপহারকে কবুল করেন নি।

আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বললামঃ আম্মাজান! আমি আপনার কাছে আপনার সন্তানের শাহাদাতের সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। সে বুকে আঘাত পেয়েছে। শত্রুর মোকাবেলায় না তো সে মুখ ফিরিয়েছে আর না পলায়ন করেছে।

মা বলতে লাগলঃ আবু কুদামা! আমি আপনার কথা পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনার কাছে এর কোন প্রমাণ আছে?

আমি সেই রক্তাক্ত কাপড় খুলে দেখালাম। এই দেখুন মা তার পোশাক। সে কি এটা পরে বাড়ী থেকে বের হয়নি? এই কাপড় দিয়ে আপনি তার মাথায় পাগড়ি বেঁধেছিলে। আমি কাঁদতে কাঁদতে তাকে কাপড় দেখাচ্ছিলাম। তার বোন নীরবে এই দৃশ্য দেখছিল। তার মা আল্লাহ্ আকবার বলল এবং তার নয়নে অশ্রু বইতে লাগল। তার বোন যখন তার ভাইয়ের শাহাদাতের বিষয় জানতে পারল। তখন সে এক চিৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার মা দৌড়ে ঘরের ভেতরে গেল এবং পানি পেয়ালা নিয়ে আসল। আমি বালিকার চেহারায় পানি ছিটাতে লাগলাম এবং

তার জ্ঞান ফিরানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। মা তার কন্যাকে হাতে উঠিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল। সে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি দরজার সামনে থেকে তার চিৎকারের আওয়াজ শুনছিলাম।

সে বলছিলঃ হে আমার প্রভু! হে আমার মালিক! হে আমার সৃষ্টিকর্তা! আমি আমার স্বামী, আমার ভাই, নিজের প্রিয় সন্তান তোমার জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি। তারা তোমার রাস্তায় শহীদ হয়ে গিয়েছে। হে আল্লাহ! তুমি মেহেরবানী করে আমার প্রতি খুশি থাক এবং আমাকেও তাদের সাথে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

আবু কুদামা বলতে লাগলঃ আমি অনেকবার দরজায় আওয়াজ করলাম যে, হয়ত সে দরজা খুলে দিবে, আর আমি তাকে আর্থিক সাহায্য করব। অথবা তার বিষয়ে লোকজনকে জানাব; কিন্তু না সে দরজা খুলল আর না তার আওয়াজ শুনা গেল। আল্লাহর কসম! আমি তার থেকে অধিক ইসলাম, জেহাদ এবং প্রভুর ভালোবাসার নারী আর কোথাও দেখিনি।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! এ এক মহিলা ছিল যে, নিজের প্রত্যেক প্রিয় বস্তু আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেছিল।

আমরা নিজেরা এ বিষয়ে কতটুকু দায়িত্ব পালন করছি। আমাদের কাছে কি এই প্রশ্নের কোন উত্তর আছে?¹

1. আল-মুশতাকূনা ইলাল জান্নাহ বই থেকে সংকলিত।

ক্ষমা করা হবে কিন্তু একটি শর্তে

প্রাচীনকালের একটি ঘটনা। এক ব্যক্তি কারো বাগানে প্রবেশ করল। সে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিল। ক্ষুধায় তার প্রাণ চলে যাওয়ার উপক্রম হল। সে ক্ষুধা মিটানোর জন্য গাছের দিকে তাকাল। বাগানে আপেলের গাছ দেখতে পেল।

সুতরাং সে হাত বাড়িয়ে একটি আপেল নিল এবং তার অর্ধেক খেয়ে নিল। এরপর বাগানের পার্শ্বেই এক নদী ছিল তা থেকে পানি পান করে তৃষ্ণা মিটাল; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সে সচেতন হল। কেননা প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় সে ফল আহারের আগে ভাবতে পারেনি। এখন যখন তার শরীরে শক্তি ফিরে পেল ভাবতে লাগল এবং নিজেকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলঃ তুমি নিপাত যাও! বিনা অনুমতিতে কারো গাছের ফল খাওয়া কি করে বৈধ হতে পারে?

অতঃপর সে শপথ করল যে, যতক্ষণ বাগানের মালিকের সাথে সাক্ষাত করে ক্ষমা না চাইবে সে আর বাড়ী ফিরে যাবে না। সুতরাং সে বাগানের মালিকের খোঁজে বের হয়ে তার বাড়ী পৌঁছল এবং দরজায় আওয়াজ করল। মালিক ঘর থেকে বের হলে সে তার আগমনের উদ্দেশ্য বিস্তারিত ব্যক্ত করলঃ মূলতঃ আমি খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম। এজন্য নদীর তীরে অবস্থিত আপনার বাগান থেকে একটি আপেলের অর্ধেক আপনার অনুমতি ছাড়া খেয়েছি। এরপর আমার মনে পড়ল যে, এই আপেল আমি অনুমতি ছাড়া খেয়েছি যা আমার জন্য বৈধ নয়।

এজন্যে আমি আপনার কাছে এসেছি যাতে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন অথবা এর প্রতিদান নিয়ে নিন। বাগানের মালিক তার কথায় বিশ্বাস করছিল না যে, দুনিয়াতে এমন পরহেযগার ব্যক্তিও আছে। এরপর হঠাৎ তার এক বিষয় খেয়াল হল এবং যুবককে বললঃ আমি তোমার ভুল ক্ষমা করতে পারি। আর ক্ষমা করার একটিই পন্থা আর তা হল তুমি আমার একটি শর্ত পূর্ণ করবে।

যুবক বললঃ কি সেই শর্ত বলুন?

বাগানের মালিক বললঃ আমার শর্ত হল যে, আমার কন্যাকে সাথে বিয়ে করতে হবে।

যুবক কিছুক্ষণ ভাবল এবং মাথা হেলিয়ে একমত প্রকাশ করল।

মালিক বললঃ এত খুশি হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার কন্যা অন্ধ, বোবা এবং কানে শুনে না। আমি অনেককাল থেকে তার জন্য পাত্র খুঁজছিলাম; কিন্তু কোন উপযুক্ত পাত্র পাচ্ছিলাম না। যুবক তা শুনে চিন্তিত হল যে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের কি পথ আছে এবং এ অবস্থায় আমি কি করতে পারি। এরপর সে ভাবল এমন মেয়ের সাথে বিয়ে করে পরীক্ষায় নিপতিত হওয়া অবৈধ পন্থায় ফল খেয়ে জাহান্নামী হওয়ার চেয়ে উত্তম। আর এই দুনিয়ার জীবনতো স্বল্পকালীন; কিন্তু আখেরাতের জীবন অনন্ত কাল। তাই কেন দুনিয়ার কষ্ট বেছে নিব না। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের জন্য এই প্রস্তাবে রাযী হয়ে গেল।

যখন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হল তখন বাসর রাতে তার চেহারায অমানিশার অন্ধকার ছেয়ে গেল। সে বার বার ভাবছিল যে, এক মেয়ে যে কথা বলতে পারে না, শুনতে পারে না, এমন বোবা-অন্ধের কাছে কি করে যাবে? এই পরিস্থিতিতে তাকদীরের উপর রাযী হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে বললঃ

«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

“বাসর রাতে যখন তার স্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য নববধুর কুঠুরীতে প্রবেশ করল তখন নববধু তার অভ্যর্থনার জন্যে দাঁড়িয়ে গেল এবং বললঃ আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।”

যখন যুবক দেখল যে, তার সামনে এক অতীব সুন্দরী তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঠিক আছে তখন যুবক কিছুক্ষণ থেমে বললঃ

আমাকেতো বলা হয়েছে যে, তোমার বধু অন্ধ, বোবা, কানে শুনে না।

মেয়েটি বললঃ আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আপনাকে যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য।

যুবক বললঃ আমাকে এ বিষয়ের মূল বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত কর যা তোমার পিতা আমাকে বলেছেন।

সে উত্তর দিলঃ

«أَبِي قَالَ عَنِّي : إِنِّي خَرَسَاءُ لِأَنِّي لَمْ أَتَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ حَرَامٍ،
وَلَا تَكَلَّمْتُ مَعَ رَجُلٍ لَا يَحِلُّ لِي»

আমার বাবা আমার ব্যাপারে বোবা বলেছেন এজন্য যে, আমি কখনো শরীয়ত বিরোধী কথা বলিনি আর না আমি কোন পরপুরুষের সাথে কথা বলেছি।

«وَأِنِّي صَمَّاءُ لِأَنِّي مَا جَلَسْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ غَيْبَةٌ وَنَمِيمَةٌ
وَلَعَوٌ»

আর আমার বাবা আমার ব্যাপারে বলেছেন যে আমি কানে শুনি না তা এজন্যে যে, আমি কখনো এমন বৈঠকে বসিনি যেখানে গীবত, চোগলখোরী এবং অর্থহীন কথা-বার্তায় মজলিশের আলোচনার বিষয় হয়।

«وَأِنِّي عَمِيَاءُ لِأَنِّي لَمْ أَنْظُرْ إِلَى رَجُلٍ لَمْ يَحِلَّ لِي»

আর আমি অন্ধ এর অর্থ হল যে, আমি এমন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দেইনি যে আমার জন্য বৈধ নয়।

পাঠকবৃন্দ! আপনারা কি জানেন এই যুবক কে ছিলেন? তিনি ছিলেন সাবেত বিন নোমান। আর এই পরহেযগার ব্যক্তিকে যে স্ত্রী মিলে ছিল তার বিষয়ে আপনারা জানতে পারলেন যে, সে কেমন পরহেযগার ও ধার্মিক নারী ছিলেন।

আর এই পবিত্র জোড়া থেকে সেই মহৎ ব্যক্তির জন্ম হয় যিনি দুনিয়ার আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র যাকে বিশ্ব মুসলিম ইমাম আবু হানীফা নোমান বিন সাবেত (রাহিমাহুল্লাহ) নামে জানে।

নিষ্পাপ শিশু

সে এক আরব দেশের অধিবাসী ছিল। উদ্দেশ্যহীন ছিল তার জীবন। আল্লাহ তায়ালার সাথে তেমন সম্পর্ক ছিল না। অনেককাল থেকে মসজিদে যাওয়া পছন্দ করত না। আর না সে আল্লাহর সামনে সেজদা করত।

সে খারাপ অসৎ সাথীদের নিয়ে সন্ধ্যা থেকে ফজর পর্যন্ত খেল-তামাশা, অনর্থক কাজে ব্যস্ত থাকত। আর তার স্ত্রীকে সে ঘরে একাকিত্বে ফেলে রাখত যার ফলে সে খুবই পেরেশানীতে থাকত। পরহেযগার স্ত্রী তাকে সঠিক পথে আনার জন্যে কোন চেষ্টার ক্রটি করেনি; কিন্তু তার চেষ্টার কোন ফল হল না।

একবার সে খেল-তামাশার কাজে রাত্রি জাগরণের পর প্রায় রাত তিনটায় বাড়ী ফিরল। এসে দেখল যে, তার স্ত্রী ও তার ছোট শিশু কন্যা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাদেরকে সে সেখানে রেখে দ্বিতীয় কুঠুরীতে রাতের বাকী অংশ কাটানোর জন্যে প্রবেশ করল এবং চরিত্রহীন ফিল্মের ভিডিও দেখতে লাগল। হঠাৎ দরজা খুলে তার পাঁচ বছরের শিশু কন্যা পিতার সামনে আসল। শিশুটি অত্যন্ত ঘৃণার সাথে তাকিয়ে বললঃ

«يَا أَبَا، عَيْبٌ عَلَيْكَ، اتَّقِ اللَّهَ»

বাবা! এটা খুবই আপত্তিকর বিষয়। আপনার আল্লাহকে ভয় করা উচিত। এই বাক্য শিশুটি তিনবার বলল এবং দরজা বন্ধ করে ফিরে গেল।

পিতার প্রতি তার শিশুর কথা আকাশে বিদ্যুতের গর্জনের মত হল। আর সে খুবই লজ্জিত হয়ে উঠল এবং ভিডিও বন্ধ করে নিজে অবুঝের মত বসে পড়ল। শিশুর কথা তার মাথায় আঘাত করছিল। এরপর সে ঘর থেকে বের হল। শিশুটি বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। তার বুঝে আসছিল না যে, এ সময়ে সে কি বিপদে পতিত হয়েছে। কয়েক মিনিট পর মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের আযান তার কানে আসল। সে দ্রুত অযু করে মসজিদে পৌঁছল। তার নামায পড়ার কোন ইচ্ছা ছিল না; বরং সে তার অস্থিরতা দূর

করার চেষ্টা করছিল। সেজদায় গিয়ে মাথা যমীনে রাখা মাত্রই তার চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে লাগল। গত দু'বছরে এই প্রথম প্রভুর জন্য মাথা নত হল। তার এই অনুশোচনা তাকে বুঝিয়ে দিল যে, তার ঈমানের সজীবতা ফিরে এসেছে। তার চোখের জলের সাথে সকল পাপাচর, অশ্লীলতাও অপরাধ সব ধুয়ে মুছে দিল। এবার তার জীবনের উদ্দেশ্য একেবারে পাণ্টে গিয়েছিল।

ফজরের নামায শেষ হল। সে কিছুক্ষণ মসজিদেই বসে রইল। এরপর বাড়ী ফিরে না গিয়ে প্রভাতেই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে নিজের ডিউটিতে চলে গেল। যখন অফিসে গেল তখন তার ম্যানেজার আশ্চর্য হল যে, ব্যাপার কি সারা রাত জেগে থাকার কারণে অফিসে শেষ সময়ে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তি আজ সকালেই ডিউটিতে চলে আসল!

ম্যানেজার এর কারণ জিজ্ঞেস করল উত্তরে সে গত রাতের ঘটনা সম্পর্কে জানাল।

ম্যানেজার বললেনঃ তুমি এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় কর তিনি তোমাকে মৃত্যুদূত (মালাকুল মাউত) আসার আগেই তোমার অচেতন ঘুম থেকে জাগ্রত করেছেন। ডিউটি শেষ হওয়ার পর সে বিশ্রামের জন্য বাড়ী ফিরল। এরই মধ্যে তার ছোট শিশুটিকে দেখার তার মধ্যে প্রচণ্ড আকাজক্ষা সৃষ্টি হল যে তাকে হেদায়েত ও আল্লাহর পথে ধাবিত করেছে।

সে ঘরে প্রবেশ করলে দেখতে পেল তার স্ত্রীর চোখে অনবরত অশ্রু বইছে। তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

সে জিজ্ঞেস করলঃ কেন কাঁদছ?

তার স্ত্রী চিৎকার করে উত্তর দিলঃ তোমার প্রিয় কন্যা মৃত্যুবরণ করেছে।

একথা শুনে সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। সুতরাং সেও তার স্ত্রীর সাথে একইভাবে কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ পর যখন স্বস্তি আসল তখন

সে বুঝতে পারল যে, এসব যা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক কঠিন পরীক্ষা। মূলতঃ আল্লাহ তায়ালা তাকে পরীক্ষা করতে চান।

সুতরাং তিনি আল্লাহ তায়ালায় প্রশংসা বর্ণনা করেন এবং নিজের বন্ধুকে টেলিফোন করে ডেকে আনল। বন্ধু আসল এবং সে শিশুকে গোসল দিয়ে কাফনের কাপড় পরাল। এরপর জানাযার নামায পড়ে তাকে কবরস্থানে দাফন করতে গেল।

বন্ধু বললঃ তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কবরে নামা ঠিক হবে না। সুতরাং বাবা শিশুকে উঠালেন এবং তাকে কবরে শায়িত করলেন। সে সময় তার চোখে অনবরত অশ্রু ঝরছিল এবং বলছিলঃ

আমি আমার কন্যাকে নয় বরং সে আলোর দিশারীকে দাফন করছি যে আমার জীবনের অন্ধকার রাত্রিকে উজ্জ্বল আলোতে পরিণত করেছে। আমি সে আলোকে দাফন করছি যার আলোতে আমার জীবনের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করে দিয়েছে এবং যে আমার পাপের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও আমলের দুনিয়াতে নিয়ে এসেছে।¹

1. আল-মুসলিমুন পত্রিকাঃ ৪২১।

অলৌকিক চিকিৎসা

“লায়লা হলু” মরক্কোর অধিবাসী ছিলেন। তিনি কিছুকাল আগেই খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেত্রী ছিলেন। সিনেমা জগতে তার নাম খ্যাতিপূর্ণ ছিল। তার এক ধ্বংসাত্মক রোগ দেখা দিল, যে রোগের চিকিৎসা এখন পর্যন্ত দুনিয়ায় অসম্ভব বলে সবাই জানে আর যাকে ক্যান্সার বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি বহু ডাক্তারের দুয়ারে দৌড়িয়েছেন; কিন্তু ডাক্তারদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। এখন মহিলার আর কোন উপায় থাকল না। হ্যাঁ একটি অবশ্যই অবশিষ্ট ছিল আর তা হল মহান প্রভুর দুয়ার।

লায়লা বলেনঃ আমি এক যুগ থেকে এক মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলাম যাকে বিশ্ব ক্যান্সার বলে জানে; বরং আমাদের দেশে এটাকে শয়তান রোগ (খবীস রোগ) বলে অবহিত করে। তখন আমার আল্লাহর প্রতি ঈমান দুর্বল ছিল। আমি তখন খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেত্রী আমি আমার সৌন্দর্যকে গর্ব করতাম; কিন্তু যখন আমি এই ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হলাম তখন আমার অস্তিত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। আমি একবার ভাবছিলাম কোথাও পালিয়ে যাই; কিন্তু পালিয়ে যাব কোথায়? যেখানেই যাব সেখানেতো আমার ব্যাধিও সাথে যাবে। এজন্যে ভাবলাম যে, আমি কেনইবা আত্মহত্যা করব না? কিন্তু আমার স্বামী ও আমার সন্তানদের প্রতি আমার অনেক ভালবাসা ছিল এজন্য আত্মহত্যাও করিনি।

পাঠকবৃন্দ! এটা বুঝবেন না যে, সে সময় আমার আত্মহত্যা না করার কারণ আল্লাহভীতি ছিল। এদিক আমি ভাবতামও না। মূলতঃ আমি আল্লাহ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও ইসলাম থেকে অনেক দূরে ছিলাম। আমি তাওবা এবং ইস্তেগফার থেকে অজ্ঞ ছিলাম। বস্তুতঃ আমার প্রভু আমার হেদায়েতের রাস্তা ভাগ্যে রেখেছেন যার জন্য এই ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়েছি।

হ্যাঁ অনেক সময় রোগও মানুষের জন্যে রহমতের কারণ হয়ে থাকে। হয়ত বা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা আমার প্রতি দয়া করে আমাকে সঠিক

পথের দিশা দেয়া নয়; বরং অনেক লোক আমার দ্বারা সঠিক রাস্তায় আনা। হ্যাঁ আমি সেই লায়লা না জানি কত মানুষকে পথ ভ্রষ্ট করেছি, শরীর প্রদর্শনী, নাচের মাধ্যমে ও সিনেমার পর্দার মাধ্যমে। আমি অসুস্থ হলাম; আমার জন্য ধন-দৌলত, খ্যাতি, বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পর্ক এবং একজনের অপেক্ষা অন্য বড় ডাক্তার সবই ছিল।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! আমি দেশের বাইরে বেলজিয়ামে গেলাম। অনেক ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করলাম সকলেই আমার স্বামীর কাছে বললঃ স্তন কেটে ফেলা জরুরী এবং এমন কেমিক্যাল ঔষধ ব্যবহার করতে হবে যার দ্বারা মাথার চুল পড়ে যাবে। চোখের পলকের চুল এবং ঙ্র পড়ে যাবে। চেহারা দাঁড়ি গজাবে। নখ এবং দাঁত পড়ে যাবে। আমি ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত শুনে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলাম চিকিৎসা করতে এবং বললামঃ আমি এমনটি না করে মৃত্যুকে প্রাধান্য দিব। সুতরাং আমি ডাক্তারদের কাছে আবদার করলাম যে, তারা যেন আমার জন্যে সহজ চিকিৎসার বিষয় ভাবে।

এরপর আমি মরক্কোতে ফিরে গেলাম এবং সাধারণ চিকিৎসা করতে লাগলাম; কিন্তু তাতে কোন প্রভাব পড়েনি। কেন জানি আমি ভাবলাম যে, ডাক্তাররা আমার সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারেনি। আমাকে শুধু শুধুই ক্যান্সারের রোগী সাব্যস্ত করেছে অথচ আমি একেবারে সুস্থ মানুষ।

কিন্তু প্রায় ছয় মাস পর আমার ওজন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। আমার শরীরের রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার ব্যথা বৃদ্ধি পেয়ে স্থায়ী হতে চলল। তখন আমি মরক্কোর এক ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করলাম আর তিনি আমাকে বেলজিয়াম যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। সুতরাং আমি দ্বিতীয়বার বেলজিয়াম সফরের প্রস্তুতি নিলাম।

বেলজিয়ামের ডাক্তাররা যখন আমাকে যাচাই করে পরীক্ষা করলেন তখন তারা আমার স্বামীকে দুঃখজনক সংবাদ দিলঃ ক্যান্সার সারা শরীরকে গ্রাস করে নিয়েছে এবং কলিজা এ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের কাছে এখন এমন অবস্থায় কোন চিকিৎসা অথবা ঔষধ নেই। এখন তোমার জন্য

একটি পথ আর তা হল তোমার স্ত্রীকে তোমার দেশে নিয়ে যাও যাতে সেখানে তার কবর নসীব হয়।

ডাক্তারদের এই দুঃসংবাদে আমার স্বামী দুঃখে-কষ্টে দিশেহারা হয়ে যায়। এরপর আমরা মরক্কো যাত্রা না করে ফ্রান্সের টিকেট নিয়ে নিলাম, হতে পারে সেখানে কোন সুচিকিৎসা পাওয়া যায় এবং সেখানে স্তন কেটে কেমিক্যাল ব্যবহার করে কোন ভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যায়।

হঠাৎ আমার স্বামীর মাথায় একটি বিষয় আসল যে, আমরা দুনিয়ার চিকিৎসাতো করেছি; কিন্তু এক মহান চিকিৎসক বাকী আছে। তার কাছে যাওয়া উচিত। সে যখন কথাটি বলল তখন আমার মনে হল যে, আমাকে যেন কোন ভুলে যাওয়া বিষয় মনে করিয়ে দিল। নিশ্চয় আমাদের পবিত্র মক্কা নগরীতে যেতে হবে আল্লাহর ঘরের যিয়ারত করতে হবে এবং সেখানে আল্লাহ সুবহানাহুর নিকটে তাওবা ও ইস্তেগফার করতে হবে এবং এই জীবননাশা রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে প্রার্থনা করতে হবে। কেননা আসমানের দরজা প্রত্যেক রোগীর জন্য সর্বদায় খোলা আছে।

অবশেষে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্যারিস থেকে কা'বার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। রাস্তায় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” আল্লাহ্ আকবার যিকিরে জিহ্বা সিক্ত ছিল। আমার আনন্দ লাগছিল। কেননা বায়তুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে এটা আমার প্রথম ভ্রমণ ছিল এবং প্রথমবার বায়তুল্লাহর দীদার লাভ হওয়ার আশা ছিল। আমি প্যারিসে একটি কোরআন কারীমের কপি নিয়ে নিয়েছিলাম। আর তা আমি প্রায় সময় তেলাওয়াত করতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত সেই পবিত্র সময় চলে আসল। যখন আমরা পবিত্র মক্কায় পৌঁছে কা'বার দরজার কাছে পৌঁছলাম। যখনই দৃষ্টি কা'বার প্রতি পড়ল আমার চোখে অশ্রু বইতে লাগল। আমার অতীত মনে পড়ল, প্রভুর নাফরমানী এবং পাপের জীবন মনে পড়ল। আমার অতীত অত্যন্ত ভুল ছিল। নামায-রোযা থেকে একেবারেই দূরে ছিলাম। ফরয বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না। এখন আমি নম্রতার সাথে বিশ্ব প্রতিপালকের

দরবারে উপস্থিত ছিলাম, যিনি তাওবা গ্রহণকারী, বান্দার প্রতি অতীব দয়ালু।

অতঃপর আমি কা'বায় তাওয়াফ করার সময় কেঁদে কেঁদে এই প্রার্থনা করলামঃ হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার জীবননাশা রোগের চিকিৎসা ডাক্তারদের দ্বারা সম্ভব নয়। তারা হাজারো চেষ্টা করার পর অক্ষম হয়েছে। আমার প্রিয় প্রভু! রোগ তোমার পক্ষ থেকেই হয় আর এর চিকিৎসাও তুমিই করে থাক। আমার চিকিৎসার ব্যাপারে ডাক্তাররা তাদের হাসপাতালের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি আমার রোগমুক্তির জন্য তোমার হাসপাতালে উপস্থিত হয়েছি। হে আমার প্রভু! তোমার দরজা আমার জন্য বন্ধ করে দিও না। এরপর আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলাম এবং এ সময় আমি আল্লাহর কাছে অধিক মাত্রায় এই প্রার্থনা করতে থাকি যে, হে আল্লাহ! আমার প্রার্থনা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিও না এবং আমাকে নিরাশ করো না, আর আমার রোগ মুক্ত করে ডাক্তারদের অবাক করে দিও।

যেমন আমি আগে বর্ণনা করেছি যে, আমি আগে আল্লাহ তায়ালা থেকে গাফেল ছিলাম এবং তার নির্দেশের উপর কখনো আমল করিনি; কিন্তু এখন আমার সে অবস্থা ছিল না যা আগে ছিল; বরং দীনকে এখন আমি নিজের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিয়েছি। সুতরাং মক্কা মোকাররমায় উপস্থিত উলামাদের কাছে আমি এমন গ্রন্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম যা দোয়া সম্পর্কে যা থেকে আমি সহজে দোয়া করতে পারব। তারা আমাকে উপদেশ দিলেন বেশী করে কোরআন তেলাওয়াত করতে এবং বেশী বেশী জমজমের পানি পান করতে। তারা আমাকে আরো বললেন যে, আমি যেন বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করি এবং রাসূল আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরুদ পড়ি।

মসজিদে হারামে আমি যথেষ্ট প্রশান্তি লাভ করলাম। আমি আমার স্বামীকে বললাম যে, আপনি আমাকে মসজিদে হারামে সময় কাটানোর অনুমতি দিন। আমি এখন হোটেলে কমই যাব। বেশী সময় আল্লাহর ঘরে থাকব। আমার স্বামী আমার আবদার গ্রহণ করলেন এবং আমি আমার সময়

মসজিদের হারামে মহান আল্লাহর নিকট দোয়া-মোনাজাতের মাধ্যমে কাটাতে লাগলাম।

মসজিদে হারামের ভেতরে আমার প্রতিবেশী মিশর ও তুরস্কের মহিলারা ছিলেন। আমার অধিক প্রার্থনা ও কান্নাকাটির ব্যাপারে তারা জিজ্ঞেস করলেন। আমি তাদের উত্তরে বললামঃ প্রথমতঃ কথা হল যে, আমি প্রথমবার আল্লাহর ঘরে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছি যার বিষয়ে আমি ভাবতেও পারিনি যে, তার সাথে আমার এত ভালবাসা হবে যেমন এখন আমার অন্তরে আছে।

আর দ্বিতীয়তঃ আমি ক্যান্সারের মত দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত এজন্যে আমি আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করছি।

সেই মহিলাদের নিয়ম ছিল যে, তারা নামাযের পর আমার চতুষ্পার্শ্বে বসে যেত এবং অনেক সময় পরে তারা পৃথক হত। এভাবে আমাদের মধ্যে আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হল। এরপর আমি তাকে বললামঃ আমি সম্ভবত এ'তেকাফের নিয়ত করে নিব। মহিলারা আমার কথাকে পছন্দ করল এবং বলল যে, আমরা আপনার সাথে শরীক হব। সে সময় রমযান মাস না থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের স্বামীরা তাদের অনুমতি দিয়ে দিল। এখন আমরা আল্লাহর ঘরে এ'তেকাফ অবস্থায় ছিলাম। এখন আমাদের সময় ইবাদতে কেটে যেত। ঘুম কম হত। ক্ষুধাতো লাগতই না বলতে গেলে। কয়েক লোকমা খাবারই যথেষ্ট ছিল। তবে যমযমের পানি খুব বেশী পান করতাম, কেননা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণী মনে ছিলঃ

«مَاءٌ زَمْزَمَ لِمَا شَرِبَ لَهُ»

অর্থঃ “যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে সেই নিয়তই পূর্ণ হবে।” (সহীহ ইবনে মাজাহঃ ৩০৬২)

অর্থাৎ যদি রোগ মুক্তির জন্যে পান করা হয় তবে আল্লাহ তায়ালা রোগ থেকে মুক্তি দিবেন। যদি তৃষ্ণা মিটানোর জন্যে পান করা হয় তবে তৃষ্ণা

মিটে যাবে। আর যদি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে পান করা হয় তবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় লাভ করা যায়। সুতরাং আমাদের ক্ষুধা দূর হয়ে যেত যমযমের পানি দ্বারা।

আমরা রমণীগণ অনবরত কা'বা শরীফের তাওয়াফ করতাম এবং তাওয়াফ সমাপ্ত হলে দু'রাকাত নামায মাকামে ইবরাহীমের পেছনে (আর যদি মাকামে ইবরাহীমের পেছনে স্থান না হত তবে মসজিদের যে কোন স্থানে) পড়তাম। এরপর আবার তাওয়াফ করতে থাকতাম। যদি ক্লান্ত বা ক্ষুধার অনুভূতি হত তবে যমযম সর্বদা প্রস্তুত আছে।

আমি যখন বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছে ছিলাম হালকা-পাতলা ও দুর্বল ছিলাম। আমার শরীরের উপরাংশে ফুলা ছিল যা প্রমাণ করত যে, আমার শরীরের উপরাংশেও ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার সাথের মহিলারা আমাকে উপদেশ দিত যে, আমি যেন যমযমের পানি দ্বারা আমার শরীরের উপরাংশ ধুতে থাকি; কিন্তু আমার শরীরের এমন অবস্থা যে, পানি দিয়ে ধোয়ার কথা শুনলেই কেঁপে উঠতাম।

যখন এই ধ্বংসাত্মক রোগের কথা মনে পড়ত আমি আল্লাহর যিকির ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতাম। এরপর আমি শরীরে হাত না লাগিয়ে যমযমের পানি শরীরে ঢালতে লাগলাম। কিছুদিন এভাবে চলে গেল। আমার সাথীরা আমাকে বাধ্য করল যে, আমি যেন আমার শরীর যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলি। আমি প্রথমে অস্বীকার করলাম; কিন্তু আমি অনুভব করলাম যে, কোন ভেতরের শক্তি আমাকে যমযমের পানি দিয়ে শরীর ধুতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি ভয়ে তা করিনি। দ্বিতীয়বারও এমন হল; কিন্তু এবারও আমি তা করিনি। কেননা আমি ভয় করছিলাম। এরপরও তৃতীয় বার আমার হৃদয় নির্দেশ দিল এবং বাধ্য করল যে, আমার শরীর অবশ্যই যেন ধুয়ে নিই। আমি যমযমের পানি দ্বারা আমার শরীর ও স্তন মলতে লাগলাম যা পঁচা রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি দ্বারা ভরপুর ছিল; কিন্তু দেখতে দেখতে সবকিছু থেকে আমার শরীর পবিত্র হতে লাগল। অবশেষে সব দূর হল আমি আমার

শরীরে জামার নিচ দিয়ে হাত দিয়ে দেখি যে শরীরে কোন কিছুই আর নেই অথচ ছোট ছোট দানা ভর্তি ছিল। আমি অবাক হলাম; কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হল যে, এটা এত আশ্চর্যের কি বিষয়? আল্লাহ তায়ালা কি এর উপর কুদরত রাখেন না? আমি আমার এক সাথীকে বললাম, একটু আমার শরীরটা স্পর্শ করুন ও ছোট দানাগুলি দেখুন তো; আমার সাথীরা যখন দেখল যে আমার শরীর হতে সব দানা গায়েব হয়ে গেছে আর শরীর একেবারে অক্ষত তখন সবাই বলে উঠে আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার ।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমার স্বামীকে সুসংবাদ দেয়ার জন্যে যখন হোটেলে গেলাম, কামরায় প্রবেশ করে যখন স্বামীর সামনে দাঁড়লাম তখন তাকে বলতে লাগলামঃ এই দেখ আল্লাহর রহমত! কোথায় আমার শরীরের ফোঁড়া ইত্যাদি, কোথায় আছে? শেষ হয়ে গেল না! এরপর আমি আনন্দের সাথে আমার অবস্থা সম্পর্কে জানালাম; কিন্তু আমার স্বামীর কাছে সব কাল্পনিক মনে হচ্ছিল। সে কথাকে উপহাস মনে করছিল।

তৎক্ষণাৎ তার চোখ দিয়ে অশ্রু বইতে লাগল এবং সে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলঃ তুমি কি জান না, তুমি কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছ যে, কেবলমাত্র তিন সপ্তাহ আগে ডাক্তাররা কসম করে বলছিল যে, তুমি কয়েক দিনের অতিথি?

আমি আমার স্বামীকে বললামঃ

«إِنَّ الْآجَالَ بِيَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ»

“জীবন ও মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আল্লাহ তায়ালার হাতে। অদৃশ্যের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত কেউ অবগত নয়।”

অতঃপর আমরা স্বামী-স্ত্রী বায়তুল্লাহ শরীফে এক সপ্তাহ অবস্থান করলাম। আমি আল্লাহ তায়ালার সীমাহীন নেয়ামতের প্রতি শুকরিয়া আদায় করতে থাকলাম। এরপর আমরা মসজিদে নববীর যিয়ারত করলাম। এরপর

ফ্রান্স ফিরে গেলাম। যখন সেখানের ডাক্তাররা আমাকে পরিপূর্ণ সুস্থ দেখতে পেল এবং জানতে পারল যে, এই দূরারোগ্য ব্যাধি আমার থেকে বিদায় নিয়েছে তখন তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। তারা অবাক হয়ে বলতে লাগল: শ্রদ্ধেয়া! আপনি কি সেই মহিলা যে?

আমি গর্বের সাথে উত্তর দিলামঃ হ্যাঁ। আমিই সেই মহিলা যার মৃত্যুর ঘোষণা আপনারা দিয়েছিলেন। আর এই আমার স্বামী যে আমার চিকিৎসার জন্য সকল মাধ্যম অবলম্বন করেছিল। আমি আপনাদের চিকিৎসা থেকে পলায়ন করে আমার প্রভুর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি এবং এখন তার চিকিৎসায় রোগমুক্তির পর ফিরে এসেছি। এখন আর আমার তাকে ব্যতীত কারো ভয় নেই। কেননা ফায়সালা ও ভাগ্য আল্লাহর হাতে। তিনি জীবন মৃত্যুর মালিক এবং সবকিছুই তার পর্যবেক্ষণে হয়ে থাকে। একটি পাতাও তার অজান্তে পতিত হয় না।

ডাক্তাররা আমাকে বললঃ শ্রদ্ধেয়া! মুহতারামা! আপনার বিষয় খুবই আশ্চর্যজনক। আপনার শরীরের ফোলা ভাল হয়ে গেছে; কিন্তু জরুরী হল যে, আপনার চেকআপ দ্বিতীয়বার করা হোক।

সুতরাং ডাক্তাররা দ্বিতীয়বার আমার পরীক্ষা করল এবং আমার সমস্ত শরীর টেস্ট নিল; কিন্তু সবকিছুই সঠিক ছিল। আমার আর কোন রোগ ছিল না। তারা এজন্যই বেশী আশ্চর্যবোধ করছিল যে সম্ভবত আমার চিকিৎসায় মেডিকেল সায়েন্স অক্ষম ছিল। আমি এমন সুস্থ হয়ে গেলাম যেমন আমার কোন রোগই হয় নি।

অতঃপর আমার নিয়ম হয়ে গেল যে, আমি সীরাতে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মোবারক জীবনের অধ্যয়ন করতে লাগলাম এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে আমি কাঁদতাম। অতীতের পাপের জীবন সম্পর্কে মনে করে কাঁদতাম।

আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি যে, হে বিশ্ব প্রতিপালক!
আমার এবং আমার স্বামীর তাওবা কবুল করে নাও এবং সমস্ত
মুসলমানকেও ক্ষমা কর ।¹ আমীন !

1. এ ঘটনা তিনি সরাসরি লাইলার কণ্ঠে ক্যাসেটে শুনে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেন।
(সূত্র আব্দুল আযীয আল-মুসনাদের আল-আয়েদূনা ইলাল্লাহঃ ২য় খণ্ড তিনি বর্ণনা করেন।)

প্রতারণার কুফল

বিচারক ইবনে আবু লায়লা আদালতে বিচারকের আসনে আসীন ছিলেন। এমন সময় দুই মহিলা একজন যুবতী ও একজন বৃদ্ধ আদালতে প্রবেশ করল।

যুবতী মহিলা বলতে লাগলঃ আল্লাহ বিচারককে সুস্থ রাখুন। আমি এক বিবাহিত নারী। যদি বিচারক অনুমতি দেন তবে আমি আমার নিকাব উঠিয়ে (চেহারা খুলে) আমার অভিযোগ পেশ করব।

বৃদ্ধ মহিলা তৎক্ষণাৎ বললঃ বিচারকের মঙ্গল কামনা করি এই মহিলা অতি সুন্দরী ও রূপসী। এ নিজের রূপ দেখিয়ে আপনাকে ধোকা দিতে চায়। সুতরাং তার অভিযোগ নিকাব অবস্থায় শুনবেন। আল্লাহ এর সৌন্দর্যের ধোকা থেকে আপনাকে হেফাযত করুন। আমি আশঙ্কা করছি যে, আপনি এর চেহারা দেখে প্রেমে পড়ে না যান এবং সঠিক ফয়সালা দিতে না পারেন।

ইবনে আবু লায়লা যুবতী মহিলাকে বললেনঃ পর্দা অবস্থায় কথা বল। যুবতী মহিলা তার দুঃখ মনের ভেতরেই রাখল এরপর বলতে লাগলঃ আল্লাহ বিচারকের সম্মান বৃদ্ধি করুন। এই মহিলা যে, আমার সাথে আছে সে আমার ফুফু। আমি তাকে তার অধিক বয়স এবং এই আত্মীয়তার কারণে মায়ের মর্যাদা দিয়ে থাকি এবং তাকে মা বলে ডাকি। যখন আমার পিতার মৃত্যু হল তখন আমিই একমাত্র তার সত্ত্বাধিকারী ছিলাম। আমার ফুফু চেষ্টা করল যে, আমার ধন-সম্পদ কিভাবে আত্মসাত করা যায়। এরপরও আমি তার সম্মান ও সেবা করতে থাকি। সম্পদ আমার ছিল এবং তা থেকেই খরচ করা হত; কিন্তু আমি শান্তিতে ছিলাম যে, আমি আমার ফুফুর ঘরে আছি।

যখন আমি যুবতী হলাম, তখন আমার চাচাত ভাই আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। এরপর তার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল এবং আমি তার বাড়ী চলে গেলাম। আমরা উভয়েই সুখে-শান্তিতে ছিলাম। পরস্পরের মধ্যে খুব

ভালোবাসা ছিল। সময় পার হতে লাগল। এরই মধ্যে এই ফুফুর মেয়ে যুবতী হয়ে গেল।

কি জানি আমার ফুফুর কি হল যে, সে আমার স্বামীকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগল এবং তাকে আগ্রহ দিল যে সে যেন তার কন্যাকে বিয়ে করে। তাকে বার বার আগ্রহ দেখাতে থাকে। অতঃপর সে আমার ফুফুর কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দিল।

জানি না আমার এই ফুফু কবে থেকে আমার সাথে হিংসা-বিদ্বেষ রাখছিল যার ফলে সে আমার জন্য সতীন চাপিয়ে আমার সংসারে অশান্তির বীজ বপন করতে চাইল। যখন আমার স্বামী প্রস্তাব দিল তখন ফুফু তার উপর শর্তারোপ করল, যা খুবই অযৌক্তিক ও আশ্চর্যজনক তা হল এই যে, আমার এই ভাতিজীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ফয়সালা আমার এখতিয়ারে দিতে হবে। উদ্দেশ্য হল যে, তুমি আমাকে সম্পূর্ণ এই এখতিয়ার দাও যে, তালাক ইত্যাদির বিষয় আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে।

আমার স্বামী তার কন্যার উপর আসক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই সে হ্যাঁ বলে দিল। এখন আমার বৈবাহিক জীবনের ফয়সালা আমার ফুফুর হাতে এসে গেল। আমি আমার ঘরে নীরবে শান্তিতে বসাছিলাম। এমন সময় আমার ফুফু এক ব্যক্তির মাধ্যমে সংবাদ পাঠাল যে, তোমার স্বামী আমার কন্যাকে বিয়ে করতে চায়। আমি তার উপর শর্ত আরোপ করেছিলাম যে, যতক্ষণ তোমার ব্যাপারে ফয়সালা করার অধিকার আমার হাতে না দেয় আমি আমার কন্যার বিয়ে দিব না। সে এই শর্ত মঞ্জুর করেছে। এখন তুমি তালাকপ্রাপ্ত।

আমি সংকটাপন্ন অবস্থায় বাড়িতে বসে আছি। এরপরও আমি ধৈর্যের বাঁধন ধরে রেখেছি। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছি। এর মধ্যে আমার ফুফুর স্বামী সফর থেকে ফিরে আসলেন। তিনি এসব পরিস্থিতি জেনে খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, তুমি আমার সাথে বিয়ে করে নাও। আমি বললাম যে, আমার কোন আপত্তি নেই তবে শর্ত হল যে, আমার ফুফুর বিষয় আমার হাতে দিয়ে দিন।

তিনি বললেনঃ তুমি কি করবে?

আমি বললামঃ আমার ইচ্ছা হতে পারে আমি ক্ষমা করে দিব অথবা প্রতিশোধ নিব।

তিনি বললেনঃ ঠিক আছে তোমার ফুফুর ব্যাপারে তোমার ইচ্ছাধীন। এখন আমি এক ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের এই ফুফুকে সংবাদ দিলাম যে, তোমার স্বামী আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন আর আমি তাতে শর্তারোপ করলাম যে, তোমার ব্যাপার আমার এখতিয়ারে দিতে। তিনি আমার শর্ত মঞ্জুর করেছেন। এখন তুমি তালাকপ্রাপ্ত।

বিচারক ইবনে আবু লায়লা অনিচ্ছায় হেসে পড়েন।

বৃদ্ধা মহিলা বলতে লাগলঃ বিচারক! এখুনি হাসবেন না। মূল বিষয়তো এখন শুরু হবে।

এবার যুবতী মহিলা বলতে লাগল যে, এই মহিলার আগের স্বামী যে এখন আমার স্বামী ছিল মৃত্যুবরণ করেছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ সম্পত্তি রেখে গেছেন। এখন এই মহিলা আমার উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত এবং আদালতে মামলা দায়ের করেছে।

অন্যদিকে আমি আমার চাচাত ভাইকে মামলার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলাম। সে আমার কথা মান্য করে নিজের শাশুড়ীর বিপক্ষে আমার সহায়তা করতে লাগল।

কয়েক মাস অতিবাহিত হল। একদিন আমি তাকে বললাম আমার চাচাত ভাই! সত্য কথা বলতে বাধা নেই। আমি তোমাকে নিয়ে শান্তিতে ছিলাম; কিন্তু তুমি অযথাই আমাকে তালাক দিয়েছ। এখন যখন আমার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে আমি তোমার জন্য হালাল। তুমি আমাকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পার। তাকে আগের ভালোবাসা সারা দিল। বলতে লাগল যে, আমি তোমাকে খুবই ভালবাসতাম; কিন্তু তোমার এই ফুফুই ছিল যে, আমাকে ভুল পথে চালিত করেছে এবং নিজ কন্যার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে

দিয়েছে। তবে আমি আবার তোমাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। আমি তাকে বললাম যে, এক শর্তের উপর আমি বিয়ে করতে পারি।

সে বললঃ কি সেই শর্ত? আমি বললাম আমার ফুফাতো বোনের বিষয় আমার ইচ্ছাধীন ছেড়ে দিতে হবে। সে বলল যে, আমি তা মঞ্জুর করলাম। এবার আমি ফুফাত বোনকে জানলাম যে, তোমার স্বামী আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। আমি তাতে শর্তারোপ করেছি তাই সে তোমার ব্যাপার আমার ইচ্ছাধীন করে দিয়েছে। আর আমি তালাক দিচ্ছি। তুমি এখন তালাকপ্রাপ্ত।

তখন বৃদ্ধ মহিলা বলতে লাগল যে, বিচারকের সম্মান ও মঙ্গল বৃদ্ধি হোক। এমনও কি সম্ভব বা এটা কি বৈধ, সে আমাকে ও আমার কন্যা উভয়কে তালাক দিয়ে দিবে।

বিচারক ইবনে আবু লায়লা শির উত্তোলন করে বলতে লাগলঃ

«نَعَمْ التَّعْسُ وَالنَّكَسُ لَكَ»

“কি উত্তম পরিণাম ও দুর্ভাগ্য তোমার এবং পরাজয় ও বঞ্চিত অপদস্থের শাস্তির যোগ্য তুমিই।”

এরপর খলীফা মানসুরের কাছে বৃদ্ধা বিচারের জন্যে গেল। তিনিও অনিচ্ছায় হাসতে লাগলেন এবং বললেনঃ

«أَبْعَدَ اللَّهُ الْعَجُوزَ وَلَا فَرْجَ عَنْهَا»

“আল্লাহ তায়ালা এই বৃদ্ধাকে (নিজের রহমত থেকে) দূরে রাখুন এবং তার সমস্যা ও পেরেশানী থেকে মুক্ত না করুন।”

এক মহিয়সী রমণীর আদর্শ জীবন

মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) নিয়ে বসেছিলেন। সে মুহূর্তে আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রবেশ করলেন।

বলতে লাগলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গ, আমি মহিলাদের পক্ষ থেকে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। তাদের সকলের অনুভূতির একটি কথা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। একথা বলে তিনি নিজের কথা শুরু করলেনঃ

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَكَ إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَافَّةً فَأَمَّا بِكَ وَاتَّبَعْنَاكَ»

“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সকল মানবজাতির নর-নারীর জন্য প্রেরণ করেছেন। আর আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনার অনুগত হয়েছি।”

«نَحْنُ مَعَشَرَ النِّسَاءِ مَقْصُورَاتٌ مُخَدَّرَاتٌ فَوَاعِدُ بَيُوتٍ وَمَوَاضِعُ شَهَوَاتِ الرِّجَالِ وَحَامِلَاتُ أَوْلَادِهِمْ، وَإِنَّ الرِّجَالَ فَضَّلُوا بِالْجُمُعَاتِ وَشُهُودِ الْجَنَائِزِ وَالْجِهَادِ، وَإِذَا خَرَجُوا لِلْجِهَادِ حَفِظْنَا لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَرَبَّيْنَا أَوْلَادَهُمْ أَفَنُشَارِكُهُمْ فِي الْأَجْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟»

“আর আমরা নারীরা বাড়িতে পর্দানশীন অবস্থায় সংসারের সব দায়িত্ব পালন করে থাকি। নিজেদের স্বামীদেরকে আরাম ও শান্তিতে রাখি। আর তাদের সন্তান ধারণ করি। পুরুষদের আমাদের উপর বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যেন তারা মসজিদে জুমার নামায আদায় করে। কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হয় এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়। যখন আমাদের স্বামী জিহাদে যায় তখন আমরা তাদের ধন-সম্পদ হেফাযত

করি এবং তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করি। হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষদের নেক কাজের সওয়াবে কি আমাদের কিছু অংশ নেই?”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) দিকে দৃষ্টি দিয়ে এরশাদ করলেনঃ

«هَلْ سَمِعْتُمْ مَقَالَ امْرَأَةٍ أَحْسَنَ سُؤَالًا عَنْ دِينِهَا مِنْ هَذِهِ؟»

“তোমরা কি দ্বীনের বিষয়ে এই মহিলার থেকে উত্তম প্রশ্ন কাউকে করতে শুনেছ?”

তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! বাস্তবেই আমরা এর থেকে উত্তম কথা কোন মহিলার নিকট শুনিনি। এখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসমা বিনতে ইয়াযীদে (রাযিয়াল্লাহু আনহা) দিকে তাকিয়ে বললেনঃ

«انْصِرْفِي يَا أَسْمَاءُ وَأَعْلِمِي مَنْ وَرَاءَكَ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ حُسْنَ تَبَعْلٍ إِحْدَاكُنَّ لِرَوْجِهَا وَطَلَبِهَا لِمَرْضَاتِهِ وَاتِّبَاعِهَا لِمُؤَافَقَتِهِ يَعْدِلُ كُلَّ مَا ذَكَرْتَ لِلرِّجَالِ»

“হে আসমা (সম্ভ্রষ্ট চিত্তে) ফিরে যাও এবং অনুপস্থিত নারীদের বলে দাও, যে মহিলা তার স্বামীর আনুগত্য করে, তার সম্ভ্রষ্টি অর্জনে স্বচেষ্টা এবং তার মতের অনুকূল হবে, তার সেই সাওয়াব হবে যা তুমি পুরুষদের জন্য উল্লেখ করেছো।”

তখন আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মুখে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু” এবং “আল্লাহু আকবার” বলতে বলতে ফিরে গেলেন। কেননা তার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম রমণীদের জন্য দরবারে রিসালাত থেকে এক মহৎ সুসংবাদ পাওয়া গেছে।¹

1. আল-ইস্তিয়াবঃ ৩২৬৭, আদদুররুল মানসুর লিস্ সূয়ুতিঃ ২/১৫৩।

এই মহান সাহাবীয়াকে পরবর্তীতে “خطيبة النساء” নারীদের মুখপাত্র উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তার বিষয়ে আমরা আরো অধিক জেনে নিই।

এই আনসারী সাহাবীয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইসলামের প্রাথমিককালে ইসলাম গ্রহণ করেন; বরং তিনি যে মহিলারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সর্বপ্রথম বাইআত করেন তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি খুব গর্বের সাথে বলতেনঃ আমি প্রথম মহিলা যে নিজের বোন হাওয়ার সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে বায়আত গ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের বায়আত মুখে মুখে হত, হাতে হাতে মিলিয়ে নয়।

তার পরিবারের সকলেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভালোবাসায় প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধে মক্কার মুশরিকরা পূর্ণ চেষ্টা এবং আশা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে কিভাবে হত্যা করা যায়। যখন মুসলমানরা পরাস্ত হচ্ছিল তখন মুশরিকদের সম্পূর্ণ চেষ্টা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কিভাবে হত্যা করা যায়। এমন কঠিন ও সংকটাপন্ন মুহুর্তে মুসলমানদের একদল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রক্ষার জন্য তার চতুস্পার্শ্বে দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুলেছিল। যাদের মধ্যে আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর চাচা যিয়াদ বিন সাকান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অন্যতম ছিলেন।

আনাস বিন মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেনঃ

«أَفْرَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فِي سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ. فَلَمَّا رَهَقُوهُ قَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَهُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ»

“উহুদ যুদ্ধে এমনও একসময় আসল যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে শুধুমাত্র সাত আনসারী ও দুই কুরাইশী

রয়ে গেলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি অধিকমাত্রায় আক্রমণ হতে লাগল তখন তিনি এরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি আমার থেকে কাফেরদেরকে প্রতিরোধ করবে সে জান্নাতে আমার সাথী হবে।”

এবার আনসারী সাহাবীগণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং কাফেরদের রুখে দাঁড়ান। তীর ধনুকের বৃষ্টির মধ্যে রাসূলের সামনে নিজেদেরকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। এরপর একে একে শাহাদাতের সূধা পান করেন। তাদের মধ্যে যিয়াদ বিন সাকান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (মুসলিমঃ ১৭৮৯)

এই মুহূর্তের দৃশ্যপট আল্লামা এহসান এলাহী জহীর (রাহিমাহুল্লাহ) নিজের এক বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ যিয়াদ বিন সাকান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। ইমাম ইবনে হিশাম নিজ সীরাত গ্রন্থে এবং অন্যান্য ইমামগণ নিজ নিজ গ্রন্থে যা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীরাতের উপর লেখা হয়েছে বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদ প্রান্তরে আগমন করলেন। শত্রুপক্ষের সারা শক্তি ব্যয় হচ্ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হত্যার জন্যে।

তারা বুঝে নিয়েছিল যে, যতক্ষণ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের মাঝে জীবিত থাকবেন তাদেরকে দ্বীন থেকে সরানো যাবে না এবং তাদের পদস্থলন করা যাবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্ষতি সাধনের জন্য তারা পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করল। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করা শুরু করল। রহমতের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন এ অবস্থা দেখলেন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দিলেনঃ হে মুসলমানগণ! কে আছো যাকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের তরবারী দিবে। সে আমার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে যে, বেঁচে থাকতে আমার কাছে শত্রুকে পৌঁছতে দিবে না। যতক্ষণ জীবিত থাকবে আমার দরজায় পাহারা দিবে। এক হালকা-পাতলা ব্যক্তি যিয়াদ বিন সাকান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) উঠে দাঁড়িয়ে বললেনঃ

আমার মনিব! আমি আপনার কাছে এই অঙ্গীকারাবদ্ধ হচ্ছি যতক্ষণ জীবিত থাকব আপনার তাঁবুর দরজা থেকে সরে যাব না।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখলেন এ দুর্বল ব্যক্তি তিনি বললেনঃ বসে যাও। এরপর তিনি আবার বললেন আবার সেই উঠল, আবারও বললেন আবার সেই উঠল।

তিনি তাকে তরবারি দিয়ে দিলেন। দেখ ওয়াদা পূরণ করবে। যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেনঃ আল্লাহর হাবীব ওয়াদা পূরণ করব।

হাদীসে উল্লেখ আছে শত্রুপক্ষ সমস্ত শক্তি দিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তাঁবুতে আক্রমণ করল। প্রত্যেক আক্রমণ যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার বুকের দ্বারা বাঁধা সৃষ্টি করত। বাহাঙরটি আঘাত লেগেছে। এক, দুই, তিন, চার নয় বাহাঙর ক্ষত বলা সহজ বাস্তবে কত কঠিন। হাদীসে এসেছে যে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছেন। তালহা ও যুবায়ের অগ্রসর হলেন। দ্রুত উঠালেন আহতদের তাঁবুতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। উঠানোর সময় তার জ্ঞান ফিরল। চোখ খুলে বললেনঃ কি ব্যাপার?

উত্তর দিলেনঃ যিয়াদ তুমি গুরুতর আহত হয়েছ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছ আমরা তোমাকে আহতদের ক্যাম্পে নিয়ে যেতে চাই।

তিনি বলতে লাগলেনঃ আমার প্রতি দয়া কর সেখানে আমাকে নিয়ে যেও না। আমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তাঁবুর সামনে দাঁড় করিয়ে দাও।

বললেনঃ কি বলছো?

বললেনঃ হ্যাঁ তাই বলছি, আমি আমার মনিবের সাথে ওয়াদাবদ্ধ যে, আমার প্রাণ থাকতে আমি আপনার ক্যাম্প থেকে সরে যাব না। আর এখনো আমার প্রাণ বেঁচে আছে। অনেকবার বলার পরও তিনি তার কথায় অটল। এরপর তাকে সেখানে তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দেয়া অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিলেন।

হাদীসে উল্লেখ আছে যে, আবার তীর নিক্ষেপ করা হল, আবার তরবারী চলল, আবার তীরের ক্ষত হল। ৯২টি ক্ষত হল। যখন ৯৩টি ক্ষত হল তার মুখ থেকে চিৎকারের আওয়াজ বের হল এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। চিৎকারের আওয়াজ দয়ার নবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কানে পৌঁছল। তাঁরু থেকে দৌড়ে বের হলেন এবং দেখলেন যে, যিয়াদের শরীরে আর যখমের কোন স্থান অবশিষ্ট নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্রুত যিয়াদের শির উঠালেন। নিজে মাটিতে বসলেন আর তাকে কোলে নিলেন।

হাদীসের বাক্য এমনঃ যখন দেখেছেন যে, মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত প্রতি স্থানের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তখন চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

অর্থঃ “তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যিনি হচ্ছেন তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষি, মু’মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।” (সূরা তাওবাঃ ১২৮)

আল্লাহ তায়ালা এত দয়ার নবী পাঠিয়েছেন তোমাদের যদি পায়ে কাঁটা বিঁধে এর ব্যাথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্তরে অনুভব করেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অশ্রুর জল যিয়াদের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চেহারায়ে পড়ল। গরম গরম ফোঁটা আবে হায়াতের কাজে দিল। চোখ খুললেন এবং দেখলেন যে বিশ্ব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সামনে। চক্ষু আবার বন্ধ করল পুনরায় খুলল যে আমি তো স্বপ্ন দেখছি না, তাঁর চেহারা সামনেই রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার চক্ষু খোলা দেখে তার উপর স্বীয় হাত মোবারক উঠিয়ে

যিয়াদের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) চোখে রাখলেন যাতে ক্ষত স্থানগুলি দেখতে পেয়ে বেশী কষ্ট না হয়।

যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ক্ষীণ কণ্ঠে বললেনঃ হে মনিব! যাত্রাকালে আপনার যিয়ারত থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমি চাই যে, কিয়ামতের দিনে যখন প্রভু জিজ্ঞেস করবেন যে, তুমি দুনিয়াতে কি করে এসেছ, শেষ দেখা কার সাথে হয়েছিল। তখন আমি বলব যে, আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে অঙ্গীকার পূরণ করে এসেছি এবং যার উপর শেষ দৃষ্টি পতিত হয়েছিল তা তোমার মাহবুবের চেহারা ছিল। এই সৌভাগ্য লাভ করতে দিন। দয়ালু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাত উঠিয়ে নিলেন। যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতে লাগলঃ শেষ মুহূর্তে এক কথার সাক্ষ্য তো দিয়ে দিন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ কি কথা?

যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলতে লাগলেনঃ কিয়ামতের দিন এই সাক্ষ্য কি দিবেন না যে, আমি আপনার ওয়াদা পূরণ করেছিলাম। দেখে নিন আমার জীবন থাকতে আমি আপনার তাঁবু থেকে সরে যাইনি। যতক্ষণ আমার নিঃশ্বাস বাকি ছিল আমি আপনার দরজার সামনে দাঁড়ানো ছিলাম।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ যিয়াদ! তুমি খুশি থাক তুমি তোমার ওয়াদা পূরণ করেছ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রভুও তার ওয়াদা পূরণ করেছেন। এটা বলার পর যিয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার শির অতিযত্নের সাথে মাটিতে রাখলেন সাহাবাদের অশ্রুসিক্ত নয়ন উক্ত দৃশ্য দেখছিল।

তিনি বললেনঃ সাথীরা! তোমরা আমার মুহাব্বতকারীর শেষ মুহূর্ত দেখেছ?

সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখেছি। তিনি বললেনঃ তোমরা কি জান, জিবরাঈল এসে আমাকে বললঃ মহান প্রভু পর্দা

উঠালেন এবং আমি দেখলাম যে, যিয়াদের রুহের অভ্যর্থনার জন্যে আল্লাহ তায়াল্লা জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দিয়েছে। (আল্লামা ইহসান ইলাহী জহিরের খুতবাসমূহঃ ৫৯-৬২)

এ ছিল আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র প্রিয় চাচার অবস্থা। তার ভাই আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও সেদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে নিজেকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কদমতলে শাহাদাতের সুখা পান করেছিলেন।

এমন পরিবারের সন্তান যার বাবা, ভাই এবং চাচার জীবন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যে উৎসর্গ করেছিলেন। তার লালন-পালন এমনভাবে হয়েছিল যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। তিনি বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং আরবী সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন, তিনি নারী সমাজের মুখপাত্র ছিলেন। নির্দিধায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করে বিষয়াদি জানতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র সোপর্দ করে দিতেন যাতে তিনি তাকে ব্যাখ্যাসহ জানিয়ে দেন।

এজন্যে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তার বিষয়ে বলেছিলেনঃ

«نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ وَيَتَفَقَّهُنَ بِهِ»

“আনসারদের মহিলা, উত্তম মহিলা, ধর্মের বিষয়ে জানতে ও বুঝতে তাদের কোন লজ্জা বাধা দেই না।”

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইলম হাসিলের জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। চেষ্টা করতেন যে, কোনভাবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মজলিশে কিছু সময় কাটাতে যাতে ইলম হাসিল করতে পারে। তাকে নারীদের মধ্যে ফকীহের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি তার এমন ভালবাসা ছিল যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর “العضباء” উটনির রশি ধরে চলতে লাগলেন যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর সূরা মায়েদা অবতীর্ণ হয় তিনি উটনির উপর আরোহিত ছিলেন।

«فَكَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا تَدُقُّ بِعَضْدِ النَّاقَةِ»

“ওহীর ভারে উটনীর শরীর ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল।”

তিনি এমন ভাগ্যবতী নারী যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেই নারীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যাপারে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে। বিষয়টি হল তিনি তালাকপ্রাপ্তা হন।

সে সময় তালাকের কোন বিধান ছিল না। সুতরাং আয়াত নাযিল হলঃ

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

অর্থঃ “তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা তিন মাস অপেক্ষা করবে।”

ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন যে, হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। মসজিদের এক কোণায় মহিলারা একত্রিত হয়। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। মহিলারা পরস্পর কথোপকথন শুরু করল। ধীরে ধীরে আওয়াজ বৃদ্ধি পেতে লাগল যখন শোর বেশী হতে লাগল তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ

«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَتَنْنَ أَكْثَرُ حَطَبٍ جَهَنَّمَ»

“হে নারী সমাজ! তোমাদের অধিকাংশ জাহান্নামের জ্বালানী।”

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একথা শুনে চুপ থাকতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ সাহসের সাথে জিজ্ঞেস করলেনঃ এর কারণ কি?

এরশাদ করলেনঃ

«إِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَ لَمْ تَشْكُرْ وَإِذَا ابْتُلِيتَ لَمْ تَصْبِرْ، وَإِذَا أُمْسِكَ عَنْكَ شَكْوَتٌ وَإِيَّاكَ وَكُفَرَ الْمُنْعَمِينَ»

“তোমাদেরকে যখন কোন কিছু দান করা হয় তার শুকরিয়া আদায় কর না। আর যখন সমস্যা আসে ধৈর্যধারণ কর না। আর যখন কিছু না দেয়া হয় অভিযোগ করতে থাক। আর হ্যাঁ তোমরা নেয়ামত দানকারীর অকৃতজ্ঞতা হতে বাঁচ।”

বলতে লাগলঃ সব বিষয়তো বুঝলাম; কিন্তু নেয়ামতদানকারীর কৃতজ্ঞতা বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

এরশাদ করলেনঃ

«الْمَرْأَةُ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ قَدْ وَلَدَتْ الْوَلَدَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَتَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»

“বিবাহিতা নারী দুই অথবা তিন বাচ্চাও জন্ম নিয়েছে স্বামীকে বলে আমি তোমার কাছে ভাল কিছু পাইনি।”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বাক্য মহিলাদের সংশোধনের জন্য বলেছেন এবং অবস্থাও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বলেছেন। এর অর্থ কখনো এই নয় যে, সব মহিলা এমন। নিশ্চয় মুসলমানদের অনেক সংখ্যক নারী স্বামীদের অনুগত এবং উপরোল্লিখিত সবগুণ তাদের মধ্যে বিরাজমান।

একবার আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আপ্যায়ন করার সৌভাগ্য লাভ করেন। খাবার তৈরী করলেন এরপর খুব ভালবাসার সাথে বললেনঃ

«بَابِي وَأُمِّي تَعِشْ»

“আমার বাবা-মা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন!”

আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন। একথা বলে খাবার পরিবেশন করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) খাবার আহার করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পানির পাত্র থেকে পানি পান করলেন। আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেই পানির পাত্র সংরক্ষণ করে রাখলেন।

এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

«كُنَّا نَسْقِي مِنْهَا الْمَرِيضَ وَنَشْرَبُ مِنْهَا رَجَاءَ الْبَرَكَاتِ»

“আমরা সেই পাত্র থেকে নিজে পানি পান করতাম এবং অসুস্থ-দেরকেও পান করতাম যাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বরকত হাসিল করা যায়।”

উল্লেখযোগ্য যে, বরকত হাসিল করার বিষয়টি কেবল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সম্পৃক্ত এরপর উম্মতের কোন ব্যক্তির থেকে বরকত হাসিল করা বৈধ নয়।

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) শুধুমাত্র আলেমা, ফাকিহা এবং নারীদের মুখপাত্রই ছিলেন না বরং নারীদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কেও অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আসুন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়ের বিষয়ে একটি হাদীস অধ্যয়ন করি।

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন যে, আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় সাজগোজ করেছি এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে বলেছি আপনি ভেতরে তাশরীফ নিন। এরপর তিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে গেলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্যে দুধ পরিবেশন

করা হল। তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন আর অবশিষ্ট আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে দিলেন। তিনি লজ্জায় মাথা নত করলেন। আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর মাথা উঠালাম এবং বললাম যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতের পাত্র নিয়ে নাও। এখন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) দুধের পাত্র ধরলেন এবং তা থেকে কিছু পান করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন যে, এখন এটা তোমার বান্ধবীকে দিয়ে দাও। আমি বললামঃ

«بَلَّ خَذُهُ فَاشْرَبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلْنِيهِ مِنْ يَدِكَ»

“হে আল্লাহর রাসূল! বরং আপনি তা থেকে পান করুন এর বাকীটুকু আমাকে দিন।

«فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلْنِيهِ»

সুতরাং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা থেকে অল্প দুধ পান করলেন আর বাকীটুকু আমাকে দিলেন।”

এবার আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ভালবাসা আর আনুগত্যের অনুমান করুন। তিনি বলেনঃ

«فَجَلَسْتُ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْبَتِي ثُمَّ طَفِقْتُ أُدِيرُهُ وَأَتْبِعُهُ بِشَفَتِي لِأُصِيبَ مِنْهُ مَشْرَبَ النَّبِيِّ ﷺ»

“আমি পাত্রটি আমার হাঁটুতে রেখে এদিক সেদিক ঘুরাতে লাগলাম এবং সেই স্থান খোঁজতে লাগলাম যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চোঁট লেগেছিল যাতে তার মুখের লালার কিছু অংশ পেয়ে যাই।” (মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৫৮)

আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। তিনি নারীদের শুধু উপদেশই দিতেন না এবং অসুস্থদের সেবা যত্নও করতেন। এমনকি তিনি যুদ্ধ প্রান্তরে অংশগ্রহণও করতেন।

ইমাম ইবনে কাসীর (রাহিমাল্লাহ) বলেনঃ ইয়ারমুকের যুদ্ধে আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সেই নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা সেই যুদ্ধে মুজাহিদদের সাহস বৃদ্ধি করতে, তাদের উৎসাহিত করতে এবং আহতদের ক্ষতস্থানে পট্টি লাগানোর জন্যে এসেছিলেন। সেদিন যুদ্ধে নারীরাও পুরুষের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। অনেক রুমি সৈন্যদের হত্যা করেছে। যদি কোন মুসলিম মুজাহিদ যুদ্ধ-প্রান্তরে পেছনে চলে আসত অথবা দুর্বলতা দেখাত তো এই নারীরা তাদের উপর কংকর (ছোট পাথর) নিক্ষেপ করত। ধমক দিত এবং তাদের বলতঃ আরে তোমরা কোথায়? কি করছ? আমাদেরকে রুমীদের মোকাবেলার জন্যে নিয়ে এসেছ আর নিজেই পেছনে পলায়ন করছ। এখন এমন সব কথা শোনা কোন পুরুষ ছিল যে, পেছনে চলে যাবে। তৎক্ষণাত সামনে অগ্রসর হত এবং শত্রুর কাতারের ভেতরে ঢুকে যেত।

ইমাম ইবনে হাজার আল ইসাবা গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ইয়ারমুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজের তাঁবুর খুঁটি দিয়ে ৯ রুমিকে হত্যা করেন।

ইমাম যাহাবী (রাহিমাল্লাহ) এই ঘটনার পক্ষে বলেন যে, সেদিন আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নিজের তাঁবুর খুঁটি দিয়ে ৯ রুমিকে হত্যা করেছিলেন।

এভাবে এই মুজাহিদ মহিলা জেহাদ, ইলম, আমল এবং দ্বীন শিক্ষা করা ও শিখানোতে সারাটি জীবন কাটিয়ে দেন। অনেক বয়স পেয়েছেন। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তে শাম চলে গিয়েছিলেন। সেখানেও হাদীসের ইলম লোকদের মাঝে প্রচার করতে থাকেন। তিনি ১৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন। খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের খেলাফতকালে ৬৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে দামেস্কে দাফন দেয়া হয়। (রাযিয়াল্লাহু আনহা)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُواْ

أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে
এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে
রক্ষা কর আগুন হতে।”

(সূরা তাহরিমঃ ৬)

الضوء الساطع
(باللغة البنغالية)

Golden Rays
(In the Bengali Language)

“নারীর
ব্যক্তিত্বের এমন সকল
দিক যাতে তার মেধা, বীরত্ব,
পরহেজগারী প্রকাশ পায় সেগুলিই এই
বইয়ের অলংকার। উপস্থাপিত সকল
ঘটনাবলী হৃদয়গ্রাহী এবং সত্য; যে, এ গ্রন্থটি
পড়ে শুধু মহিলা ও বাচ্চাদের মধ্যেই মজার
ধুম ও আকর্ষণ সৃষ্টি হবে না; বরং পুরুষ
পাঠকদেরও এর যথেষ্ট ধারণা হয়ে যাবে
যে, সাহসীকতা, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও
সহনশীলতার মহৎ গুণও
পরিপূর্ণতার সাথে মহিলাদের
মধ্যে থাকে।”

ISBN: 9960-9930-3-5



9 789960 993034

Book No. 43

দা রু স সা লা ম

রিয়াদ • জেদ্দা • আল-খোবার • শারজাহ
লাহোর • লন্ডন • হিউস্টন • নিউ ইয়র্ক

